ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা : [illegible] বর্ষ, [illegible] —ত্রি, ১৩৫৭

সম্পাদক :

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীসরোজকৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

২, কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য :
প্রতি সংখ্যা—বেড় টাকা
বার্ষিক—পাঁচ টাকা

প্রকাশক : শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর : শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩

সূচীপত্র

ইতিহাস এক মহাদেশ

শ্রীযদুনাথ সরকার ১

ইংরেজ আমলে বাংলার ইতিহাসের দলিলপত্র

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ৪

ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর গৌড়-কামরূপ সংঘর্ষ

শ্রীবীরেশচন্দ্র সরকার ১২

অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় ১৫

ঐতিহাসিক মেকলে

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী ১৯

টয়েন্‌বির মতামত

শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার ৩৩

ভারতের ঐক্য

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬

প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও নিকটপ্রাচ্য

শ্রীখগেশচন্দ্র বসু ৫১

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

সুবা বাংলার পর্তুগীজ বাসিন্দা (১)

শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী ৬১

P 27212

ইতিহাস

প্রথম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৫৭ [প্রথম সংখ্যা

ইতিহাস এক মহাদেশ

শ্রীযদুনাথ সরকার

শুধু ইতিহাস নিয়ে একখানা পত্রিকা বাঙ্গলায় বাহির করা কেন আবশ্যক? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক, ইহারই আজ উত্তর দিতেছি।

আমাদের দেশে ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়, ইতিহাসের যে দিকটা আমাদের বাঙ্গালী লেখকগণ চর্চ্চা করেন, তাহা বড়ই সংকীর্ণ। এদেশে যাঁরা ইতিহাস ভালবাসেন, আর যাঁরা ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রাচীন যুগের শিলালিপি ও তাম্রশাসন, পুরাতন হস্তলিপি, বৈষ্ণব ও অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে মধ্যযুগে রচিত অপ্রকাশিত পত্র ও গান, অথবা স্থানীয় প্রবাদ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এগুলির বাহিরে যে ইতিহাসের কত প্রকাণ্ড, কত বিচিত্র এক মহাদেশ পড়িয়া আছে, এবং কত কত ইউরোপীয় পণ্ডিত সেই ক্ষেত্র চাষ করিয়া, কত মূল্যবান ফসললাভ করিতেছেন, তাহা আমাদের অনেকেই জানে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, বলিতে হয় যে আমাদের গর্ব্বিত বাঙ্গলাদেশ এখনও স্কুলকলেজের ইতিহাস-পর্য্যায়ের উপরে উঠিতে পারে নাই। অবশ্য গত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি বেশ মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ বাঙ্গালীরা প্রকাশিত করেছেন, কিন্তু তাহারাও এই সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ, অর্থাৎ ইতিহাসের বিস্তৃত সংজ্ঞা তাহাদের দ্বারা আবৃত হয় না। আমার কথাটা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিব। আমাদের মধ্যে কি নাই তাহা দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ ইতিহাস যে রাজারাজড়ার কাহিনী, যুদ্ধ ও বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যের উত্থান পতন এই বিষয় ক'টিতে আবদ্ধ নয়, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু ইতিহাস সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান শ্রেণীর গ্রন্থ হইবে, এই প্রশ্ন এখন বিলাতে খুব আন্দোলিত হইতেছে। টাইমস্ পত্রিকার লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট নামক সাপ্তাহিক যাঁহারা মন দিয়া পড়েন তাঁহারা যদি ছ' পক্ষের যুক্তির বাঙ্গলা সারাংশ আমাদের এই পত্রিকায় প্রকাশিত করেন, তবে দেশের লোকের দৃষ্টি এই দিকে যাইতে পারে। বিখ্যাত

ঐতিহাসিক জি এম ট্রেভিলিয়ন (কেম্ব্রিজ, ট্রিনিটি কলেজের কর্ত্তা) তাঁহার আত্ম-চরিত (অটো-বায়োগ্রাফি, লংম্যান প্রকাশিত) গ্রন্থে ইতিহাসকে সাহিত্য অর্থাৎ সজীব ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া অথচ সত্য তথ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রচনা করিবার পক্ষে মত দিয়াছেন। এবং দেখা যাইতেছে যে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মহাগ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। মেকলের ত কথাই নাই, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল "এমন একখান ইতিহাস লিখিব, যাহাকে লোকে নূতনতম নবেল ফেলিয়া দিয়া আদর করিয়া পড়িবে"—সে উদ্দেশ্য সফল হয়। গিবনের ইতিহাস, মেকলের দোষগুলি হইতে মুক্ত, কিন্তু সুপাঠ্য হিসাবে ঠিক সেইমত একখানা অমর সাহিত্য, যাকে বলে ওয়ার্লড্ ক্লাসিক। জার্মান প্রণালীর কটমট তথ্যপূর্ণ নীরস বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মত ইতিহাস এখন আর ইউরোপে আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয় না।

তারপর, জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেকে কোন বিশিষ্ট ধরণে, বিভিন্ন কায়দায় নিজ মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমরা একেবারেই খোঁজ লই না। অথচ এই মহা শিক্ষাপ্রদ আবশ্যক বিষয় জানা অতি সহজ। প্রথমতঃ কেম্ব্রিজ এন্সেণ্ট হিষ্ট্রিতে আদিযুগের আদর্শ ঐতিহাসিকদ্বয়—হেরোডোটস এবং থুকিডিডিস্-কে তুলনা করা হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে জেনোফন্ যে অকারণে প্রশংসিত তাহাও দেখান হইয়াছে। তারপর অধ্যাপক শুচের গ্রন্থ *History and Historians in the Nineteenth Century* (২ এডিসন্, লংম্যান প্রকাশিত) রাঙ্কে, মমসেন্ প্রভৃতি সমস্ত বড় ও মাঝারি নব্য ঐতিহাসিকদের রচনা প্রণালী ও আদর্শের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমন কি কেম্ব্রিজ মডার্ণ হিষ্ট্রিতেও এক এক অধ্যায়ে এর আলোচনা করা হইয়াছে, সে বইটা সুলভ ও সর্ব্বত্র প্রাপ্য। শুচের সারাংশ আমাদের এই পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত করা উচিত।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাস, এবং বিশেষ বিশেষ যুদ্ধ যেমন ওয়াটার্লু, সিডান, প্রভৃতির বিশ্লেষণ, বড়ই শিক্ষাপ্রদ এবং মনোরম। দীর্ঘ সময়ে জয়লাভই জাতীয় দক্ষতা ও চরিত্রবলের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সুতরাং আমাদের জানা উচিত কেন অমুক জাতি হারিল, আর সেই রণাঙ্গনে আর এক জাতি জিতিল। এই যুদ্ধবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ইউরোপে একটা অবশ্যপাঠ্য বিষয়। আর আমাদের মধ্যে অনেকে ইহার নামও শুনেন নাই। এ সম্বন্ধে কয়েকখানি আধার গ্রন্থের নাম দিতেছি—Oman's *History of War in the Middle Ages* (২ এডিসন্) Cole and Priestley's *British Military History* (*Outlines of*), *Encyclopædia Britannica*তে বিশেষ বিশেষ যুদ্ধের বর্ণনা, ইত্যাদি। এর সারাংশ বাঙ্গলায় প্রকাশ করিয়া এক নূতন দিকে দেশের চোখ ফুটাইয়া দিতে হইবে। আমার সদ্যপ্রকাশিত *Fall of the Mughal Empire*, Vol. IV. গ্রন্থে আমি

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যুদ্ধে কি কি কারণে ইংরাজেরা জয়ী হইল, আর মুঘল ও মারাঠারা হারিল। এই চেষ্টা না করিলে ইতিহাস অর্থহীন হয়।

এদেশে সবচেয়ে বেশী আবশ্যক মনের উন্মুক্ততা, অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের সমস্ত সংস্কারগুলি বর্জ্জন করিয়া একেবারে সাদাসিধা মন লইয়া অতীতের ঘটনাগুলির সত্য স্বরূপ বাহির করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার জন্য সমাজের সমস্ত দণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। যেমন জার্ম্মান পণ্ডিতগণ প্রথমে যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে (ক) হোমরের পদ্যগুলি হয়ত একজনের লেখা নয়, অনেক ছোট গীতি "সেলাই করিয়া" ইলিয়াড্ ও ওডেসি গঠিত হয়েছে। (খ) রোমের রাজন্যগণের কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়, কিন্তু সত্য ঘটনার বিকৃত আভাস দেয় মাত্র, সেই সত্য আবিষ্কার করা। (গ) বাইবেলের যিশুর জীবনী যে তাঁর চারজন শিষ্যের লেখা একথা সত্য নয়, মার্ক মেথু প্রভৃতির নামে অপরের লেখা, এবং যিশুর জন্মের ১৫০ বৎসর পরে লেখা জীবনী ওর মধ্যে আছে, অথচ আদি রচিত জীবনীখানি লোপ পাইয়াছে, তাহার এক পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত সংস্করণ একজন evaugelistএর নামে জগতে চলিতেছে। কি যুক্তির দ্বারা এবং কোন প্রণালীতে অনুসন্ধান করিলে এই সত্য উদ্ধার করা যায় তাহা আমাদের জানা আবশ্যক, এবং সেই প্রণালী ও বেদ ও মহাভারত রামায়ণে প্রয়োগ করিতে হইবে। পাঠক এ বিষয়ে অনেক তথ্য অল্প খরচে পাইবেন এই গ্রন্থগুলিতে, *Hastings' Encyclopedia of Religion and Ethics*, *Encyclopedia of Islam*, ইত্যাদি এবং *Combridge Ancient History*.

তুলনামূলক নৃতত্ত্ব, জনকাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদি বিষয়ের গত পঞ্চাশ বৎসরে যে অগাধ চর্চ্চা হয়েছে তাহার ফলে প্রাগ্-ইতিহাস বলিয়া একটা নবীন মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ক্ষেত্রের ফলগুলিও বাঙ্গলায় দিতে হইবে।

যে কোন ভাষায়ই হউক না কেন, একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বাহির হইলে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আমাদের এই পত্রিকায় দিতে হইবে, যাহাতে দরিদ্র পাঠকও জানিতে পারেন যে কোন্ দিক দিয়া এই গ্রন্থ আমাদের জ্ঞান বাড়াইল। দৈনিক কাগজের নিকিতন সমালোচনায় এ কাজ হয় না। ভাল ভাল বিদেশী ইতিহাসের অনুবাদ খর্ব্বাকারে ধারাবাহিকরূপে বাঙ্গলায় বাহির করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালীদের জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে অন্য প্রদেশে, যেমন মহারাষ্ট্রে, কি নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, কি মূল্যবান গ্রন্থ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে—যাহার সংবাদ ইংরাজীতে অতি সহজেই আমরা পাই।

অবশেষে এই পত্রিকায় এক অংশ থাকিবে যাহার নাম "সংবাদ ও জিজ্ঞাসা" (Notes and Queries) অর্থাৎ ইতিহাস সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য নূতন সংবাদ, সমাধানের জন্য জিজ্ঞাস্য পাঠক বা লেখক যে সমস্যা পাঠাইয়াছেন তাহা, এবং

অমুক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ভারতে কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার প্রশ্ন ও উত্তর। নবীন গবেষক নিজ নির্ব্বাচিত বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) চাহিলে তাহাও এখানে ছাপা হইবে। এ সবগুলি আবশ্যক কাজ।

ইংরেজ আমলে বাংলার ইতিহাসের দলিল-পত্র

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

আধুনিক ইতিহাস সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্টের মহাফেজখানায় দলিল পত্র দেখেই লেখা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিকে অনেক দূর থেকে ব্যবসা চালাতে ও রাজ্য শাসন করতে হত আর তাদের কর্ম্মচারীদের এখানকার কাজকর্ম্ম বোঝাতে হত স্বপক্ষে দীর্ঘ যুক্তি দিয়ে। এইভাবে যে শাসনপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মৌখিক কোনও নির্দ্দেশ দেওয়া চলত না, প্রায় সব কিছুই লিখতে হত। বৃটিশ শাসন পদ্ধতির এই বিশেষত্বের ফলেই মহাফেজখানায় দীর্ঘ দলিল পত্রের সমাবেশ। ঐতিহাসিক এই সব দলিল পত্র থেকে এত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন যে তাঁর এই ভুল ধরা খুবই স্বাভাবিক যে গভর্ণমেণ্টের মহাফেজখানার দলিল পত্র সব দেখতে পারলেই গবেষণার সার্থকতা হবে। ইংলণ্ডে সযত্নরক্ষিত ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় দলিল পত্রের আলোকচিত্র এনে, ভারত গভর্ণমেণ্টের ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের মহাফেজখানার দলিল পত্র বন্ধ করে দেখলেই বাংলার ইতিহাসের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর তথ্য সম্পূর্ণ সংগ্রহ হবে। কিন্তু জাতীয় জীবনের স্পন্দন গভর্ণমেণ্টের দলিল পত্র দেখে সম্পূর্ণ বুঝতে পারা যায় না। বেসরকারি ও আধা সরকারি ঐতিহাসিক দলিল পত্র এবং সমসাময়িক সাহিত্য ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তু হওয়া প্রয়োজন। বাংলা দেশের বৃটিশ আমলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় বেসরকারি ও আধা সরকারি দলিল পত্র খুঁজে দেখা হচ্ছে। সেই চেষ্টার ফলে আমরা কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি তারই খানিকটা আভাস দেওয়া যাক্।

কলিকাতা হাইকোর্টে মেয়রের আদালত, কোয়ার্টার সেসনস্, সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের অষ্টাদশ শতাব্দীর সব দলিল পত্র দেখা হয়েছে। মেয়রের আদালতের কাগজপত্র ১৭৩৯ সাল থেকে ১৭৭৩ সাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। সংগ্রহ খুবই অসম্পূর্ণ। খুঁজতে খুঁজতে বেশ বুঝতে পারা যায় অনেক মূল্যবান দলিল নাই। Quarter Sessions এর দলিল সংগ্রহে ফাঁক আরও বেশী। ১৭৭৫ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের দলিল পত্র সংগ্রহ খুবই ভাল

সন্দেহ নাই কিন্তু বহু মূল্যবান দলিল পত্র যে নাই তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। সদর দেওয়ানী আদালতের দলিল পত্র ১৭৯৫ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে; সদর নিজামত আদালতের কাগজপত্র পাওয়া যায় ১৭৯১ সাল থেকে। এই দুই আদালতের কাগজপত্র প্রায় সবই আছে—বিশেষ কিছু লোকসান বোধহয় হয়নি। বিচার বিভাগের দলিল পত্রের বিশেষত্ব এই যে কার্যবিবরণীর চেয়ে আদালতে পেশ করা দস্তাবেজের (exhibit) মূল্য অনেক বেশী। হাইকোর্টের আদিম বিভাগের দলিল পত্রের চেয়ে আপীল বিভাগের দলিল পত্র অনেক ভালভাবে রাখা হয়েছে। একজন পরিদর্শক হাইকোর্টের মহাফেজখানার কাগজপত্র দেখে বলেছিলেন যে আপীল বিভাগের কাগজগুলো অনেক বেশী বড়লোকের মত দেখাচ্ছে।

কলিকাতার মেয়রের আদালতের ও সুপ্রীম কোর্টের দলিল পত্র থেকে আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের রোজকারবার ও ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাই। যে তথ্য আমরা এখানে পাই তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রথম দিকে শুধু ভারতীয়দের মধ্যে বিচার করার জন্য এক দেওয়ানী আদালত ছিল যাকে কোর্ট কাছারী বলা হত। সেই আদালতে কার্যবিবরণী বিস্তৃতভাবে লেখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু ঐ আদালতের কিছু কিছু কাগজ হাইকোর্টের পুরাতন দলিল পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কিত করতে হলে হাইকোর্টের পুরাতন দলিল পত্র ভালভাবে না দেখলে নিখুঁত চিত্র দেওয়া সম্ভব হবে না। ১৭৪৯—১৮০০ সাল পর্যন্ত আমরা মূলধন বিনিময়, মাথাপিছু লাভ, উৎপাদন প্রভৃতি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পণ্যমূল্যের যে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় তা আর কোথাও মেলে না।

১৭৬২ সালে জিনিষপত্রের দর এরূপ ছিল।

চাল (মোটা)	—	১।১০ মণ
চাল (মাঝারি)	—	১৷৵৫ ,,
ডাল	—	২৷৵৫ ,,
কাঁচা পাট	—	২।০ ,,
পাটের দড়ি	—	৪৷০ ,,
দেশী লোহা	—	৭৲ ,,
বিলাতী লোহা	—	১৩।০ ,,
পিতল	—	১৷০ সের
তামা	—	২৲ ,,

আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলায় বৃটিশ বাণিজ্য সম্বন্ধে আপত্তি এইজন্য করেছিল যে বৃটিশ বণিকেরা "দস্তক"-এর অপব্যবহার করে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছিল।

১৭৫৭ সালের মেয়রের কোর্টের দুর্গাচরণ মিত্রের সঙ্গে প্রান্সিয়াস কোম্পানীর একটি মোকদ্দমায় কালীচরণ সরকারের সাক্ষ্য থেকে এ অভিযোগের সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

পুরাতন উইলগুলি মানবচরিত্র-পাঠকের নিকট অমূল্য এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান। গভর্ণর হ্যারি ভেরেলেষ্টের রক্ষিতা সোফিয়া ইয়াণ্ডেলের উইল (২রা এপ্রিল ১৭৭৮) ও নাবিক জন বিনের উইল (১লা মে ১৭৭৮) অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের গোড়ার দিকের অনেক মূল্যবান তথ্যসম্বলিত। সোফিয়া ইয়াণ্ডেলের মা ভারতীয়, বাবা পোর্তুগীজ, বহু একজন কসাই। ভেরেলেষ্ট সাহেব বিলাত যাওয়ার আগে Sophia Yeandleকে একটি বাড়ী ও কিছু অর্থ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে বাড়ীটা মহম্মদ রেজা খাঁর বাড়ী ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আসের বাড়ীর খুবই কাছে ছিল। জন বিনের উইলে একটি লাইন আছে যা অর্থপূর্ণ—"আমি একটি স্ত্রীলোককে আমার রক্ষিতা হিসাবে নিয়েছিলাম কারণ এদিকের এরূপই রীতি।"

জন হাইডের নোট হাইকোর্টের মহাফেজখানায় ৫০ খণ্ডে টাইপ করা আছে। আসল নোটগুলো আছে ব্যারিষ্টারদের লাইব্রেরীতে। হাইড Sir Elijah Impeyর সঙ্গে এসেছিল এবং দীর্ঘকাল সুপ্রীমকোর্টের অভিযুক্তি করেছিল। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৯৬ সাল পর্য্যন্ত এই নোটগুলোতে সুপ্রীম কোর্টের অনেক মোকদ্দমা সম্পর্কে টীকা-টিপ্পনী করা হয়েছিল। হাইড নোটগুলো ছাপাতে চেয়েছিল এবং লিখেছিল—"আমি হয়ত ইংলণ্ডের বাহিরেই মারা যাব কিন্তু আমার এই নোটগুলো যেন ইংলণ্ডে পাঠান হয় এবং সুন্দরভাবে এবং নির্ভুলভাবে ছাপান হয়। বইগুলো হয়ত অনেক লোকে পড়বে না কিন্তু আমার ধারণা এগুলো কাজে লাগবে।" আইনজ্ঞের চোখে হাইডের নোটের মূল্য বেশী কি কম বলতে পারি না. কিন্তু ইতিহাসের অনেক ছোটখাট ঘটনাতে এই টীকা-টিপ্পনী নূতন আলোকপাত করে সন্দেহ নাই।

সদর নিজামত আদালতের কাগজপত্রে আমরা কাজী ও মুফ্‌তিদের বিচার-পদ্ধতির সুন্দর বিবরণ পাই। অনেক কতোয়ার সংগ্রহ এই কাগজপত্রের মধ্যে আছে। ১৭৯০ সাল পর্য্যন্ত কিভাবে মুসলমান বিচারের প্রহসন চলছিল তার অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়।

সদর দেওয়ানী আদালতের এ সময়ের কাগজপত্র ফারসীতে লেখা কিন্তু ইংরেজ জজদের সুবিধার জন্য ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দেওয়া আছে, লম্বা গুটান ফারসী লেখা কাগজের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট চিরকুট ইংরেজীতে লেখা। কত রকমের তথ্য এই সব কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে কবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রথম সুরু হয়েছিল তার

বিশদ বিবরণ [redacted] বৎসরের সদর দেওয়ানী আদালতের কাগজপত্রের মধ্যে পাই [redacted]

[redacted]কোর্টের কোনও বেসিক বিচার সংক্রান্ত অতি পুরাতন কাগজপত্র নষ্ট [redacted]ত চেয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল এই যে ১৫৲ দামের দুটো কলাগাছ নিয়ে A [redacted]র মধ্যে ঝগড়ার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে চটকদার [redacted] যে কতটা ভুল তা প্রমাণ করার বোধ হয় প্রয়োজন হয় না।

হাইকোর্টের পুরাতন দলিল পত্রের মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, [redacted] সিং, মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং অন্য অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে [redacted] এমন অনেক খবর পাই যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বাংলা দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এখানকার কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয় না। হাইকোর্টের দলিল পত্র এবং অন্য কাগজপত্র দেখে অন্ততঃ দু'জন সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।

ক্লাইভের প্রবঞ্চনার ফলে উমিচাঁদ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কিন্তু তার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আমরা জানি না। উমিচাঁদ ছিল নানকপন্থী শিখ, তার প্রকৃত নাম আমীর চাঁদ। আমীর চাঁদ প্রথমে কিছুদিন বৈষ্ণবদাস শেঠ নামক একজন বাঙালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে বৈষ্ণবদাসের অবস্থা বিপর্য্যয় হয় আর আমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি করে কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ীর মালিক হয়ে ওঠে। ১৭৪৫ সালে Quarter Sessionsএর কাগজপত্রে আমরা দেখতে পাই যে গ্র্যাণ্ড জুরি আমীর চাঁদকে মাথা সোপর্দ করার চেষ্টা করেছিল, কারণ বহু বাড়ীর মালিক আমীর চাঁদ বাড়ী মেরামত করত না; তার অনেক বাড়ী পথিকদের আর নিকটস্থ বাড়ীগুলির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। তখন Quarter Sessions বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটির কাজও করত। গ্র্যাণ্ড জুরিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আমীর চাঁদকে বাড়ী মেরামত করতে বাধ্য করা হবে। আমীর চাঁদ (উমিচাঁদ) সে আমলের কলিকাতার একজন খুবই খারাপ বাড়ীওয়ালা ছিল।

১৭৯৩ সালে আমীর চাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মোকদ্দমার সময় উইলিয়ামসন যে সাক্ষ্য দেয় তাতে সে বলে যে ১৭৪৩ সালে সে সর্ব্বপ্রথম উমিচাঁদকে দেখে কালকাটা কাউনসিলের ঘরে। সে সময় উমিচাঁদ কাউনসিলের প্রত্যেক সদস্যকে আলিঙ্গন করে; ক্লাইভও তখন সেনাপতি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিল। বোধ হয় এই পাইকারী আলিঙ্গনের পর আমীর চাঁদ Wattsএর সঙ্গে তার উপদেষ্টা হয়ে মুর্শিদাবাদ যায় এবং তার পর Wattsএর গোপন মন্ত্রণা সুরু হয়। আমীর চাঁদ মারা যায় ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। ক্লাইভের প্রতারণার ফলে তার সবচেয়ে বড় চাল ব্যর্থ হয়ে যায় কিন্তু তার জন্য সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল একথা

সত্যের অপলাপ, এই ঘটনার বেড়বংসর পরে সে মালদহে যায়া যায় এবং এই বেড়বংসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সঙ্গে তার কারবার আগের মতই চলেছিল। তার সম্পত্তির মূল্য ছিল ৪২ লক্ষ টাকা। সবচেয়ে বড় চালে এভাবে হেরে যাওয়ার পর তার বোধ হয় ধাঁধাঁর ভেঙ্গে ওঠে ও অধিকাংশ সম্পত্তি দেবোত্তর করে রেখে যায়। পরে মামলা মোকদ্দমায় সব নষ্ট হয়ে যায়। হাইকোর্টের দলিল পত্রের মধ্যে আমীর চাঁদের উইল পাওয়া গিয়েছে। উইল ফারসীতে লেখা। অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে উমিচাঁদ তার উইলে ইংলণ্ডের Magdalen ও Foundling Charity-র জন্য ৩৭৫০০ টাকা রেখে যায়। কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা, আমীর চাঁদের উইলের অস্তিত্ব তার সমকালীন হাজারীমল গভর্ণর ও সাহেবদের খুশি করার জন্য এই অবৈধ দানের ব্যবস্থা করেছিল। উইলে অবশ্য "দানখয়রাতের" ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আমীর চাঁদ "গুরুপরব ও সদব্রত" ভিন্ন অন্য কিছু বুঝতে চায়নি। উইলে হাজারীমলের ছেলে মতিচাঁদকে যে টাকা দেওয়া আছে তার নীচে লেখা আছে—"হামদে ভি আপনাম জ্যাদা করোগে দৌলতভি খুব হোবেগা।" সে যে অর্থগৃধ্নু, অসাধু ষড়যন্ত্রকারীর ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে দাঁড়াবে তা তার পক্ষে ভাবতে না পারা বোধহয় স্বাভাবিক।

মহারাজা নন্দকুমার সম্বন্ধে হাইকোর্টে যত কাগজ আছে তা সবই দেখা হয়েছে। মোহনপ্রসাদ ও কামাল উদ্দীন নামে দুজন সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে সুপ্রীম কোর্টের জজরা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে। নন্দকুমারের মোকদ্দমার নথিপত্র ভিন্ন বিচার বিভাগের অন্য দলিল পত্র থেকে তাদের সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করা যায়। মোহনপ্রসাদের নাম আরও ১৪টা মোকদ্দমার কাগজপত্রে পাওয়া যায় যাতে সে হয় বাদী নয় বিবাদী ছিল। এই মামলাবাজ লোকটি বেনামীদার হয়ে অনেক কাজ করত; অন্যের খাতকের দলিল কিনে নেওয়া তার একটা ব্যবসা ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কর্মচারীদের চোরাকারবার ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সঙ্গে সে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। নন্দকুমারের নামে মোকদ্দমা আরম্ভ করার আগে সে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সুখ-সাগরের বাগান বাড়ীতে এবং সহরের বাড়ীতে ঘন ঘন আলাপ আলোচনার জন্য যেত। তার মত লোকের পক্ষে গভর্ণর জেনারেলের কাছে ঠিক এই সময়ে এত যাতায়াত সত্যিই সন্দেহজনক। কামাল উদ্দীন ছিল তার নিজের ভাষাতেই একজন সম্পূর্ণ বিত্তহীন ব্যক্তি। তার মত লোককে হিজলির নিমকমহালের ইজারাদার করাটা খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। জজ হাইড পরে তার নোটে লিখেছিল যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বন্ধু বারওয়েলের কাছে কামাল চুরি করে লবণ বিক্রি করত আর গভর্ণমেণ্টকে জানাত যে যথেষ্ট লবণ তৈরী করতে পারা যায় নি। তার বিরুদ্ধে অন্যান ইজারাদারেরা এই বলে নালিশ করেছিল যে সে ওজনে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কম দিত। ১৭৭৫ সালের প্রথম ভাগে

এই কামাল উদ্দীন দাবি দাওয়া মিটাতে না পেরে খুবই অসুবিধার মধ্যে ছিল। ভারেলেস্টের মুন্সী সময় উদ্দীনের চেষ্টায় "দরবারের খরচা" বাবদ ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা তাকে মঞ্জুর করা হয়; তারপরেই সে মহম্মদ কামাল সেজে নন্দকুমারের মোকদ্দমায় সাক্ষি দেয়। মহারাজার পক্ষ থেকে বলা হয় যে "জহরৎ দলিল"-এর প্রধান সাক্ষী মহম্মদ কামাল কয়েক বৎসর হল মারা গিয়েছে। কামাল উদ্দীন বলে যে সেই মহম্মদ কামাল, পরে তার নাম বদলিয়েছে আর তারই সিল মহারাজা নন্দকুমারের পক্ষ থেকে জাল করা হয়েছে।

মোকদ্দমা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র দেখে এই কথাই মনে হয় যে দুই পক্ষ থেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল, কারণ তখনও বোধ হয় এই ধারণাই ছিল যে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে মোকদ্দমায় জিততে পারা যায় না। সুপ্রীম কোর্টের জজরা সর্বপ্রথম এই ধারণা মোকদ্দমার বিচার করেছিল। তাদের এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ভেতর থেকে সত্যিকার ঘটনা বার করার মত যোগ্যতা তখনও হয়নি। আর ঠিক তার কিছু আগেই মহারাজা নন্দকুমার গভর্ণর জেনারেলকে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে কাউন্সিলের নিকট অভিযুক্ত করেছিল। তার এই ধৃষ্টতাতে ইংরেজ সমাজ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, কাজেই জজ ও জুরিদের পক্ষে স্থিরভাবে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করার মত মনের অবস্থা ছিলনা, সুপ্রীম কোর্টের অন্ততঃ তিনজন জজ তাদের ক্ষমতা ও গৌরব জাহির করার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিল। কাজেই একজন মহারাজাকে হাতে পেয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে সন্দেহের অবকাশে অব্যাহতি দেওয়ার মত মনের ভাব তাদের ছিল না, অথচ ইতিহাসের পাতায় এই কলঙ্ক কাহিনী এমনভাবে সবিস্তারে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে যে তার সত্যতা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মহারাজা নন্দকুমারের নিজের ভাষায় বলতে গেলে "এতগুলো লোক পর পর বলেছে যে ছাগল ছানাটি কুকুর যে শেষ পর্য্যন্ত কুকুর বলেই তাকে মনে হল।"

মহারাজা নন্দকুমারের বিচার সংক্রান্ত সব দলিল পত্র পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। মনে হয় একটা মিথ্যা মোকদ্দমা ইতিহাসের পাতায় কত বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। নন্দকুমার সাধারণভাবে "পলিটিশ্যান" বললে আমরা যা বুঝি তাই—হয়ত ইংরেজীতে যাদের বলে "কেরিয়ারিষ্ট"। তার চরিত্রে ভাল-মন্দ, সাহস ও ভীরুতা, নীচতা ও উদারতা মিশ্রিত ছিল। নন্দকুমারের সম্পত্তির মূল্য ছিল অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকা। ৩৮ হাজার টাকার জন্য দলিল জাল করার প্রবৃত্তি তার হতে পারে এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট দপ্তরের দলিল পত্রে মহারাজা নন্দকুমারকে ব্রিটিশ বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আমাদের চোখে সেটা দোষ বলে মনে হওয়ার কোনও কারণ নাই। মহারাজা নন্দকুমার সম্পর্কে যেসরকারী দলিল পত্রের অনেক খোঁজ করা হয়েছিল; বিশেষ কিছুই এপর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি; শুধু মুঙ্গেরে নন্দকুমারের লিখা ১৭৭২ সালের একখানা

চিঠি পাওয়া গিয়েছে। চিঠিগুলো মহারাজার পুত্র শুকদাসকে লেখা; এর পাঠ উদ্ধার করা খুবই কঠিন। এতে আমরা পাই নন্দকুমারের পারিবারিক জীবনের করুণ ইতিহাস আর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখার তার আনন্দ। আমরা এই চিঠি যতটুকু পড়তে পারি তাতে এই বৃদ্ধ, কর্মঠ, রাজকার্যনিপুণ, ব্রাহ্মণের মূর্তি আমাদের চোখের সম্মুখে যেভাবে ভেসে ওঠে তার মোকর্দমার সব দলিল পত্র দেখলে তা হয়না।

বেসরকারি দলিল পত্র খোঁজ করতে আমরা বর্দ্ধমানে রাজবাড়ীতে যাই। সেখানে মুঘল আমলের ফারমানের যে সংগ্রহ আছে বাংলা দেশের আর কোথাও তা আছে কিনা সন্দেহ, আওরঙ্গজেবের আমল থেকে দ্বিতীয় শাহ আলম পর্য্যন্ত এই সংগ্রহ থেকে আমরা মুঘল আমলের জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা করতে পারি। বর্দ্ধমান ফারমান সংগ্রহের সঙ্গে মুসলমান রাজবংশের ফারমান পরওয়ানা ও নিশানগুলির তুলনা করলে আমাদের মোটামুটি মুঘল যুগের শেষের দিকের জমিদারি প্রথা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়। "সকল সুবার স্বর্গস্বরূপ সুবা বাংলার" মুঘল আমলের রাজস্ব সম্পর্কিত নিয়ম কানুন, সীমান্তবর্ত্তী ও স্থায়ী এলাকার জমিদারি প্রথার তারতম্য বুঝতে পারা যায়। গ্রাউত কমিশন রিপোর্টের ঐতিহাসিক ভূমিকায় অনেক অবান্তর কথার অবতারণা আছে। যদি এই ফারমান পরোয়ানা ও নিশান সংগ্রহ দেখে বৃটিশ আমলের প্রথমদিকের জমিদারি প্রথার বিবরণ লেখা হত তাহলে ঐ রিপোর্টের ঐতিহাসিক মূল্য অনেকটা বেশী হত।

কিন্তু ইতিহাস ত শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের ইতিহাস নয়, জনসাধারণের জীবন যাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে নানারূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহেরও প্রয়োজন। কিছুদিন আগে হুগলী থেকে একজন ভদ্রলোক তাঁর পূর্ব্বপুরুষের জমি, ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ, কোর্টের মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ, প্রজার জমি লওয়ার স্বীকারপত্র, টাকা ধার দেওয়ার তমসুক, কিছু পুরাতন মুদ্রা প্রভৃতির কথা পাঠিয়েছিলেন। বাংলা ১১০৬ সাল থেকে ১২২৬ সাল পর্য্যন্ত নানা ধরণের এরূপ ১০০ খানা দলিল পত্র তাঁর কাছে আছে। আপাতদৃষ্টিতে এসব খুবই মূল্যবান মনে হয়। আমাদের মত যারা পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েছে তারা জীবনযাত্রার ক্রত এত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে যে ৩০।৪০ বৎসর আগের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বর্ত্তমান সহরবাসীর ধারণা হওয়া প্রায় অসম্ভব। ১৫০।২০০ বৎসর আগে কিরূপ অবস্থা ছিল তার কল্পনা করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে; যত দিন যাবে ততই আরও কঠিন হয়ে পড়বে। সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দলিল পত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা খুবই ব্যাপক। শুধু অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক কেন অনেক ঐতিহাসিকও এই ধরণের দলিল পত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁদের ধারণা এসব আবর্জ্জনা—ঝরা পাতার স্তূপের মত ঝাঁটা দিয়ে দূরে ফেলে দেওয়াই ঠিক। বাংলাদেশের ইতিহাসের অনেক মৌলিক উপাদান এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এই সম্পর্কে গভর্নমেন্টের কিষ্ট্রিক্টের মহাফেজখানার দলিল পত্রের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা এ বৎসর আটটি জেলার মহাফেজখানার কিছু কিছু কাগজপত্র দেখেছি। জমিজমা সংক্রান্ত কাগজপত্রই বেশী পাওয়া যায়, তবে অন্য অনেক তথ্যও হঠাৎ চোখে পড়ে। এমন অনেক ঐতিহাসিক উপাদান আমরা এসব কাগজপত্রের মধ্যে পাই যা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাওয়া যায় না। স্থানীয় নানারূপ রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের অনেক বিশদ বিবরণ এখানে মেলে। ইংরেজীতে লেখা প্রায় ৩০০০ হাজার খণ্ড স্থানীয় পত্র সংগ্রহ বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসন সম্পর্কীয় যে তথ্য সরবরাহ করে তা এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করেন নি।

একটি উদাহরণ দিলেই এই ধরণের কাগজপত্রের ঐতিহাসিক মূল্য সহজেই বুঝতে পারা যায়। ১৮১৯ সালের কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠের সতীদাহের একটা ফর্দ্দ পাওয়া গিয়েছে। এক বৎসরে ৪টি থানায় ৫২টি সহমরণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সতীর নাম, জাতি, স্বামীর নাম, সৎকারের তারিখ, থানার নাম ও কয়টি ছেলেমেয়ে ছিল তার একটা দীর্ঘ ফর্দ্দ আছে। এই ৫২টি সতীর মধ্যে ২০জন ব্রাহ্মণ, ১০জন কায়স্থ, ২জন বৈদ্য, ২জন সদ্গোপ, ৫জন কৈবর্ত্ত, ৩জন ঘুগী, ২জন শুঁড়ী, ২জন মরয়া, ১জন কাঁসারী, ১জন ছুতোর, ১জন গোয়ালা, ১জন তেওয়ার, ২জন অন্ত্য জাত। বয়সের গড় ৫২ বৎসর ১০ মাস, ৭০ বা তার চেয়ে বেশী ১৩জনের বয়স ছিল। ২০ বৎসর বা তার চেয়ে কম বয়সের চারটি নাম পাওয়া যায়। একসঙ্গে দুই স্ত্রী সতী হওয়ার একটি মাত্র উদাহরণ আছে। দেখা যায় উচ্চনীচ ভেদে সব জাতির মধ্যেই সতীদাহ প্রচলিত ছিল; হয় তো উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলন কিছু বেশী ছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ৫২টি সতীর মধ্যে ৪০ বৎসরের কম মাত্র দশটি নাম পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালে বাংলাদেশে ৮০০টি সতীদাহ হয়েছিল। আমরা সব ডিষ্ট্রিক্টের দলিল পত্র দেখতে পেলে সামাজিক ইতিহাসে সতীদাহের স্বরূপ সম্পূর্ণ জানতে পারি।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর গৌড়-কামরূপ সংঘর্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

ভূতিবর্ম্মার বড়গাঁও লিপি এবং হর্ষবর্দ্ধনের নেত্রপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কামরূপ রাজগণ সম্রাট্ গুপ্তসংবতের ব্যবহার স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। আবার কামরূপরাজ সমুদ্রবর্ম্মা ও তন্মহিষী দত্তদেবীর নাম স্পষ্টতঃই গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ও তদীয় মহিষী দত্তদেবীর নামের অনুকরণ বলিয়া বুঝা যায়। এই সকল ঘটনা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে কামরূপে গুপ্তসম্রাট্গণের রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তারের সাক্ষ্য দেয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে গুপ্তসম্রাট্গণের দুর্ব্বলতার সুযোগে কামরূপরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন বলিয়া বুঝা যায়। এই যুগের কতিপয় কামরূপরাজকর্ত্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এই সিদ্ধান্তের সমর্থক।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত চারিটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকে উত্তর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়। এই চারিটি রাষ্ট্র—(১) আসাম ও উত্তর বাংলার কিয়দংশ লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য, (২) বাংলা ও বিহারের কিয়দংশ লইয়া গৌড় রাজ্য, (৩) বিহার ও উত্তর প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত মৌখরি রাজ্য, এবং (৪) পূর্ব্বমালবস্থিত উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন রাজ্য। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌গণ পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে পরস্পরের স্বাভাবিক শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং শত্রু রাষ্ট্রের অপরপার্শ্বে অবস্থিত প্রবলরাজ্যকে স্বাভাবিক মিত্ররাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতেন। উল্লিখিত চারিটি রাষ্ট্রসম্পর্কেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। গৌড়রাষ্ট্রের সহিত উহার পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত কামরূপ এবং পশ্চিমপার্শ্বস্থ মৌখরিরাজ্যের শত্রুতা ছিল বলিয়া জানা যায়; কিন্তু মৌখরিরাষ্ট্রের অপরপার্শ্বস্থ উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় রাজগণের সহিত গৌড়েরা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে মালবের উত্তরকালীন-গুপ্তবংশীয় নরপতি মহাসেনগুপ্ত গৌড়রাজ্যের মিত্ররূপেই কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে পূর্ব্ব পঞ্জাব অন্তর্ভুক্ত থানেশ্বর রাজ্যের পুষ্যভূতিবংশীয় রাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। পুষ্যভূতিবংশীয় প্রভাকরবর্দ্ধন মহাসেনগুপ্তের আত্মীয় ও মিত্র ছিলেন। কিন্তু মহাসেনগুপ্তের সিংহাসন দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পর তিনি মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন এবং মৌখরিরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। আনুমানিক ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং গৌড়রাজ শশাঙ্ক একযোগে মৌখরিরাজ্য আক্রমণ করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করেন। ইহার অল্পকাল পরে প্রভাকরবর্দ্ধনের

দ্বিতীয় পুত্র বিশ্রুতকীর্তি হর্ষবর্দ্ধন মৌখরিরাজ্যের সঙ্কটগণের সহিত সমরে অবতীর্ণ হন। কালক্রমে তিনি সমগ্র মৌখরিরাষ্ট্র করকবলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মালব এবং গৌড় সেনার সম্মুখীন হইবার পূর্বেই সুস্থিতবর্ম্মার দ্বিতীয় পুত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মাকে তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, পূর্ব্ব হইতেই কামরূপরাজগণ মৌখরিরাজাদিগের মিত্র ছিলেন। যাহা হউক, হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্করবর্ম্মার সমবেত চেষ্টায় পরিণামে গৌড়রাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে ভাস্করবর্ম্মা, গৌড়রাজধানী কর্ণসুবর্ণনগরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া জানা যায়। কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার হইতেই তিনি নিধনপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি দান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভাস্করবর্ম্মার একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে গৌড়-কামরূপ সংঘর্ষ সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কামরূপ জেলার দুবী নামক গ্রাম হইতে ভাস্করবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছিল। গৌহাটির আসাম প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত প্রেমময় চৌধুরী মহাশয় এই লিপিখানি আসাম রিসার্চ্চ সোসাইটীর পত্রিকায় (১২শ ভাগ, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৬-৩৩) প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিকগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ ও ব্যাখ্যায় কিছু ত্রুটি আছে সন্দেহ করিয়া আমি মূল তাম্রশাসন পরীক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের অনুগ্রহে আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। এই লিপিতে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মার মৃত্যুর অব্যবহিতপরবর্ত্তী ঘটনা সম্পর্কে চারিটি অত্যন্ত মূল্যবান্ শ্লোক দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, চৌধুরী মহাশয় এইগুলি সম্যক্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

শ্লোকগুলি এই—

যাবেতৌ প্রথমে বয়স্যপি পৃথুপ্রস্পর্দ্ধি সর্ব্বোদ্যমৌ
সাক্ষাৎসং বিধিনা প্রগল্ভা পিতরি ক্ষান্তিলীনে ক্রমাৎ।
প্রাপ্তে গৌড়বলে বলিন্যপি জলে বিস্রম্ভসংরম্ভতঃ
স্তোকৈরেব বলাচ্ছ্রুতাক্তি বলৈরৌ লীলয়োপস্থিতৌ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।
তত্রোপস্থায় যুদ্ধে হরিকুলিশবিতৈস্তূর্ণমাকর্ণপূর্ণৈ-
র্ব্বাণৈর্ব্বাণাসুরাজাবজিত কৃষবলৌ ভাবিবাবাপ্তদর্পৌ।
গৌড়ানাং লীলয়ৈব প্রবয়কবিষটাঃ ক্রৌঞ্চশৈলাবলীবদ্-
যদ্ধৌতেষামভেদ্যাং হতবিবিধরিপূণাক বাণৈর্যথা তৈঃ। স্রগ্ধরা।
নানাসায়কশক্তিচক্র কৃপণ প্রাসাসিঘাতৈঃ সিতৈঃ
কৃত্বা ব্যাকুল বিহ্বলং বলমহো তত্তূর্ণমেব দ্বিষাম্।
দ্বিত্রৈরেবক্ষরদ্ভোমবৈঃ সুবয়শচ্ছ্রৌ হি মোহং গতৌ
যস্যাস্তিঃ কবিণাং ঘটাভিরহিতৈর্ব্যাচেষ্টা চাসাদিতৌ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

দেশং স্বকং বিধিবশাদুপনীতযোক্ত্র
স্তৈঃ শত্রুভিঃ খলু বলোদ্ধতৈরেব।
প্রাপ্য ধরাজামচিরাৎপুনরাগতৌ তৌ
পিত্র্যাং জগদ্ভূমিমিন্দ্র ইবেন্দ্রতুল্যৌ। বসন্ততিলকা।

উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটির প্রথমার্ধে রাজা সুস্থিতবর্মার মৃত্যু এবং সুপ্রতিষ্ঠিত-বর্মা ও ভাস্করবর্মা নামক তাঁহার দুই বালক পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে যে, জলযুদ্ধনিপুণ প্রবল গৌড়সেনা কামরূপ আক্রমণ করিলে সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা ও ভাস্করবর্মা সামান্যমাত্র সৈন্য লইয়াও উহাদিগকে বাধা দিতে ভীত হইলেন না। ভ্রাতৃদ্বয়কে বল অর্থাৎ বলরাম এবং অচ্যুত অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বাণাসুরের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী বলরাম ও কৃষ্ণের ন্যায় দর্পান্বিত হইয়া ঐ দুই ভ্রাতা তাঁহের সাহায্যে গৌড়দিগের হস্তিসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। প্রথম শ্লোকে জল এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বাণাসুরের উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে, ব্রহ্মপুত্রনদের নিকটবর্তী বাণরাজের রাজধানী বলিয়া কথিত বর্তমান তেজপুরের সন্নিকটে উল্লিখিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দুটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মার মৃত্যুর অল্পকাল পরে দিগ্বিজয়ী গৌড়সেনা কামরূপরাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের সাক্ষ্য আরও মূল্যবান্।

তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা ও ভাস্করবর্মার বিরুদ্ধে গৌড়ীয় সেনা পরাজিতপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু হায়, গৌড়সেনার অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া দুই ভ্রাতা রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং শত্রুরা হস্তী দ্বারা ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিল। চতুর্থ শ্লোকের প্রথমার্ধে বলা হইয়াছে যে, দুই ভ্রাতা পরে শত্রুগণ অর্থাৎ গৌড়ীয়দিগের দ্বারা তাঁহাদের স্বদেশ অর্থাৎ কামরূপে নীত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ নাকি ছিল কতকটা দৈব এবং কতকটা তাঁহাদের উভয়ের গুণবত্তা যাহা হউক, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সুপ্রতিষ্ঠিত-বর্মা ও ভাস্করবর্মা পরাজিত হইয়া বন্দীভাবে গৌড়ে নীত হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌড়রাজ তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সম্বন্ধে তাঁহারা গৌড়রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার না করিলে ইহা সম্ভব হইত বলিয়া বোধ হয় না। চতুর্থ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে যে, অল্পকাল পরে ভ্রাতৃদ্বয় স্বরাজ্যে পুনরাগমন করিলে (অথবা স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে) তাঁহাদের পৈত্রিক দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। এই শ্লোকগুলি হইতে পূর্ব ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপর যে অনেকখানি নূতন আলোকপাত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত যুদ্ধ ভাস্করবর্মার জীবনের প্রথম ভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা

প্রায় ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ৬০৫—৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘটনাটি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে যে গৌড়রাজ বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন বলিয়া জানিতে পারি। কিন্তু তিনি ইহার কতকাল পূর্ব্বে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। সুতরাং এই কামরূপবিজয়ী গৌড়রাজ শশাঙ্ক কিংবা তদীয় পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়েশ্বর হইবেন, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়

কয়েকমাস পূর্ব্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মৃত্যুসংবাদ পি, টি, আই-ঘটার মারফৎ এদেশে পৌঁছায়। অধ্যাপক লাস্কির তিরোধান নানাদিক দিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাবধারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছিলেন। এই ত্রিশ বত্রিশ বৎসরে তিনি অগণিত পুস্তক, পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ করিয়া নিজের চিন্তাধারার ও সৃষ্টিভঙ্গির ছাপ জগতের চিন্তাধারার ও বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীর উপর রাখিয়া গিয়াছেন। এই ছাপ সহজে মুছিয়া যাইবে না বলিয়াই বিশ্বাস।

প্রথম মহাযুদ্ধের অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সুস্থিতের সহিত সমাপন করিয়া কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। সেখানে অল্পদিন কাজ করিবার পর তাঁর ডাক আসে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড হইতে। এইরূপে অধ্যাপকরূপে কয়েক বৎসর এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিবার সুযোগ তিনি পান। এই সুযোগ ও সুবিধা তিনি নানাভাবে ফলপ্রসূ করেন। প্রথমতঃ হার্ভার্ডে থাকিবার সময় প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার চিন্তাধারার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। নানা বিভাগে বন্ধুত্ব বহু আমেরিকানের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয় সে সম্বন্ধেও তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা তিনি পরে এদেশে আরও কয়েকবার আসিয়া ঝালাইয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রভাবশীল জাতি সম্বন্ধে

তাঁহার জ্ঞান ছিল প্রত্যক্ষ ও সুগভীর। হার্ভার্ডে থাকিবার সময় একদিকে তিনি যেমন এই জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন, অপরদিকে আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং কিছুদিনের মধ্যেই *The Problem of Sovereignty* ও *Authority in the State* প্রকাশিত করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অধ্যাপক লাস্কি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে ফিরিয়া প্রথম কয়েক বৎসর London School of Economics and Political Science এবং Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার হিসাবে অতিবাহিত করেন। তারপর তাঁহার পদোন্নতি হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Reader এবং পরে Professor হিসাবে গত পঁচিশ বৎসর তিনি London School of Economics and Political Science-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তাঁহার জীবন ছিল কর্ম্মবহুল। প্রথমতঃ একটির পর একটি পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করিয়া তিনি তাঁহার ভাবধারার সঙ্গে জগতের পরিচয় করাইয়া দেন। অনেকেই তাঁহার পুস্তক প্রকাশের বহর দেখিয়া আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইতেন, অনেকে ঈর্ষান্বিত হইয়া গালিও দিতেন। তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় ছিল *A Grammar of Politics*. এই পুস্তক সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রেরা সকলেই এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির সহিত পরিচিত। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে *The Rise of European Liberalism*, *Democracy in Crisis*, *Liberty in the Modern State*, *The State in Theory and Practice*, *Parliamentary Government in England*, *The American Presidency*, *Reflections on the Revolution of Our Time* এবং *American Democracy* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব কয়টি পুস্তকই জ্ঞানগর্ভ ও সুলিখিত। তাই বলিয়া সকলগুলি ত্রুটিবিহীন নয়। ত্রুটিবিচ্যুতি সকল পুস্তকেই অল্পবিস্তর থাকে। লাস্কি সম্বন্ধে সমালোচকদের প্রথম মন্তব্য হইতেছে যে তিনি বেশী লিখিতেন এবং সেই কারণে এক পুস্তকে যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই আবার পরবর্ত্তী পুস্তকে পুনরাবৃত্তি হইত। এই মন্তব্য কেবল আংশিকভাবেই সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহার উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে আমেরিকান পণ্ডিতেরা খুসী মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে এবং আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে লাস্কির বহুল অভিজ্ঞতা ও সুগভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু তবুও তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানি (*American Presidency*) দুই কারণে মার্কিণ পণ্ডিতেরা সুনজরে দেখেন নাই। প্রথমতঃ আমেরিকারই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (Indiana University) বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়া তিনি সেই

দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠান (Presidency) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা লাস্কির পক্ষেও দুষ্টতা বলিয়া অনেক আমেরিকান অধ্যাপকের মনে হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আশা করিয়াছিলেন যে তিনি ইংলণ্ডের কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ *American Presidency* সম্বন্ধে এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইনের দিক এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে গভীর আলোচনা হইতেছিল। লাস্কির বক্তৃতাগুলি লেখা হিসাবে পরিষ্কার ও চিত্তাকর্ষক হইলেও তেমন গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, কাজেই আমেরিকার অধ্যাপকেরা এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। *American Democracy* তাঁর শেষ লেখা। এইখানি একটি বৃহৎ গ্রন্থ। অনেকে মনে করিয়াছিলেন পুস্তকখানি গত শতাব্দীতে রচিত *Bryce*-এর *American Commonwealth*-এর তুল্য স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু আমেরিকান পাঠকদিগের কাছে এই গ্রন্থের মূল্য তত্তটা হয় নাই। এই পুস্তকখানি তথ্যবহুল হইলেও তথ্য অপেক্ষা তাহার সমালোচনাতেই ইহার অধিকাংশ স্থান পূর্ণ। আবার সমালোচনা-গুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একপেশে।

উপরে যে কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে লাস্কি রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এই দুই বিষয়েই অনেক কিছু লিখিয়া জগৎকে উপহার দিয়াছেন। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বাদ দিয়া তিনি সমাজ গড়িতে চান নাই। কোনরূপেই dictatorship প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর চিন্তাধারার প্রতিকূল ছিল। এই কারণে তাঁর পক্ষে communist হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন করিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁর মনে বিশেষ দ্বিধা ছিল যে বিনা বিপ্লবে সমাজ ও রাষ্ট্রের এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে কি না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি মনে করিতেন যে ইংলণ্ডেও এই পরিবর্ত্তন বিনা বিপ্লবে হইবে না। এই বিশ্বাস তিনি তাঁর *Democracy in Crisis* এবং *Parliamentary Government*-এ বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে যদিও তিনি communist ছিলেন না, তিনি বিপ্লববাদী ছিলেন। Fabian Society-র সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন কিন্তু এই বিষয়ে অন্যান্য Fabian-দিগের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ছিল। তবে এই কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে ১৯৪৫ সনে Labour Government ক্ষমতায় হইবার পর লাস্কি রাষ্ট্রে ও সমাজে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন চাহিতেন তাহা অনেকটা বিনা বিপ্লবেই সাধিত হয়। ইহাতে লাস্কি নিজের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা জানি না। লাস্কি রাষ্ট্র এবং গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। Idealist দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকে যে চক্ষে দেখিতেন

pluralist Laski যে চক্ষে রাষ্ট্রকে দেখিতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ ছিলেন। তিনি মনে করিতেন সাধারণ লোকেরা যে গভর্ণমেণ্টকেই রাষ্ট্র বলিয়া ধরিয়া লয়, এই ধারণাই সত্য। গভর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্রের প্রতিভূ বলিয়া গ্রহণ করিলে কেবল তর্কাতর্কি বৃদ্ধি পায়, লাভ কিছুই হয় না।

লাস্কি সম্বন্ধে লিখিতে বসিলে অনেক কথা মনে আসে। কিন্তু এই বিশেষ আলোচনায় এখানে প্রয়োজন নাই। কেবল আর দুইটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটি লাস্কির লিখিবার ভঙ্গী সম্বন্ধে। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার দখল ছিল অসামান্য। তিনি এই ভাষাকে কামার মত যে ভাবে ইচ্ছা গড়িয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিতেন। বৃহৎ গ্রন্থগুলিতে গম্ভীর বিষয় আলোচনা করিবার সময়ও তাঁহার এই কৃতিত্বের পরিচয় আমরা প্রতি লাইনে পাইয়া থাকি। কিন্তু তার চাইতেও তাঁর ভাষার শক্তি ও হৃদয়গ্রাহিতা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁর ছোট ছোট রচনাগুলিতে। মহাযুদ্ধের সময় *New Statesman and the Nation* কাগজে তিনি চার্চ্চিলের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই sketchটি পড়িয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এরূপ বিশ্লেষণ ইংরাজী ভাষাতেও অল্পই আছে। লেখক হিসাবে তাঁহার স্থান চার্চ্চিলের সমান কিন্তু ভিন্ন আসনে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ ছিল তার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। তাঁকে সত্যিকারের ভারতবন্ধু বলা যাইত। এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দান অল্প নয়।

লাস্কির মৃত্যুতে একজন প্রতিভাবান চিন্তানায়ক ও ভারতবন্ধুর তিরোধান হইল।

ঐতিহাসিক মেকলে

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সমসাময়িক কালের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করলেও মেকলের ঐতিহাসিক খ্যাতি আজ নিষ্প্রভ। এডিনবরা রিভ্যুর প্রবন্ধাবলী হাতে নিয়ে সীজারের মত তিনি ইতিহাস-জগতে প্রবেশ করেছিলেন—ইংলাণ্ডের ইতিহাস প্রকাশ পর্য্যন্ত তাঁর জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন বিজয় অভিযান। কিন্তু সে যুগেরই একাধিক বিখ্যাত ঐতিহাসিক—কার্লাইল, মিল, গ্রাডে—তাঁর দোষত্রুটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে মেকলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। সিলি, বিউরি, লর্ড অ্যাক্টন প্রভৃতি মনীষীর বিচারে মেকলের দোষগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। পাঠক সমাজের বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ কঠোরতর হয়। এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়নি, মেকলে স্মৃতির সপ্তম স্বর্গ হ'তে নিন্দার পঙ্কশয্যায় নেমে এসেছেন। স্যার জি, এম, ট্রেভেলিয়ানই বোধ হয় একমাত্র প্রথিতযশা ঐতিহাসিক যিনি পূর্ব্বসূরির (তথা পূর্ব্বপুরুষের) পক্ষ আজো অবলম্বন করে আছেন।

গভীরভাবে অনুধাবন করলে বিশেষজ্ঞদের মতের বা পাঠকরুচির এই পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হয় না। প্রশংসার আতিশয্যের প্রতিক্রিয়া রূপে নিন্দার আতিশয্য খানিকটা অবশ্যম্ভাবী, ঐতিহাসিক উপাদানের অধুনাতন প্রাচুর্য্য ও সহজ লভ্যতা মেকলের রচনাকে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু এর বাহ্য, কালের এই ধর্ম্মকে কোন ঐতিহাসিক জয় করতে সক্ষম নন। মেকলের প্রতি আধুনিক যুগের বিরাগের প্রধান কারণ দুটি—ইতিহাসের আদর্শের উল্লেখযোগ্য আর যুগধর্ম্মের তথা দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন।

মেকলের কালে ইতিহাস সাহিত্যের অন্যতর শাখারূপে পরিগণিত হত। প্রধান ছিল রচনাশৈলী, বাচনভঙ্গী, বর্ণনা-কৌশল। ইতিহাসের উপাদান সন্ধান বা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করবার কোন নৈর্ব্যক্তিক, অপক্ষপাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠেনি ; গবেষণার পদ্ধতি ও বিচারের মানও ছিল অজ্ঞাত। আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে বস্তু-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেলেও তা গভীর কিংবা নিরাসক্ত ছিল না। ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত মতবাদ তাঁর প্রতিপাদ্য ও সিদ্ধান্ত গুলিকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত এমনকি আচ্ছন্ন করত। অবশ্য প্রত্যেক ঐতিহাসিক অনধিকার আসন বিদ্বা সংস্কার ও শ্রেণী স্বার্থের অবচেতন মুখপাত্র. তথাপি বর্ত্তমানে তাঁকে এমন কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, এমন একটি কঠিন শৃঙ্খলার অনুসরণ করতে হয় যার ফলে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বা মতামত

তাকে সচেতন ভাবে বিসর্জন দিতে হয়। আপন প্রাথমিক কল্পিতার্থ (hypothesis) সম্বন্ধে সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয় বিচার-শক্তিকে, তার পথ সন্দেহ সংশয় বিশ্লেষণ বর্জ্জনের পথ—নির্বিচার গ্রহণের নয়। ব্যক্তিগত অভিমত সমর্থন বা প্রমাণ করবার জন্য তিনি উপাদান খোঁজেন না, উপাদানের বিজ্ঞানসম্মত বিচারই তাঁকে সিদ্ধান্তের অভিমুখে অনিবার্য্যভাবে নিয়ে চলে। বিউরির ভাষায়—"History is a science: nothing more, nothing less." ইতিহাস সাহিত্যের শাখা নয়, বিজ্ঞান—তবে পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নের মত নয়, তার প্রকাশকে আরো সহজে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া চলে, তবে সেই সাহিত্যিক রূপ দেওয়া ঐতিহাসিক বলেই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নয়, যেমন জ্যোতির্বিদের কর্ত্তব্য নয় নক্ষত্রলোকের কাহিনী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা।

এই প্রসঙ্গে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের এডিনবরা রিভ্যুতে মেকলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কি ক্লাসিক কি আধুনিক কালে সর্ব্বদোষমুক্ত ঐতিহাসিকের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তিনি বলছেন—ইতিহাসে তথ্য ত' অতি স্থূল উপাদান। আদর্শ ঐতিহাসিককে জানতে হবে শুধু আঁকতে নয়, বং ফলাতেও।...ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে সত্য হতে পারে না, এইখানে তার সঙ্গে চিত্রশিল্পের মিল রয়েছে। সম্পূর্ণ সত্য হতে গেলে তাকে প্রতি তুচ্ছতম ঘটনার ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির খবর দিতে হয়, কিন্তু ভাল ছবি ও ভাল ইতিহাস সত্যের এমন দিক্‌গুলি উদ্‌ঘাটিত করবে যাতে সমগ্রের রূপটি ফুটে ওঠে। ছবির মতই পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নির্ব্বাচন ও প্রতিফলনের উপর ঐতিহাসিকের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। কোন কোন ঘটনাকে বৃহৎ পটভূমিকায় বৃহৎ করে দেখাতে হবে, কোন ঘটনাকে ক্ষুদ্রাকারে, অধিকাংশ ঘটনাই দিগন্তের অস্পষ্টতায় বিলীন হয়ে যাবে—শুধু দু একটি তুলির টানে তাদের মিলিত ফলের সাধারণ একটা ধারণা দিলেই যথেষ্ট।...

দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যবর্ত্তী সীমান্তে ইতিহাসের স্থান—সে দুটি হল যুক্তি ও কল্পনা। এই উভয় প্রভু যদি তাকে ত্যাগ করে নিত—ভালই হত। কিন্তু তা হয় না। ইতিহাস কখনও এক প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা আরেক প্রভুর—কখনও তা হয় উপন্যাস, কখনও বা দর্শন। (It is sometimes fiction it is sometimes theory. কিংবা অন্যত্র—History, at least in its state of ideal perfection is a compound of poetry and philosophy. অর্থাৎ আদর্শ ইতিহাস কাব্য ও দর্শনের মিশ্র ফল।) অলঙ্কার বাদ দিয়ে মেকলের প্রতিপাদ্য হল এই—কল্পনার আশ্রয় ঐতিহাসিককে নিতে হয় এবং নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে কল্পনা যেন প্রাপ্ত তথ্যকে অতিক্রম বা বিকৃত না করে।

কল্পনা ও যুক্তি—এই বিপরীতগামী অশ্বদ্বয় ইতিহাসের রথে যোজনা করে সাবলীল গতিতে চলতে চেয়েছিলেন মেকলে—দুর্ভাগ্যের বিষয়, সারথ্য কৌশলের

P 2 7 2 1 2

অভাবে বারংবার তাঁর রথ হয়েছে একদেশদর্শী, তথা পথভ্রষ্ট। এইখানে বিউরি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের আদর্শের কাছে তাঁর পরাজয়। বৈজ্ঞানিক বস্তু-নিষ্ঠা ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেও অপূর্ব কলা-কৃতির পরিচয় দিয়েছেন বিউরি, মেইটল্যাণ্ড, লর্ড অ্যাক্টন। কে বলবে এঁরা শুধু dryasdust? অথচ উক্ত গুণের অভাবে মেকলের রচনা অধিক ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত। অলঙ্কারের কুজ্ঝটিকা যুক্তির সূর্যকে করেছে আবৃত, ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি স্বার্থ শ্রেণী-বোধ বিনষ্ট করেছে প্রাচ্য বিদ্যাকোবিদ ঐতিহাসিকের অবিচল অপক্ষপাত।

তাঁর 'ইংলণ্ডের ইতিহাসে' বিশেষ করে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীতে (Critical & Historical Essays) এই আদর্শ-চ্যুতি বিবিধ দোষের আকর হয়েছে। উদ্দাম অতিশয়োক্তি সর্বত্র পরিস্ফুট, বিচারবুদ্ধির সমতা (balance) দুর্লভ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব উপাদানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করেই কল্পনার সাহায্যে তিনি অসমসাহসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, কখনও বা কল্পনার রং চড়িয়ে বাস্তবের রূঢ়তা পরিমার্জিত করতে চেয়েছেন, আপন রাজনৈতিক মতবাদকে প্রচণ্ড বেগে সমর্থন করেছেন, বিপক্ষের মতবাদকে অনাবশ্যক তীব্র আক্রমণ করেছেন। কোথাও তাঁর মতামতের মধ্যে অনিশ্চয়তা নেই, মন্তব্যের মধ্যে দ্বিধা নেই, সর্বত্র বিরাজ করছে এক উগ্র আত্মবিশ্বাস, আক্রমনোদ্যত স্থির নিশ্চয়তা।

বেকন, ক্র্যানমার, লড্, ষ্ট্রাফোর্ড, প্রথম চার্লস, তৃতীয় উইলিয়াম, মার্লবরো ওয়ালপোল, চ্যাথাম, ক্লাইভ, হেষ্টিংস, ফ্রেডরিক দি গ্রেট, মেকিয়াভেলি—মেকলের বর্ণিত চরিত্রগুলি সবই অতিশয়োক্তি-দোষে দুষ্ট।

প্রথম চার্লসের জীবন ছিল—'বিশ্বাস এক বিরাট প্রহসন', তিনি ছিলেন—"a tyrant, a traitor, a murderer and a public enemy"। মনে হয় উত্তেজনার আবেগে আত্মবিস্মৃত মেকলে ঘরগ্রাম বাড়িয়ে চলেছেন। লড্ ছিলেন—"a ridiculous old bigot." ষ্ট্রাফোর্ডের দেশপ্রেম—"only the coquetry of political prostitution." দার্শনিক বেকন পেয়েছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অথচ রাজনৈতিক বেকনের প্রতি করা হয়েছে ঘোরতর অবিচার। ক্র্যানমার ও লর্ড বার্লে সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে—তা মেকলের এলিজাবেথীয় যুগ সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়ই দেয়। মেকিয়াভেলি, স্পেনীয় উত্তরাধিকার বিষয়ক যুদ্ধ, ফ্রেডরিক দি গ্রেট শীর্ষক তিনটি নিবন্ধই অতি দুর্বল। মেনেদাঁসের প্রকৃত তাৎপর্য মেকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, অ্যানের মতবার ছাড়া স্পেন বা ফ্রান্সের রাজনীতি প্রসঙ্গ অত্যন্ত অবাস্তব—মেকলের ব্যক্তিগত বিরুদ্ধ মনোভাব ফ্রেডরিকের যে আধা শয়তান আধা ভাঁড় মূর্তিটি ফুটিয়ে তুলেছে তা কার্লাইলের বীর চরিত্রের চেয়ে ঢের বেশী অনৈতিহাসিক। ফ্রেডরিকের দোষগুলি অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে, যেন

প্রাসিয়ার স্রষ্টা ছিলেন তব কলপা প্রভৃতি মানবিক গুণবর্জিত বিশ্বাদেতা বৈরাচারী মাত্র। এর সঙ্গে মেকলের আদর্শ চরিত্র তুলনীয়। সমস্ত 'ইংলাণ্ডের ইতিহাস' ব্যাপ্ত করে কোলোদাসের মত বর্তমান এই রাজপুরুষটির প্রতি আরোপিত গুণগুলি মর্ত্যের নয়, স্বর্গবাসী দেবতার। ক্লাইভের আংশীর প্রাপ্তি সমর্থন করা হয়েছে এবং যদিও হেষ্টিংস সম্বন্ধে মেকলেকে 'defamer' আখ্যা দেওয়া হয় তথাপি উপসংহারে হেষ্টিংস সম্বন্ধে আপন গোপন শ্রদ্ধা প্রকাশ না করে তিনি পারেন নি। কল্পনার উদ্দাম সকরণ উক্ত নিবন্ধদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য। আবিষ্কারের যুগে যে প্রাচ্য জগৎ ইউরোপের মনে স্বপ্নময় এল্‌ডোরাডোর স্বপ্ন জাগাত সেই এলা-লবঙ্গ-দারুচিনি-মুক্তাখচিত, কার্পাসচীনাংশুক-মসলিন-ঝলসিত, হীরা-মণি-কোহিনুর-দীপ্ত প্রাচ্য জগতের বর্ণবৈচিত্র্য দিয়ে ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের অর্থলোভ ও সাম্রাজ্য-লিপ্সা ঢাকা দেওয়া হয়েছে।

মিল্টন, হ্যালাম ও ম্যাকিনটসের সমালোচনা প্রসঙ্গে মেকলে প্রথম আপনার রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সুরু করেন। ষ্টুয়ার্ট বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেই তাঁর প্রথম বিদ্রোহাত্মক, সেই প্রথম বিদ্রোহী পার্লামেন্টের ও ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পক্ষসমর্থন, বিপ্লবকে বিধাতার ন্যায়-বিধান প্রতিপন্ন করার প্রয়াস এবং তার অনুকরণে ছইগদলের বন্দনাগান। টোরী ঐতিহাসিক হিউমের সমালোচনা দিয়ে এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত। হিউম সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—"has pleaded the cause of tyranny with the dexterity of an advocate while affecting the impartiality of a judge." 'Tyranny' শব্দটির স্থলে 'liberty' শব্দটি বসিয়ে দিলেই মন্তব্যটি মেকলের সম্বন্ধে হুবহু খাটে। বিচারক হবার মত ন্যায় বোধ তাঁর ছিল না, বিপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণকে ছিন্ন করবার মত প্রখর বুদ্ধি ছিল বটে—আপন পক্ষের সাক্ষীদের স্বার্থবিরোধী প্রশ্ন করবার বিবেক ছিল না।

এই তিনটি প্রবন্ধে এবং ইংলাণ্ডের ইতিহাসে—প্রধান উপজীব্য হল সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহবিরোধ এবং ১৬৮৮-র গৌরবময় বিপ্লব। মেকলের মতে এই বিরোধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের বিরোধ। ইংলাণ্ড যদিও এর যুদ্ধক্ষেত্র তথাপি এর ফলাফল ইংলাণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে বিজড়িত ছিল বিশ্বজগতের স্বাধীনতার সমস্যা। গৌরবময় বিপ্লবে সে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হল। বিশ্বব্যাপী এই সুরাসুরের দ্বন্দ্বে (titanic conflict) স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করলেন মেকলে এবং স্বাধীনতার বিজয়ে লক্ষ্য করলেন দৈবশক্তির লীলা। আশ্চর্য নয় তাঁর কণ্ঠে Isaiah ও Jeremiahর সুর বেজে উঠবে—একযোগে বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ ও ভাবীযুগের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

হ্যালাম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন তাঁর আর যে দোষই থাক, পক্ষপাতিত্ব দোষ

নেই—যা অনেকের থাকে: "So there is often a portion of willing credulity and enthusiasm in the veneration which the most discerning men pay to their political ideals." মেকলে সম্বন্ধে এমন প্রযোজ্য উক্তি বিরল। আপন রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মেকলে দেখিয়েছেন অতিবিশ্বাস এবং অত্যুৎসাহ। তিনি সমর্থন করেছেন মৃতমুকুলীন পার্লামেন্টপন্থী ও ক্রমওয়েল-বাহিনীর অত্যাচার, দীর্ঘ পার্লামেন্ট, প্রটেক্টরেট ও কমন্‌ওয়েল্‌থের আতিশয্য। ছাপাখানের প্রতিবাদস্তরে তিনি দীর্ঘ পার্লামেন্টের সমর্থনে যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা সর্বত্র গ্রাহ্য নয়। তৃতীয় উইলিয়মের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ক্রমওয়েল ছিল তাঁর আদর্শ। ১৬৬০-হতে ১৬৮৮ খৃঃ অঃ পর্যন্ত কালকে অতি কঠোর এমন কি অমার্জিত ভাষায় ('wild & monstrous harlequinade') নিন্দা করেছেন তিনি। যদিও এ যুগের সমর্থনে বলার বিশেষ কিছু নেই, স্বীকার করতে হয় রাজনীতি দলাদলির হীনতায়, শাসনের নীচতায়, ব্যভিচারের কলুষে পঙ্কিল তথাপি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি কেন শুধু নিবদ্ধ থাকবে রাজদরবারের দিকে? ইংলণ্ড বলতে শুধু দ্বিতীয় চার্লসকে বা তাঁর প্রসাদভোগী পারিষদমণ্ডলীকে বোঝায় না।

বিপ্লবের প্রধান নায়ক তৃতীয় উইলিয়ম মেকলের আদর্শ পুরুষ (hero). "Since Octavius the world had seen no such instance of precocious statesmanship." তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা, মানসিক বিবর্তনের প্রতি স্তর, চিন্তাধারা, শাসননীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি মেকলে উচ্ছ্বসিত স্তুতির বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিরোধী পক্ষ—হুইগ ও টোরী নির্বিশেষে—পড়েছে অন্ধকারে যাতে কেন্দ্রগত উইলিয়মের চরিত্রে সব আলোটুকু এসে পড়ে। এমন কি মেকলে বলেছেন—গৌরবময় বিপ্লব কেবল তৃতীয় উইলিয়মের জন্যই গৌরবময়। রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত ভুল করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কাপুরুষতা দেখিয়েছে—তারা ছিল শাসন নীতি, বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে অন্ধ। তাদের সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর আত্মবাদমূলক দলাদলি ঝুলিয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনে একত্রিত করেছেন তৃতীয় উইলিয়ম,—রক্ষা করেছেন বিপ্লবের সুফলগুলি—হুইগদের অতিরিক্ত উৎসাহ থেকে, টোরীদের হীন ষড়যন্ত্র থেকে, চতুর্দশ লুইয়ের লোভ থেকে। তাঁর জন্য শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি, জনগণের বহু ত্যাগার্জিত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

কি সেই সুফলগুলি? বিপ্লবের কোন মৌল নীতি তিনি রক্ষা করেছেন? ১৬৮৮-র বিপ্লবকে সপ্তদশ শতাব্দীর সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান কেন বলব? কারণ তা "Of all revolutions the least violent, it has been of all revolutions the most beneficent. Its highest eulogy is that it was our last revolution." তা ফরাসী বিপ্লবের মত ধ্বংসাত্মক নয়, একাধিক

বিপ্লবের জন্মদাতা নয়—অহিংসতম শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব। "It is because we had a preserving revolution in the Seventeenth Century that we have not had a destroying revolution in the 19th.···For the authority of law, for the security of property, for the peace of our streets, for the happiness of our homes, our gratitude is due, under Him who raises up and pulls down nations at His pleasure, to the Long Parliament, the Convention and William of Orange." আইন ও শৃঙ্খলা, সম্পত্তির নিরাপত্তা সুখ ও শান্তির জন্য ধন্যবাদ ভগবানকে—লং পার্লামেন্ট, কনভেনশান ও তৃতীয় উইলিয়মকে। অবসান হল আইনসঙ্গত স্বেচ্ছাচারের যুগ—রাজকীয় ক্ষমতায় বলে কর আদায় বা সম্পত্তি অধিকার অসম্ভব হল, রাজকীয় বিচারালয়ের প্রসার—ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ সাধনের সুপরিকল্পিত প্রয়াস—অসম্ভব হল, রাজতন্ত্র পার্লামেন্টের তথা জনগণের চরম সার্বভৌম ক্ষমতায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। Bill of Rights ও Bank of England এই দু'টি শক্তির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার প্রাসাদ নির্মিত হল। (পরে আমরা দেখব এ কোন বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির অগ্রদূত।) যদিও Toleration Act সম্পূর্ণভাবে ধর্মবিরোধের সমস্যা সমাধান করে নি—তবুও প্রটেষ্টাণ্ট নন্-কনফরমিষ্টরা এতদিনে স্বাধীন ধর্মমত পোষণ ও আচার পালনের অধিকার লাভ করল, মুদ্রণ ও প্রকাশনার অর্থাৎ মতামত প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। ছইগরা উইলিয়মকে বৈধ রাজা (dejure) বলে স্বীকার করল, টোরীরা স্বীকার করল তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব (defacto); ফলে অ-চিরকালে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করল।

কিন্তু ঐতিহাসিকের অনপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মেকলে ইংলণ্ডের ইতিহাস বিচার করেন নি, গৌরবময় বিপ্লবরূপ গস্পেলের তিনি ছিলেন সেণ্ট পল। লর্ড অ্যাক্টন বলেছিলেন ইতিহাসকে দাঁড়াতে হবে তথ্যের উপর, ব্যক্তিগত মতামতের উপর নয়। মেকলে এই নীতির সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবাদ। তিনি বোঝেননি যে সকল ভাবনা ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্য—ইতিহাসের ক্ষেত্রে তারা কতকগুলি শক্তিমাত্র—তারা শুধু দিক নির্দেশ করে। তাদের যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে, কিন্তু কোনমতেই ধ্রুব বলে প্রতিষ্ঠা করা চলবেনা। মেকলে আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তথ্য উপেক্ষা এমনকি গোপন করেছেন। ম্যাকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—মেকলে ভেনিস, মডেনা, ফ্লোরেন্স, অষ্ট্রিয়া ও ব্র্যাণ্ডেনবার্গের রাজকীয় দপ্তর মোটেও খুঁজে দেখেন নি, অধিকাংশ স্থলে সমসাময়িক প্রচার পত্র ও প্যাম্ফলেটকে একমাত্র উপাদান বলে গ্রহণ করেছেন। New Examen লেখক

John Paget আরো গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতে মেকলে তথ্য গোপন করেছেন, তারিখ বিভ্রাট ঘটিয়েছেন, বেনামী কলঙ্ক রটনাকে দিয়েছেন গুরুত্ব। মার্লবরো ও পেনের (Penn) উপর মন্তব্য এমনি বিকারপ্রসূত। অথচ কোথাও তিনি জানান নি কোথায় তাঁর মন্তব্য সংশয়াচ্ছন্ন, কোথায় বা সামন্ত্রিক—ভবিষ্যৎ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। Bagehot আশ্চর্য হয়ে বলেছেন "History being a vestige of vestiges there must be uncertainties and gradations of doubt"—এই অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের লক্ষণ মেকলের রচনায় কোথায়?

আসল কথা—পক্ষপাতিত্বের জন্য জ্ঞানের অভাবে নয়—মেকলে তাঁর আমলের যে সকল উপাদান সহজলভ্য ছিল তার সাহায্য নিয়েছেন—পক্ষপাতিত্বের উদ্ভব চরিত্রিক দুর্বলতায়। তাই প্রশ্ন উঠবে কেন তাঁর চরিত্রে দুর্বলতা এল? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মেকলের সমসাময়িক খ্যাতি এবং পরবর্তীকালের অখ্যাতির রহস্য নিহিত।

মেকলের দুর্বলতা তাঁর যুগের মনোধর্ম বিশ্লেষণ করলে বোধগম্য হবে। ঐতিহাসিক মেকলের বিষয়বস্তু নির্বাচন, উপাদান সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ব্যবহার প্রণালী, বর্ণনা ও রচনারীতি, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, দোষ ও ত্রুটি সব কিছুর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর যুগ—আর তাঁর শ্রেণী। তিনি ছিলেন তাঁর শ্রেণীর মুখপাত্র, তাঁর যুগের প্রতিনিধি। যুগকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন বলে যুগও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তিনি এবং তাঁর যুগ পরস্পরের অংমিকা (ego)-র মুকুর। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর থেকে যে সকল শক্তি টোরী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় হুইগদল সহজেই তার নেতৃত্ব লাভ করে। তার পশ্চাতে শুধু ফক্স, যে প্রকৃতি সংস্কারকামী নেতার ঐতিহ্যই ছিল না—পেশাদার রাজনৈতিক ও আদর্শবাদী দার্শনিকের (Philosophical Radicals) দল থেকে সংগ্রহণ প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৬৮৮-র গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ধনিক সম্প্রদায় উৎপাদনের উপাদানগুলি হস্তগত করতে আরম্ভ করে, কিন্তু তখনও তা দুর্বল থাকায় ও শ্রেণী-সচেতন না হওয়ায় ভূস্বামিকারী শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ না করলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে তারা আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের প্রসাদে তারা যখন প্রচণ্ড শক্তি আহরণ করল—তখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হল—স্বার্থের তাগিদে। রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি বারংবার ব্যাহত হচ্ছিল প্রতিক্রিয়াশীল টোরীদের প্রতিবন্ধকতায়। সুতরাং ধনতন্ত্রের নিরঙ্কুশ বিকাশের জন্যই তারা রাজনৈতিক

সংস্কারের উপর জোর দিচ্ছিল। ছইগদলকে এই শ্রেণীর মুখপাত্র ভাবতে হবে—সপ্তদশ শতাব্দী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই তাদের প্রকৃত ভূমিকা।

এই আলোকে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংঘর্ষ বিশ্লেষণ করতে হবে। পার্লামেণ্ট চেয়েছিল রাজার স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রিত করতে—তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পার্লামেণ্টকে চরম আইনসভারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এমন প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় যা শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবেই ক্ষান্ত না হয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। বলা বাহুল্য উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের অভাবে—সংগঠন ও সংখ্যাধিক্যের ফলে এই চেষ্টা বিফল হয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ষ্টুয়ার্ট বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল বটে—তবে নূতন ভিত্তির উপর। রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপ অপরিবর্ত্তিত থাকলেও—সবাই স্বীকার করে নিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যাসের Trust মত, পার্লামেণ্টই সে ন্যাসের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করে দেবে। দ্বিতীয় জেম্‌স্ এই পরিবর্ত্তন অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন বলে গৌরবময় বিপ্লবের প্রয়োজন হল। গৌরবময় বিপ্লব ক্রমওয়েলের আপোষ-মীমাংসাকে আরও বাস্তব রূপ দিলে—তার ব্যাখ্যা করলে, তার সীমা নির্দ্দেশ করলে। হব্‌সের সামাজিক চুক্তি বাতিল হয়ে স্বীকৃত হল লকের সামাজিক চুক্তি।

ষ্টুয়ার্ট স্বৈরতন্ত্র যে নীতিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল তা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা। রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য রাজতন্ত্র ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি মুদ্রানীতি সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল। শুধু নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণী নয় সকল শ্রেণীর নিকট এই হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় এমনকি ক্ষতিকর বলে পরিগণিত হয়েছিল। ল্যাস্কির ভাষায়—"The men who made the Revolution of the seventeenth century were seeking to find ways of limiting the operation of authority which would give them security of person and property." কিন্তু কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। বিপ্লব বলতে হ্যাম্‌ডেন ক্রমওয়েল বা বুঝতেন—লিলবার্ণ তা বুঝতেন না, আবার গ্যারার্ড উইনষ্ট্যানলি, ডিগার ও লেভেলারদের ধারণা ছিল অন্যরূপ। ক্রমওয়েল রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন বহুবিত্তশালী বণিক শ্রেণীকে, লিলবার্ণ সহরবাসী স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, উইনষ্ট্যানলি ভূমিহীন প্রলিটারিয়েটকে। সুতরাং বিত্তশালী শ্রেণী যে আপন বিত্তের জন্য ভীত হয়ে বিপ্লবের অবসান এবং পূর্ব্বতন শাসনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করবে—এতে আশ্চর্য্য কি? এই আপোষ-কামী মনোভাব থেকে, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের রেষ্টোরেশান-এর জন্ম হল। 'Richest he' 'poorest he'র ইউটোপিয়া বরদাস্ত করতে রাজী হল না।

কিন্তু ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ইংল্যাণ্ড—প্রথম চার্লসের ইংল্যাণ্ডের থেকে অনেকদূর

এগিয়ে গেছে। এই ইংল্যাণ্ড হবস্, হ্যারিংটন, পেটি, লক ও নিউটনের ইংল্যাণ্ড। রাজতন্ত্র ও চার্চকে এক সর্ত মেনে নিতে হল—অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলবে না। পরমতসহিষ্ণুতা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে স্বীকৃত হল—কারণ অসহিষ্ণুতা বা অত্যাচার ধনোৎপাদন ও ধনবর্দ্ধনের পক্ষে ক্ষতিকর। ফলে ক্যাথলিক, পিউরিটান, অ্যাংগ্লিকান প্রত্যেক স্বৈরাচারী ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল। দেখা গেল নন্‌কনফরমিষ্টরা উদ্যম, মিতব্যয়িতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতি নাগরিক গুণে কারও চেয়ে হীনতর নয়। চার্চ এবং রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই আমরা তাই উদারনৈতিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয় লক্ষ্য করি। সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কানে প্রগতির মন্ত্র শোনাল। প্রগতি যে কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে সম্ভব এই বিশ্বাস দৃঢ় হল বুর্জোয়া মনে। লক বলেন, যেমন বিশ্বজগতে কোথাও স্বৈরাচারের স্থান নেই—আছে যুক্তি ও প্রাকৃতিক বিধান—তেমনি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও স্বৈরাচারের স্থান নেই। গ্রোসিয়াস বলেন,—এই প্রাকৃতিক বিধান থেকে জন্ম হয় কতকগুলি প্রাকৃতিক অধিকার বা মানুষের সহজাত। বলা বাহুল্য এতে বুর্জোয়া শ্রেণীর দার্শনিক ভিত্তি রচিত হল। ব্যক্তির কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে সমগ্র জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির রহস্য নিহিত, এ কথা সপ্তদশ শতাব্দীর দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মমত, অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা সকলেই স্বীকার করে নিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্রমবর্দ্ধমান ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য স্বাধীন বাণিজ্যনীতির সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিল। রাজকীয় একচেটিয়া ব্যবসায় বা বাণিজ্য ব্যাপারে রাজকীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ডাডলেনর্থ, রোজার কোক প্রভৃতি অর্থতাত্ত্বিক এবং মান্ ও চাইল্ডের মত কাস্থ বাণিজ্যপতির মন্তব্য যুগধর্মের দ্যোতক।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ যখন রেষ্টোরেশনের মূলনীতি অগ্রাহ্য করতে চাইলেন তখন গৌরবময় বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠল। এই সামাজিক চুক্তি ভঙ্গের অর্থ বুর্জোয়া শ্রেণীর সদ্যলব্ধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিলুপ্তি। রিচার্ড হার্লি ১৭১০ খৃষ্টাব্দে এই সংঘর্ষের স্বরূপ এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অনিবার্য পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য : 'The single authority of his (king's) prerogative proved but an artificial and precarious power, unable long to hold out against the real and natural power of property, which was now so largely vested in the people that when they had found the way to put their affairs into a method, and came to feel their own strength, they were able to bear down all before them.' রাজা বা অভিজাত শ্রেণীর নিকট জনগণের স্বার্থ অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ আর উৎসর্গিত হবে না, যাতে উক্ত শ্রেণী স্বাধীন সম্পত্তির উপর সার্বভৌম

কর্তৃত্ব পায় তার জন্য চাই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র। ১৬৮৮র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল—তা সম্পত্তির অধিকারীদের স্বাভাবিক শাসকশ্রেণী বলে প্রতিষ্ঠিত করল। সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব—রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়—যে রাজবংশ ব্যবসা বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে। সেই রাজবংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেছিল, বুর্জোয়া শ্রেণীর শুরুত্ব অস্বীকার করেছিল তাই

The springs of property were bent
And wound so high they cracked the government.

হ্যাম্পডেন, মাসেল এই শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং এঁরাই ১৬৮৮-র হুইগ। সার্ধ একশতাব্দী পরে ১৮৩২-এর শাসন সংস্কার যে হুইগদের হাতে শাসনভার অর্পণ করল তাঁরা এদেরই আধ্যাত্মিক সন্তান। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইতিমধ্যে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ঘটেছে শিল্প-বিপ্লব, ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর চাহিদার রূপান্তর ঘটেছে। বণিকতন্ত্রের শক্তি অবসিত হয়েছে, ধনতন্ত্র এখন আশ্রয় করেছে দেশীয় শিল্পকে। সেই শিল্পপতিদের হাতে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তাদের মুখপাত্ররূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক প্রভুত্ব দাবী করে বসেছে। তাদের দাবীকে প্রাকৃতিক অধিকার (natural right) বলে প্রচার করবার জন্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক রূপ দেবার জন্য, তাদের শ্রেণীগত ও দলগত স্বার্থকে জাতিগত স্বার্থরূপে প্রতিপন্ন করবার জন্য কৌশলী ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হল। লর্ড যে কাজ করেছিলেন বণিকতন্ত্রের জন্য, মেকলেকে আহ্বান করা হল ধনতন্ত্রের জন্য সেই কাজে। তাঁকে বলতে হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—"natural representative of the human race."

ঐতিহাসিক মেকলের জন্ম এমনি পরিপ্রেক্ষিতে। মনে রাখতে হবে যাঁরা মেকলেকে শুধু হুইগ ঐতিহাসিক বলেন তাঁরা হুইগ শব্দটির পুরো ব্যাখ্যা দেন না। তিনি ১৮৩২ সালের হুইগ—১৬৮৮-র হুইগ নন। ১৮৩২-এর হুইগ অর্থে বুঝতে হবে ফক্স, গ্রে, মাসেলকে,—যাঁরা ক্যাথলিকদের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছেন, ১৬৮৮-র হুইগ ছিল রক্ষণশীল, তাদের সহিষ্ণুতা এত বেশী ব্যাপক ছিল না; ১৮৩২-এর হুইগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে চায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুইগরা বহুক্ষেত্রে শাসন সংস্কারে বাধা দিয়েছে; ১৮৩২-এর হুইগ অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না, তাদের নীতি এ্যাডাম স্মিথের নীতি, ম্যাকেঞ্জারের নীতি—১৬৮৮-র হুইগ অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এত প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেনি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে—যেমন ভারতীয় ক্যালিকো-মসলিন বেশমের আমদানীর বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যা ছিল ১৬৮৮-তে রূপাকারে তাই

পরিণত পূর্ণাঙ্গ হয়েছে ১৮৩২-এ,—বুর্জোয়া স্বার্থের তাগিদে ধর্ম, শাসন সংস্কার ও অর্থনৈতিক পলিসির ক্ষেত্রে ১৬৮৮ যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করেছিল ১৮৩২-এ তারই চরমাবস্থা। উভয় যুগের হুইগের (এবং টোরীর) এক জায়গায় মিল অটুট রয়েছে—ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা উভয়ের জীবনদর্শনের মূলভিত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং তৎকল্পে সম্পত্তির মালিকদের শাসনাধিকারের ন্যায্য দাবী উভয়েই রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

মেকলে পরিবর্ত্তিত অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন—তিনি তাই প্রগতিশীল হুইগ দলে অর্থাৎ যারা ১৬৮৮-র আবহ বুর্জোয়ার বিপ্লবকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চায় তাঁদের দলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব এবং তৎপ্রসূত বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলির পটভূমিকায় ১৮৩২-এর শাসন-সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, আরও অবশ্যম্ভাবী ১৬৮৮-র বিপ্লবকে প্রকৃতির এমনকি বিধাতার বিধান বলে প্রতিপন্ন করা (apotheosize)। তার মধ্যে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্বের মূল সমর্থন নেই—সেই প্রভুত্বের স্বীকৃতিতে সমগ্র জাতির মুক্তি ও প্রগতি, এমন মতের সূক্ষ্ম প্রচারও আছে, আছে ১৮৩২-এর সংস্কারকে চরম সংস্কার রূপে উপস্থাপিত করার কুটিল যুক্তি।

আর আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ১৮৩২-এর হুইগ বিজয়ে অবসান হল টোরী শাসনের মূঢ় দুঃস্বপ্ন, যেমন ১৬৮৮-র বিপ্লবে অবসান হয়েছিল ষ্টুয়ার্ট স্বৈরতন্ত্রের তমিস্রা। হুইগ নেতৃত্বের ফলে জন্ম হল নূতন এক যুগ—শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রসারের যুগ। তখনও ধনতন্ত্রের বিস্তার সীমাহীন, উপনিবেশ শোষণের মুনাফা ক্রমবর্ধমান। বুর্জোয়া শ্রেণী, যারা হুইগদলের পৃষ্ঠপোষক—তারা তৃপ্ত তাই উদার, বর্দ্ধমান লাভের হারে তথা প্রগতিতে বিশ্বাসী, অমিত তাঁদের আত্মপ্রসাদ, অগাধ আত্মপ্রত্যয়: মেকলের ভাষায়—"the most enlightened generation of the most enlightened people that ever existed."

মেকলের মনকে ভিক্টোরীয় যুগের আদিপর্বের প্রসারশীল সংকটসম্ভাবনাহীন ধনতন্ত্রের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াগুলি গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি হয়েছেন উৎপাদক শ্রেণীর সীমাহীন আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদের প্রতীক। দেশের আর্থিক উন্নতি ও হুইগ বিজয় এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে তাঁর অবচেতন মনে জড়িয়ে গেছে যে তার কোন অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ বা ত্রুটি সন্ধানের কথা তিনি ভাবেননি। হুইগ রাজনীতি ও ম্যাকেঞ্জীর অর্থনীতি যে স্বর্গরাজ্যের পথ প্রস্তুত করেছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাঁর চোখে ধনতন্ত্রের কুশ্রীরূপগুলি ধরা পড়েনি (যেমন পড়েছে ডিকেন্স বা কার্লাইলের চোখে) শুধু নির্ব্বাধ অগ্রগতির রূপ ধরা পড়েছে, তাই তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ, যেমন চার্টিষ্ট আন্দোলন, তিনি সহ্য করেননি। শাসনাধিকার সম্প্রসারণে, তাঁর ভয় ছিল, হয়তো তাতে শ্রেণীস্বার্থ ব্যাহত হবে।

১৮৩২ সালের ৩রা মের বক্তৃতায় তিনি পার্লামেন্টকে সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর চোখে বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্ণধার হইগরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর রূপে দেখা দিয়েছিল। আশ্চর্য নয় তিনি এই পরিবেশে হইগ বিজয় নাট্যে মনোনিবেশ করবেন। সেই বিরাট পরিকল্পনার যে সামান্য অংশটুকু পরিণতি লাভ করেছে—তা হল ১৬৬০ হতে উইলিয়াম ও মেরীর রাজত্ব সমাপ্তি পর্যন্ত—অর্থাৎ প্রস্তাবনামাত্র। প্রস্তাবনার মধ্যেই ফুটে উঠেছে সমগ্র নাটকের মূল সুর—ধনতন্ত্রের একটানা বিকাশের, বুর্জোয়া শ্রেণীর একটানা রাজনৈতিক অগ্রগতির ছন্দে বাঁধা। আর্নল্ড টয়েনবি এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—"He took it for granted—without warrant—that he himself was standing on terra firma, secure against being engulfed in that ever-rolling stream in which Time had borne all his less privileged sons away." ইংল্যাণ্ডের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা কোন আঘাতেই বিচলিত হবেনা, যখন অন্যান্য দেশ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কালের প্রবাহস্রোতে ভেসে যাবে—ইংল্যাণ্ড দাঁড়িয়ে থাকবে অক্ষয় অব্যয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই আশ্বাসবাণীর প্রয়োজন ছিল। সমগ্র ইউরোপে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলে উঠেছে, লামার্টিন ও লুই ব্লাঁ ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন, লাঁ সি মোঁ ও প্রুধোঁর মুখে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাতাসে প্রত্যাশিত শ্রমিক শ্রেণীর চার্টিষ্ট দাবী বিঘোষিত। মেকলে দেখালেন সর্বগ্রাসী বিপ্লবের উত্তাল উর্মিশীর্ষে বুর্জোয়ার বিপ্লব-রচিত রাষ্ট্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নিরাপদ নিরুপদ্রব দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে ইংল্যাণ্ড—কেবল একাই সে দিতে পারে শান্তি ও স্বাধীনতার, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির ধ্রুব ইঙ্গিত। ধন্যবাদ সেই শ্রেণীকে—যে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রচনা করেছিল এমন অটল ভিত্তি। তার নীতি, মূল্যবোধ, মান—সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ বা অর্থনৈতিক সমালোচনার অতীত। তার নির্ভাব নিরঙ্কুশ চরিতার্থতায় ব্যক্তির এবং জাতির চরিতার্থতা। সেই মৌলনীতির স্বীকৃতি ও সমর্থনে শুধু ভ্রষ্টমার্গ কন্টিনেন্টের আত্মনাশমূলক শ্রেণী-সংগ্রাম হতে আত্মরক্ষা নেই, আছে আপন জাতীয় বিপ্লবের গৌরবময় ঐতিহ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অনুরূপ পরিস্থিতিতে কার্ল মার্কস্ দেখলেন ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি, ধনিক শ্রমিকের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের পরিণামে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী জয়। একই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিবিধ অনিবার্য প্রতিক্রিয়া—কার্ল মার্কসের কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টো ও মেকলের ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস।

বস্তুতঃ মেকলের জীবদ্দশায় এই ভিত্তির মূলে আঘাত পড়েনি—অন্তর্বিপ্লব

নিঃসংকট ছিল ধনতন্ত্র—তাই মেকলের বাজত্ব ছিল ধ্রুব। বর্তমানে যেগুলি তাঁর দোষ বলে পরিগণিত হয় সেগুলিই ছিল সমসাময়িক যুগে খ্যাতির কারণ। তাঁর রচনাশৈলী ছিল স্বচ্ছ উচ্ছল স্রোতস্বিনীর মত—সে যুগের অপরিণত মনকে আন্দোলিত করবার পক্ষে উপযোগী। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সংযম ও সত্যবোধ নেই—আছে কাহিনী রচনার কৃতিত্ব, ডিকেন্সীয় রুচি গল্প ও উপন্যাসেই তৃপ্ত হত বেশী। তাতে ছিল রাজনৈতিক বক্তৃতা বা বিতর্কের আতিশয্য, ব্যঙ্গ ও উইটের অনিক্রীড়া—যুক্তিতর্কে অলঙ্কার ব্যবহারের চাল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্লামেন্টে এমন বক্তৃতার কদর খুব বেশী ছিল, চোটপুটে এর মত হাতিয়ার ছিল না। গিবন যেখানে একটি বিশেষণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন দীর্ঘ এক ভাবধারা সেখানে মেকলে ব্যয় করেছেন পুরো এক অধ্যায়। কালক্রমে এমন রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। কিন্তু এরও গভীরে যে যুগধর্মের প্রচায় ছিল—যুগধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য গেল নিঃশেষ হয়ে। থুকিডিডিস বা গিবনের রচনা এমন ভাবে যুগধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যোগযুক্ত নয়। সেখানে ঐতিহাসিক নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক ও নিরপেক্ষ অনুভূতির প্রসাদে সমসাময়িক যুগকে কিছুটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে—উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা মানব সমাজের চিরন্তন সমস্যার রাজ্যে। ইতিহাসে কল্পনার স্থান নিয়ে মেকলে অনেক শুকাসক্তি করেছেন—কিন্তু যে কল্পনা সৃষ্টিশীল অথচ আত্ম-বিশ্বাস্য, যার উৎস নিরাসক্ত জ্ঞানে ও গভীর সহানুভূতিতে—সে কল্পনা মেকলের কোথায়? থুকিডিডিস এথেন্সবাসী হয়েও এথেন্সবাসীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সমস্ত গ্রীক জগৎটিকে তার চরম সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পর্য্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন—স্পার্টার প্রশংসা করতে তাঁর বাধেনি। অসম্ভব ছিল মেকলের পক্ষে অন্য দলের বা ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য জাতির গুণকীর্ত্তন, এমন অন্ধ ছিলেন তিনি জাতিগর্ব্ব ও শ্রেণী স্বার্থের সংস্কারে। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের ও গৃহযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি—অর্থনৈতিক ইতিহাসের কোন উপাদান না পেয়েও থুকিডিডিস এথেন্স ও স্পার্টার বিরোধের অর্থনৈতিক রূপটি শুধু বোধি (intuition)-বলে ধরতে পেরেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না কি? এটি না থাকলে সে ইতিহাস শ্লেষের হত্যাকাণ্ড, সপ্তদশীয় অবরোধ, জেম্‌সের নিন্দা ও উইলিয়ামের স্তুতিতে পর্য্যবসিত হত। মিল বলেছেন গ্রোটের ছিল simple veracity, মেকলের তা ছিল না। তিনি বিস্মিত করতে চেয়েছেন বর্ণনা দ্বারা—ব্যাখ্যা দ্বারা নয়। ফল যা হয়েছে তাকে সিলি 'drowsy spell of narrative' বলে খুব অন্যায় করেন নি। বস্তুতঃ যে ইতিহাসের লেখক সর্ব্বদেশদর্শী, সত্যনিষ্ঠ ও অপক্ষপাত, যে ইতিহাসের আঙ্গিক সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ সত্যের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত—এবং যার মধ্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পূর্ণ

সম্প্রতি বিদ্যমান—সেই ইতিহাস শ্রেষ্ঠ ও চিরজীবী। অন্যান্য ইতিহাস মরণশীল ফুলের মত।

মেকলের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি আর কতদিন টিকবে জানি না, তবে তাঁর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও নিরর্থক নয়। একটি বিশেষ যুগের বিশেষ, যদিও সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত, দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এরও প্রয়োজনও আছে, কারণ সত্য যদি ইতিহাসের লক্ষ্য হয় তবে স্বীকার করতেই হবে—সত্যে উপনীত হবার বাধা অনেক। আমরা বিভিন্ন যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও উপলব্ধির তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারাই সত্যের সন্ধান পাব। সেই অর্থে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে ভিক্টোরীয় যুগের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ উপেক্ষণীয় নয়। যুগোত্তর অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে মেকলের খ্যাতি আজ বিলুপ্তপ্রায়—আবার সেই জন্যই তিনি মূল্যবান্ ভিক্টোরীয় সংস্কৃতির প্রতীকরূপে, বুর্জোয়া মানসের প্রতিবিম্বরূপে।

টয়েন্‌বির মতামত

শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার

১

প্রায় পনের বৎসর আগে আর্ণল্ড্‌ টয়েন্‌বির বিরাট গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডের আবির্ভাব ঐতিহাসিকদের জগতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের ছাত্রদের মহলেও তখন তার ঢেউ এসে পৌঁছায়। তারপর ক্রমে ক্রমে সে-স্পন্দন থেমে এসেছে, প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় কেটে গেছে। ক্লাসিক বা সনাতনী রচনা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে সে-রচনা লোকে প্রশংসা করে কিন্তু পড়ে না। টয়েন্‌বির লেখা এখন খানিকটা সেই মর্যাদা পেয়েছে বলা চলে। ইতিমধ্যে আরও তিন খণ্ডের প্রকাশ টয়েন্‌বির দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও পরিস্ফুট করে তুলেছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য ছয় খণ্ডের একটা সংক্ষিপ্তসারও এখন পাওয়া যায়—তার সম্পাদক হলেন সামারভেল। মূল পরিকল্পনা তেরটি ভাগে বিভক্ত ছিল; তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি ভাগ এখন পর্য্যন্ত পাঠকের হাতে আসা সত্ত্বেও টয়েন্‌বির বক্তব্য আজ পশ্চিম জগতে সুবিদিত। 'ইতিহাস' পত্রিকায় তাই তার লেখার পরিচয় ও যৎসামান্য সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

২

বহুকাল ধরে ইতিহাসকে খণ্ডখণ্ডভাবে দেখার অভ্যাস আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই গতি থেকে ফেরিয়ে আসতে পারাটাই আর্ণল্ড্‌ টয়েন্‌বির প্রধান কীর্তি। তাঁর বিষয়বস্তু হ'ল মানুষের সমগ্র ইতিহাস। বিপুল আয়োজন ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে এমন প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন নি, যদিও ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টির ইঙ্গিত প্রসঙ্গক্রমে অনেকের লেখাতেই দেখা গেছে। ইঙ্গিতের রেখাকে পূর্ণচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও চিন্তার প্রসার দরকার টয়েন্‌বির লেখায় সেই গুণ তাঁকে ইতিহাসের ইতিহাসে অমরত্ব করে রাখবে। তাঁর মতবাদকে গ্রহণ না করেও একথা বলা চলে, কেন না চিন্তার জগতে বিরাট পরিকল্পনা মাত্রেরই একটা স্থান আছে; তেমন কীর্তিকে মেনে না নিলেও মনে রাখতে হয়।

ইতিহাসকে সমগ্রভাবে না দেখবার অভ্যাসের মূলে রয়েছে যুগধর্ম্ম—কথাটা টয়েন্‌বিরই নিজস্ব। পণ্যোৎপাদন প্রণালী বর্ত্তমানযুগে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বিশেষজ্ঞদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়, ঐতিহাসিক-বিশেষের আলোচনার ক্ষেত্রও তেমনি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। যে-মমসেন এক সময় এক বিশাল ইতিহাস রচনা করেছিলেন, পরিণত জীবন তিনি কাটালেন রোমান লিপিমালা ও শাসন পদ্ধতির

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে। র‍্যাঙ্কেরের পরিকল্পনা ছিল স্বাধীনতা বিকাশের সমগ্র ইতিহাস রচনা করবেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞের আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হ'তে গিয়ে তিনি দেখলেন যে উপাদান সংগ্রহের কাজেই জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল। কেম্ব্রিজ ইতিহাস-মালা অথবা লাভিস্-এর গ্রন্থগুলিতে বিশেষজ্ঞরা ফ্যাক্টের পসরা সাজিয়ে বসেছেন, বিস্তারিত জ্ঞানলাভের জন্য তার অপরিহার্য্য মূল্য আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সমগ্র ধারণা খুঁজতে গেলে সেখানে হতাশ হ'তে হয়। ইয়োরোপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানকে ফিশার অল্পকথায় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, কিন্তু ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ইতিহাসের সমগ্র রূপ দেখবার বল থেকে তিনি বঞ্চিত। প্রকৃত বিশেষজ্ঞের মতনই তার জন্য তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই।

অথচ মানুষের মনে ব্যাপক দৃষ্টির একটা আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়, থাকাটাই স্বাভাবিক। সাধারণ ঐতিহাসিক তাতে সাড়া দেন না, নিজস্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এত বেশী যে তা সম্প্রসারিত করা দুঃসাধ্য, আর তার বাইরের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। ইতিহাসের ব্যাপক ব্যাখ্যায় আবার বিপদ আছে, জ্ঞানের অভাবে সেখানে ব্যাখ্যা অনেক সময় একদেশদর্শিতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। টয়েন্‌বির ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এই যে তাঁর মধ্যে বিস্তারিত জ্ঞান ও মৌলিক প্রতিভার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছে। অবশ্য জ্ঞান ও প্রতিভা সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তাই টয়েন্‌বির ব্যাখ্যায় ভুল হওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা তাঁকে দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত করেছে তার জন্য ইতিহাসের সকল ভক্তই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

৩

ইতিহাসের ব্যাপক আলোচনার মধ্যে আবার টয়েন্‌বি অপেক্ষাকৃত সহজ পথার অনুসরণ করেন-নি, মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লেখাকে এইচ জি ওয়েল্‌সের সমগোত্রীয় বলা চলে না, সমাজ জীবনের বাহ্যিক ঘটনার বিবৃতি অথবা মানুষের কীর্ত্তির কাহিনী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয়বস্তু নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ইতিহাসের গতির তুলনামূলক বিচার, সভ্যতার উত্থান-পতন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সত্য বা নিয়মের নির্দ্ধারণ। তিনি ইতিহাসের বিবরণ লিখতে প্রবৃত্ত হন নি, ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন, তার একটা বিশেষ ব্যাখ্যা ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-পথের বিপদ অনেক। অল্পজ্ঞানের ফল এখানে মারাত্মক, কিন্তু সারা জীবনের সাধনা তাঁকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে। ব্যাপক ব্যাখ্যা অতি সহজেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে কিন্তু টয়েন্‌বির লেখার প্রাঞ্জলতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। অবশ্য ইতিহাসের সমগ্র রূপ অথবা ধারা সম্বন্ধে একমত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই

অন্ত। ইতিহাসের ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে ব্যক্তি, জাতি অথবা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের উপর। তাই টয়েন্‌বির উদ্যমের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার পরও তাঁর বিশিষ্ট মতবাদকে অগ্রাহ্য করা শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক-ও। তবে মতখণ্ডনের চেষ্টার আগে মতকে বোঝার চেষ্টা অপরিহার্য।

আজকের দিনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে দেশ বা জাতিবিশেষ ইতিহাসের সার্থক আধার। টয়েন্‌বি প্রথমেই দেখিয়েছেন যে ইংল্যাণ্ডের মতন তথাকথিত স্বতন্ত্র দেশের জীবনেও প্রধান ঘটনাবলী বুঝতে হ'লে দেশের বাহিরের সামাজিক অবস্থা না জানলে চলে না। কোনও দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ নয়, অংশবিশেষের পরিচয় পেতে গেলে একটা বৃহত্তর সমগ্রতার রূপ উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু এই বৃহত্তর ক্ষেত্র জগদ্ব্যাপী হ'বার প্রয়োজন দেখা যায় না। অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ডকে বুঝতে গেলে সারা জগতের ইতিহাস জানতে হবে এমন কথা নিরর্থক। এক কথায়, কোনও একটা দেশ বা জাতি ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একটা বৃহত্তর সভ্যসমাজের মধ্যে তার স্থান রয়েছে। কিন্তু সারা জগতে তেমন সমাজ সংখ্যায় একাধিক; একই সময় পৃথিবীতে পাশাপাশি কয়েকটি সভ্যসমাজ থাকতে পারে। প্রত্যেক সভ্যসমাজের একটা বিশেষ সত্তা আছে, পরস্পরের থেকে তারা স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে বোধগম্য। কিন্তু প্রতি সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি একের সঙ্গে অপরে গভীর যোগসূত্রে বাঁধা, তাদের মিলন অত্যন্ত নিবিড়।

টয়েন্‌বির মতে আজকের দিনে সারাজগতে পাঁচটি সভ্যসমাজের অস্তিত্ব চোখে পড়ে—পাশ্চাত্য জগত, পূর্ব্ব ইয়োরোপের সনাতনী খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলিম জাতিগুলি, হিন্দু সভ্যতা এবং সুদূর প্রাচ্য। তালিকার দ্বিতীয় ও শেষ সমাজ দুটিকে আবার বিভক্ত করা সম্ভব। খৃষ্টান সনাতন সমাজের দুই অংশ—দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপ ও রুশ অঞ্চল। সুদূর প্রাচ্যেরও দুই ভাগ—চীন এবং জাপান-কোরিয়া। বর্ত্তমান সভ্যসমাজের সংখ্যা তাই সাত-ও বলা চলে। অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ পৃথিবী গ্রাস্ করতে উদ্যত হয়েছে, আমরাও তাই এখন 'এক জগৎ'-এর কথা বলে থাকি। কিন্তু এই ঐক্য আর্থিক ও রাষ্ট্রিক, তার ঝোঁকে নিতান্তই সাম্প্রতিক ও অসম্পূর্ণ। সভ্যতার প্রাণ হ'ল এক বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিগত ঐক্য এখনও সুদূরপরাহত।

কিন্তু কোনও সভ্যসমাজ চিরস্থায়ী নয়, সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, স্থবিরতা ও ধ্বংস আছে। এখনও হিব্রু অথবা পার্শীদের মতন গোষ্ঠী চোখে পড়ে যারা আগেকার কোনও সমাজের 'ফসিল' (fossil) মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের বিশ্লেষণে দ্বিতীয় ধাপ এই পূর্ব্বতন সভ্যসমাজগুলির অনুসন্ধান। সভ্যসমাজ কথাটার উপর জোর পড়ে এইজন্য যে এদের নিয়েই ইতিহাসের কারবার। মনুষ্যজাতির জীবনে অবশ্য অগণিত সমাজের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেশীর ভাগই অসভ্য সমাজ। অসভ্য

সমাজের নিদর্শন আজ পর্যন্ত অসংখ্য বর্ণের গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা ইতিহাসের এলাকার বাইরে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হ'ল জীবিত কি মৃত সভ্য সমাজের আলোচনা।

টয়েন্‌বি আজকের দিনের সাতটি ছাড়া অতীতে আরও চৌদ্দটি বড় সভ্য সমাজের সন্ধান পেয়েছেন। মোট এই একুশটি সমাজ নিয়ে তাঁর তুলনামূলক আলোচনা। এদের উৎপত্তি, বিকাশ, বার্ধক্য ও মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য। যে পাঁচ ভাগ অথবা ছয় খণ্ডে তাঁর রচনা এখন পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে তাঁর বক্তব্য এই সাধারণ নিয়মেরই সবিস্তার ব্যাখ্যা।

সভ্যতা মূলতঃ এক, এই ধারণাকে টয়েন্‌বি খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে এ-ধারণার হেতু হ'ল আজকের দিনে পশ্চিমের জগদ্ব্যাপী আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব। পশ্চিমী ঐতিহাসিকেরা অন্য সভ্যতার খোঁজ রাখেন না, অন্য সংস্কৃতির উপর তাঁদের শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু সভ্য মানুষের ষাট শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে এবং আজকের দিনের তথাকথিত ঐক্যও সম্পূর্ণ স্থায়ী হবে কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য যে টয়েন্‌বির দৃষ্টিভঙ্গীতে এক সাধারণ উৎস থেকে বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তির ধারণারও স্থান নেই, প্রাচীন মিশর থেকে আদি সভ্যতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই diffusionist মতবাদ তিনি একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন।

ঠিক আর একদিক থেকে আপত্তি আসতে পারে যে সভ্যতা মূলতঃ বহুধা হ'লে তাদের মধ্যে কি তুলনা চলে? টয়েন্‌বি বলেন যে মানুষের তিন লক্ষ বৎসর অস্তিত্বের মধ্যে সভ্যতার বয়স মাত্র ছয় হাজার বৎসরের বেশী নয়। সুতরাং এক হিসাবে সকল সভ্য সমাজই সমসাময়িক। আর মূল্যবিচারের দিক থেকে একদিকে অসভ্য অবস্থা ও অন্যদিকে মানুষের যে-চরম সিদ্ধি সম্ভব এই দুই-এর তুলনায় প্রায় সকল সভ্যতার কীর্তিই প্রায় একই স্তরের ব্যাপার। ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনার পরিবেশ আলাদা বটে, কিন্তু টয়েন্‌বির মতে ঘটনার আলোচনা করতে করতে ঐতিহাসিক একটা সামঞ্জস্যজ্ঞান অর্জন করেন, তার উপরই তুলনামূলক বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৪

ইতিহাসে অনেক সভ্যসমাজের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং তাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু এরা কি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সম্পর্কহীন সত্তা? সামান্য আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে দুইটি সভ্যসমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা বিচিত্র নয়। যোগাযোগের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে সুস্পষ্ট।

কারণ, প্রাচীন গ্রীস-রোমের সঙ্গে আধুনিক ইয়োরোপের অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে অথচ এই দুই সভ্যতাকে এক ও বলা চলে না। এক্ষেত্রে প্রাচীন অথবা হেলেনিক সমাজকে পাশ্চাত্য ইয়োরোপের জননী বলা স্বাভাবিক। সুতরাং এক সভ্যতার পক্ষে অপর এক সমাজের সন্তান বা জননী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টয়েন্‌বির মতবাদে একুশটি সভ্যসমাজ ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটাই সব চেয়ে সুবিদিত কথা। একুশটির মধ্যে ছয়টি স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ অন্য কোনও সমাজ থেকে এদের উৎপত্তির চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই ছয়টি সভ্যতা হল—মিশরীয়, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিয়ান, প্রাচীন চৈনিক, ইজীয় বা পলিনেশিয় মিনোয়ান, সুমেরীয় এবং মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা স্বয়ম্ভু না সুমেরীয় সমাজের সন্তান এ নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথম দু'টি—অর্থাৎ মিশরীয় এবং আণ্ডিয়ান সমাজ শুধু স্বয়ম্ভু নয়, সন্তানহীনও বটে। প্রাচীন চৈনিকের সন্তান সুদূর প্রাচ্যের বর্তমান সভ্যতা, সে-সভ্যতা আবার চীন ও জাপান-কোরিয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত। মিনোয়ান সভ্যতা থেকে হেলেনিক ও সিরিয়াক সমাজ অন্ততঃ আংশিকভাবে উত্থিত হয়েছিল। আর সুমেরীয় থেকে আসে বাবিলনীয় ও হিটাইট সভ্যতা। মায়া সভ্যতার সন্তান হ'ল মেক্সিকো আর য়ুকাটনের দুটি সমাজ—তারা আবার স্পেনের দিগ্বিজয়ের সময় মিশ্রিত হয়ে এক হবার উপক্রম করছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অবশ্য পরবর্তী হিন্দু সমাজের জননী। অর্থাৎ সাতটি আদি সভ্যতার সন্তান আরও নয়টি সমাজের সন্ধান পাওয়া গেল। এর পর তৃতীয় পুরুষে আরও পাঁচটি সভ্যতা চোখে পড়ে। সিরিয়াক সমাজ থেকে উৎপন্ন হয় ইরানী আর আরবী সমাজ—ষোড়শ শতকে এই দুই-এর সংমিশ্রনে সম্মিলিত মুস্‌লিম সভ্যতার উদয় হ'ল। আর হেলেনিক সমাজ থেকে জন্ম নেয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সনাতনী খৃষ্টীয় সমাজ। শেষেরটি আবার এখন দুই ভাগে বিভক্ত—দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপ এবং রুশ অঞ্চল।

সভ্যতার পূর্বতালিকায় অবশ্য এখানেই শেষ নয়, কারণ একুশটি বড় সভ্যতা ছাড়াও অন্য সভ্যসমাজের কিছুটা চিহ্ন পাওয়া যায়। টয়েন্‌বি তাদের ব্যর্থ সভ্যতা ও জীবন্মৃত সমাজ এই দুইভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম ভাগে পড়ে তিনটি গোষ্ঠি। সুদূর পশ্চিমের কেল্টিক খৃষ্টান সভ্যতা আয়র্ল্যাণ্ডকে আশ্রয় করে গড়ে উঠছিল, পরে পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় জগতের চাপে তার মৃত্যু ঘটে। তেমনি সুদূর উত্তরে স্কাণ্ডিনেভিয়ার ভাইকিং সভ্যতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার পরমুহূর্তে পাশ্চাত্য জগতের চাপে লোপ পায়। আর সুদূর প্রাচ্যে নেস্টরিয়ান খৃষ্টান সমাজ গড়ে উঠতে উঠতে আরব সাম্রাজ্যের চাপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই তিন সমাজের ভাগ্যে নেমে আসে ব্যর্থতার অন্ধকার।

দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায় যারা জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এর

প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেসীয় সভ্যতা আর মধ্য এশিয়ার যাযাবর সমাজ। এছাড়াও টয়েন্‌বি অন্য উদাহরণ দেখিয়েছেন—তাঁর মতে প্রাচীন স্পার্টার বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থা, মধ্য যুগের ওস্‌মান্‌লি তুর্কদের সংগঠন আর তুষারদেশের এস্‌কিমো গোষ্ঠী এই জীবন্মৃত পর্য্যায়ের অন্যান্য প্রতিভূ।

মৃত সিরিয়াক সভ্যতার 'ফসিল' হিসাবে য়িহুদী ও পার্শী গোষ্ঠি উল্লেখযোগ্য। আর জৈনরা নাকি হিন্দু সমাজের বুকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ভগ্নাংশ।

৫

এক সমাজ অন্য সমাজের সন্তান কথাটার প্রমাণ কি? এখানে হেলেনিক সভ্যতার থেকে পাশ্চাত্য জগতের উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে টয়েন্‌বি একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁকে খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও মানতে হয়েছে যে সর্ব্বত্র তাঁর সূত্র খাটে না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই অসম্পূর্ণতার কারণ আমাদের ঐতিহাসিক মালমশলার অভাব।

সাধারণ সূত্রটি খানিকটা এইরকম। সমাজের জীবনে যখন আত্মবিকাশ থেমে যায় তখন আসে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগ, আমাদের সাহিত্যে যাকে মাৎস্যন্যায় বলা হ'ত আর টয়েন্‌বি যার নাম দিয়েছেন times of trouble. তারপর মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায় সমাজে শান্তিস্থাপনের জন্য গড়ে তোলে একটা সর্ব্বব্যাপী সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য। কিন্তু শাসকগোষ্ঠি শুধু সংখ্যায় নয়, তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয় দমনের শাসনও চালিয়ে। প্রতিবাদে প্রতিরোধ আসতে থাকে দুইদিক থেকে। একদিকে সমাজের সীমান্তস্থিত বর্ব্বরেরা ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে' তোলে। অন্যদিকে অভ্যন্তরস্থিত পদানত নিম্নশ্রেণীরা শাসকদের সংস্কৃতির মোহ কাটিয়ে নূতন কোনও ধর্ম্মের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করে, নূতন এক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের উদয় হয়। তারপর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, একটা অন্তবর্ত্তী অরাজকতার যুগ বা inter-regnum আসে। ক্রমে সেই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আওতায় গড়ে ওঠে নূতন সমাজ, তাকে পুরাতন সভ্যতার সন্তান বলা চলে। বাইরের বর্ব্বরদের টয়েন্‌বি সাধারণ নাম দিয়েছেন external proletariat, ভিতরের বঞ্চিত নিম্ন-শ্রেণীদের আখ্যা হ'ল internal proletariat. এখানে প্রলেটারিয়াটের অর্থ হ'ল যারা পুরাণো সমাজের আওতায় আছে অথচ প্রচলিত সভ্যতাকে যারা নিজস্ব সম্পদ বলে' মনে করে না।

সমস্ত ছবিটি হেলিনিক সমাজের রূপান্তরের থেকে গৃহীত হয়েছে। টয়েন্‌বি একে সাধারণ নিয়মের মর্য্যাদা দিয়ে যেখানেই এক সভ্যতা থেকে অপরের উদয় সন্দেহ করা চলে সেখানেই এর প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে খানিকটা সাদৃশ্যও পাওয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বত্রই চেষ্টা চলেছে সাধারণ-সূত্রের সমর্থক ঘটনা আবিষ্কারের।

মাৎস্যন্যায়ের যুগ হেলেনিক সমাজে পেলপনেসীয় যুদ্ধ থেকে পিউনিক যুদ্ধ পর্য্যন্ত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় তার ব্যাপ্তি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ছোট রাজ্যগুলির সংগ্রামে। সিরিয়াক সমাজে অনুরূপ অবস্থা আকেমেনীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের আগেকার যুগ, সুমেরীয় সভ্যতায় তার সন্ধান পাই সুমের-আক্কাদ সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে, প্রাচীন চীনে তার পরিচয় সিন ও হান সাম্রাজ্য উদয়ের পূর্ব্বাবস্থা। সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে—হেলেনিক সভ্যতায় রোমান সাম্রাজ্য, প্রাচীন ভারতে মৌর্য্য ও (একটা হেলেনিক আঘাতের পর) গুপ্ত রাজত্ব, সিরিয়াক সমাজে আকেমেনীয় সাম্রাজ্য এবং (দীর্ঘস্থায়ী হেলেনিক বাধার পর) আরব খিলাফৎ। ঔত্তিন্টের বাদশ ও অষ্টাদশ রাজবংশ, সুমেরীয় সভ্যতায় সুমের ও আক্কাদ, চীনে সিন ও হান রাজত্বকাল, আমেরিকার ইন্‌কা বা আজটেক সাম্রাজ্য ইত্যাদি একই গোত্রের। সভ্যতা থেকে পরবর্ত্তী সভ্যতার রূপান্তরের হেতু হ'ল সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। তার উদাহরণ হ'ল খৃষ্ট ধর্ম্ম (হেলেনিক থেকে পশ্চিম ইয়োরোপের সমাজ), হিন্দু ধর্ম্ম (প্রাচীন ভারত থেকে পরবর্ত্তী হিন্দু সমাজ), মহাযান বৌদ্ধ মত (প্রাচীন চীন থেকে পরবর্ত্তী সুদূর প্রাচ্য সভ্যতা), ইস্‌লাম (সিরিয়াক থেকে আরবী ও ইরাণী সমাজ) ইত্যাদি। যেখানে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের হেতু অস্পষ্ট, সেখানে দুই সভ্যতার মধ্যে সাময়িক যোগ নিঃসন্দেহ নয় (মিনোয়ান ও হেলেনিক; সুমের ও প্রাচীন ভারত)। আর যেখানে পুরাতন সভ্যতার বনেদী ধর্ম্মই পরবর্ত্তী সভ্যতায় চালু দেখা যায় সেখানে দুই সমাজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহ আসে (সুমেরীয় আর বাবিলনীয়)। নূতন সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম কখনও আসে পুরাতন সমাজের বাইরে থেকে (খৃষ্টধর্ম্ম, মহাযান), আবার কখনও তার উৎপত্তি পুরাতন সমাজের গর্ভে (ইস্‌লাম, হিন্দুধর্ম্ম)।

৬

মানবজাতির জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে অসভ্যতার অন্ধকারে, ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতার উদয়ও ছয় হাজার বৎসরের বেশী আগে নয়। সভ্যতার উদ্ভবের আগেকার অবস্থার মূল প্রকৃতি হ'ল স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী গতানুগতিক ভাব। পক্ষান্তরে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হ'ল গতিশীলতা। স্থিতি ও গতির অর্থে টয়েন্‌বি দুটি চীনে শব্দ ব্যবহার করেছেন—ইন ও ইয়াং। ইন থেকে ইয়াং-এ রূপান্তর সভ্যতার সূত্রপাতের গোড়ার কথা।

সভ্যতার উদয়ের সমস্যা হ'ল এই রূপান্তর ঘটে কেন, বর্ব্বর গতানুগতিকতা ভেঙে পড়ার কারণ কি। টয়েন্‌বি বলেন যে এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ দেওয়া হয় দুইভাবে আর দুই উত্তরই ভুল। কোন কোন মতে যারা সভ্যতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে থাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জাতিগত কোনও বিশেষ গুণ। এর থেকে, উৎপন্ন হয়

আর্যাবর্তের অভিযান অথবা নর্ডিক 'বেদ' মাহাত্ম্যের মতন অন্ধ বিশ্বাস। অন্য মত অনুসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এমন কোনও সুযোগ আসে (নদীকূলের উর্বরতা, আবহাওয়ার অনুকূলতা) যার ফলে সভ্যতাসৃষ্টি সহজ হয়ে পড়ে। টয়েন্‌বির মতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগ কোনটাই আসল কারণ নয়। ইন্দোয়োরোপীয় সভ্যতা টিউটন আর্য নূতন রক্তের ফল নয়, তাদের দান কোনওক্রমেই পুরাতন রোমক প্রভাবের থেকে বেশী ছিল না; প্রাচীন ভারতেও সম্ভবতঃ অনার্যের তুলনায় আর্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহ নয়। ইতিহাসে বিশুদ্ধ 'রক্তের' সন্ধান বৃথা। অন্য দিকে নীল নদ যদি মিশরীয় সভ্যতার মূল কারণ হয় তবে মিসিসিপির কূলে অনুরূপ সভ্যতার দেখা পাওয়া যায় না কেন?

সভ্যতার উৎস টয়েন্‌বি খুঁজেছেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সংঘাতের মধ্যে আর এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা শুধু প্রকৃতি নয়, তার মধ্যে আসে অন্য মানুষ এবং সকল ধরণের সমস্যা। বিভিন্ন লোকসমষ্টির জীবনে বারবার সমস্যার উদয় হয়, আকস্মিক পরীক্ষা সামনে এসে পড়ে। সমস্যার সামনে লোকে কেমন আচরণ করবে সেকথা পরীক্ষার আগে কেউ বলতে পারে না। কখনও কখনও বিপদ সসৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে লোকসমাজ নিজের শক্তির বিকাশ লাভ করে। কখনও বা বিপদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সমস্যার আগমন ও সমাধানের চেষ্টাকে ভাববাদীর ভাষায় টয়েন্‌বি নাম দিয়েছেন challenge and response. এই সমস্যা-সমাধানের দ্বন্দ্ব তাঁর মতে সমস্ত ইতিহাসের মূলছন্দ। সভ্যতার উদ্ভব তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্যয় ও মানুষের শক্তির সদ্ব্যবহারের মিলিত ফল।

আদি সভ্যতার উদয়ের মূলে এই পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় স্বভাবতঃই প্রকৃতির খেলার রূপ নেয়। মিশর বা সুমেরের ক্ষেত্রে বোঝা যায়, আদি বাসভূমির উর্বরতাহ্রাস লোকসমষ্টিকে বিপন্ন করে তোলে, তারা নীলনদ অথবা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের অরণ্য ও অনাবৃষ্টিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টার মধ্যেই সভ্যসমাজের সৃষ্টি করে। পরবর্তী সভ্যতার উদ্ভবের সময় পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, সেখানে মানুষের সৃষ্ট সমস্যারও সম্মুখীন হ'তে হয়। পুরাতন সভ্যতার ইমারৎ ধ্বসে পড়ার ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা। আত্মশক্তিতে সে-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার মানেই নূতন সভ্যতার সৃষ্টি।

পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় নানাবিধ হ'তে বাধ্য। তার রূপ কখনও নূতন জমি দখলের সংগ্রাম কিম্বা অনুদার প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা। কখনও তার রূপ মানুষের বিরুদ্ধে অভিযানে। বাইরে থেকে আকস্মিক আক্রমণের আঘাত আসতে পারে, পাশের লোকের দীর্ঘস্থায়ী চাপও কিছু দুর্লভ নয়। কিম্বা সমাজের অভ্যন্তরে অত্যাচার বা শাস্তিবিধানের চাপও আত্মশক্তি বিকাশের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এরপর অবশ্য বলা চলে না যে সমস্যা যতই তীব্র হবে, শক্তির বিকাশও তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। এর মধ্যে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই, ঘটনার আগে ভবিষ্যদ্বাণীও অচল। মোটের উপর টয়েন্‌বির বিশ্বাস এই যে কিছুদূর পর্য্যন্ত বিপর্য্যয়ের ফলে সমস্যা-সমাধানের শক্তি জোগায়। কিন্তু বিপদ এমন প্রচণ্ড রূপ নিতে পারে যে তা' কাটিয়ে ওঠা চলে না। ব্যর্থ সভ্যতার ব্যর্থতার কারণ এইখানে। আবার সমাজের সৃজনীশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেলে, জীবনে স্থবিরতা এলে স্বভাবতঃই সমাধানের ক্ষমতার অভাব হয়।

৭

জন্মের পর বিকাশ বা বৃদ্ধি। সভ্যসমাজের বিকাশের লক্ষণ হ'ল এক সমস্যা সমাধানের পর অন্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি। এই ক্রমান্বয় সার্থকতা জীবনের পরিচয়। সভ্যতার প্রগতির মাপ রাজ্যজয়ের মধ্যে নয়, আর্থিক উন্নতিও তার আসল পরিচয় হ'তে পারে না। টয়েন্‌বির মতে প্রগতির লক্ষণ হ'ল বাস্তবিক জগতের বাধা অতিক্রম করে ক্রমশই ভাবজগতের সমস্যা উত্তীর্ণ হবার শক্তি অর্জ্জন। যতদিন পর্য্যন্ত সভ্যসমাজ এই দিকে অগ্রসর হয় ততদিন তার জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সকল সভ্যতার ইতিহাসে (পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে টয়েন্‌বি এখনও মন স্থির করতে পারেন নি) কিছুদিন পরই আত্মবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, বৃদ্ধির শেষ এসেছে। তখন দেখা যায় বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতা। টয়েন্‌বি এর নাম দিয়েছেন breakdown; এখানে কথাটার অর্থ সভ্যতার পতন নয়, তার আত্ম-বিকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়া মাত্র। তাই breakdown-এর পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সে-সমাজ বেঁচে থাকার মধ্যে নাকি অসঙ্গতি নেই। হেলেনিক সমাজে breakdown আসে পেলপনেসীয় যুদ্ধের যুগে, হেলেনিক সমাজ শেষ হয়ে যাবার আটশত বৎসর আগে।

বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতার কারণ কি? কোন সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী বা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল একথা টয়েন্‌বি মানতে পারেন না কারণ challenge and-response সূত্রের মূলই হ'ল অনির্দ্দিষ্টতা, কোন্ অবস্থায় মানুষ কি করতে পারে এই মতে তার নিশ্চয়তা নেই। মেসপটেমিয়ার জলসেচনের বিপর্য্যয় সেখানকার সভ্যতার বার্দ্ধক্যের কারণ নয়, তাকে স্থবিরতার অনিষ্টময় ফল বলাই উচিত। রোমের পতন হেলেনিক সমাজের অচল অবস্থার কারণ নয়,—হেলেনিক বিকাশ রোমের সাম্রাজ্যস্থাপনের আগেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

টয়েন্‌বির মতে সভ্যতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় যখন আত্মবিকাশের শক্তি তার ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। তিনি বলেন যে অগ্রগতি সকল সময়েই

মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘুর কাজ, সৃজনীশক্তি তাদেরই আয়ত্তে থাকে। অনির্দিষ্ট কিছুকাল পর্য্যন্ত সমাজের সাধারণ লোক সৃষ্টিকর্ত্তা সংখ্যালঘুর অনুসরণ করে, কিন্তু সাধারণতঃ অনুসরণের মূলে থাকে অনুকরণ প্রবৃত্তি। কিছুদিন পর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নেতারা অনুচরদের যান্ত্রিকতায় নিজেরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সৃষ্টির কাজে ভাটা আসে। কিম্বা সংখ্যাধিক অনুচরদের উপর নেমে আসে জোর ক'রে মানিয়ে নেবার জুলুম। তার ফলে সৃষ্টিকারী সংখ্যালঘু লোক পরিণত হয় অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ে। আর সংখ্যাধিক অনুচরেরা প্রলেটেরিয়াটে পরিণত হয়, সমাজের সভ্যতা আর তাদের নিজস্ব সম্পদ মনে হয় না, তারা তখন প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখে, নূতন বিদ্রোহী নেতার সন্ধান করে। মোট কথা দাঁড়ায় যে সমাজ আত্মবিকাশের শক্তি হারিয়ে ফেলে, অবাঞ্ছিত অবস্থা এসে পড়তে থাকে, নূতন নূতন পরীক্ষা আর সগৌরবে পার হওয়া চলে না। এই পরিণতির নানাবিধ রূপ আছে। সৃষ্টিকার্য্য কখনও ব্যাহত হয় পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নূতন কাজ চালানোর অসঙ্গতির ফলে। কখনও বা নেতৃস্থানীয়রা সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে গতানুগতিকতাকে আঁকড়ে থাকার জন্য।

সভ্যতার ইতিহাসে জন্ম, বিকাশ, বার্দ্ধক্যের পরে আসে শেষ পর্ব্ব—পতন, অবসান, ধ্বংস বা মৃত্যুর যুগ। এর প্রধান লক্ষণ হ'ল—সমাজের মধ্যে বিরোধী তত্ত্বের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল ঐক্যের বিনাশ। একদিকে সৃজনশীল সংখ্যালঘু তখন পরিপূর্ণভাবে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে, তাদের আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান হ'ল সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য। অন্যদিকে দুই ধরণের প্রতিরোধ। সমাজের ভিতর নিম্নস্তরের অধিকাংশ আর প্রচলিত সমাজের সভ্যতাকে নিজস্ব মনে করতে পারে না; তারা নূতন জীবনের স্বাদ খোঁজে। আবার বাহির সীমান্তের বর্ব্বরেরা আঘাত হানতে থাকে, প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের আর মোহমুগ্ধ করে' রাখতে পারে না। দুইদিকের চাপে ও শাসকদের দুর্ব্বলতার ফলে শেষ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের মৃত্যু হয় আর পরবর্ত্তী অরাজকতার মধ্যে থাকে নূতন সমাজ গঠনের সম্ভাবনা। সমাজের ঐক্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখে সমাজ-মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন পথের সন্ধান, বিচিত্র ধরণের ব্যর্থতা। অবশ্য পতনের পর্ব্বটাও ঠিক সরল রেখায় অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে সমাজ যেন খানিকটা অবসন্ন হয়ে পড়ে, আবার তার শক্তি ফিরিয়ে আসে।

৮

টয়েন্‌বির মতামতের সমালোচনা এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, কিন্তু উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও পাঠকের মনে নানা ধরণের আপত্তি জেগে উঠবে। বস্তুতঃ টয়েন্‌বির লেখার প্রধান সার্থকতা এই যে পাঠকের মন এতে সজাগ হয়ে ওঠে,

ইতিহাসের ব্যাপক রূপ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা একে কেন্দ্র করে' প্রবাহিত হ'তে পারে। উপসংহারে মাত্র দু'একটি প্রশ্নের উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

ইতিহাস সম্বন্ধে টয়েন্‌বির ব্যাখ্যা কি অবথা ধর্মভাবাপন্ন নয়? তাঁর ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে খানিকটা অভিভূত করে' ফেলেছে। নূতন সমাজগঠনে পূর্বতন সমাজের শেষ দশায় সার্বভৌম ধর্মের কথা শুধু বলছি না। এটা উল্লেখযোগ্য যে টয়েন্‌বি একদিকে গ্রীস থেকে আজ পর্যন্ত ইয়োরোপকে এক সমাজ মনে করেন না; আবার অন্যদিকে ইয়োরোপীয় ফিউডাল মধ্যযুগ ও ধনতান্ত্রিক আধুনিক কাল তাঁর কাছে একই সভ্যতার অন্তর্গত। ইয়োরোপের ইতিহাসে প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও আধুনিক—প্রচলিত এই তিন বিভাগকে অস্বীকার করে' হেলেনিক ও পরবর্তী ইয়োরোপের তফাতের উপর জোর দেওয়ার মধ্যে কি এই কথাই স্পষ্ট হয় না যে এখানে মোটামুটি অখৃষ্টান ও খৃষ্টান ভেদরেখাটাই বড় কথা? অথচ হেলেনিক সংস্কৃতি কি বর্তমান ইয়োরোপের কাছে মধ্যযুগের সংস্কৃতির তুলনায় এত বেশী বিজাতীয় বস্তু?

সন্দেহ দৃঢ় হয় যখন দেখি যে শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার বেলা নয়, প্রায় প্রতিটি সভ্যতার আলাদা সত্তা নির্দ্ধারিত হয়েছে 'সংস্কৃতি'র ছাপ দিয়ে, আর সংস্কৃতি এখানে ধর্মেরই নামান্তর। আড়াই হাজার বৎসর ধরে সিরিয়াক সভ্যতা একই সত্তা বহন করে এনে ইস্‌লামের পূর্বপ্রসারের পর অন্য সমাজে পরিণত হ'ল। হিন্দু সমাজের আওতায় মধ্যেও নাকি জৈন কিম্বা হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ববর্তী সভ্যতার ফসিলের অনুরূপ। প্রাচীন সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রাধান্য অস্বীকার করছি না, কিন্তু এক মাত্র ধর্মকেই সংস্কৃতির মাপকাঠি মনে করতে কিধা আসে বই কি। মিনোয়ান সমাজে উৎপন্ন কোনও ধর্মে গ্রীকদের মতি ছিল না বলে' টয়েন্‌বি এই দুই সমাজের মধ্যে যোগসূত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন; সুমেরীয় ও বাবিলনীয় সমাজের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য স্পষ্ট না থাকাতে তিনি বলেছেন যে হয়ত এরা স্বতন্ত্র সমাজ নয়।

টয়েন্‌বি পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশের পথে বাধা এসেছে কিনা বুঝতে পারেন নি, তার কারণ সে-সমাজের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক শক্তি নয়, কারণ বোধ হয় এই যে সে-সমাজ খৃষ্টান সভ্যতার আধার। ইয়োরোপ আজ নূতন সভ্যতার দ্বারদেশে এসেছে বলে' অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু টয়েন্‌বি তা' মানতে পারেন না কারণ নূতন সার্বভৌম ধর্মের চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সাম্যবাদকে আজকের প্রলেটারিয়াটের নূতন ধর্ম বলতে পর্যন্ত তাঁর বাধে, কারণ তিনি বাস্তবিকই ধার্মিক লোক, ধর্ম-হীনতাকে তিনি পরিহাস ছলেও ধর্ম আখ্যা দিতে পারেন না। এমন কি টয়েন্‌বির প্রলেটারিয়াট পর্যন্ত ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে। পশ্চিম জগতের প্রলেটারিয়াট প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধিজীবিদের কথা আলোচনা করেছেন, মজুর শ্রেণীর কথা এড়িয়ে গেছেন।

৯

টয়েন্‌বি ঐতিহাসিক ভাববাদের নূতন পুরোহিত এ কথা বলাও নিশ্চয় অন্যায় নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন একথা বলছি না, পুরোণো ভাববাদের কাঠামোকেও তিনি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু নূতন পোষাকের মধ্যেও কি পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাচ্ছে না? আমার বিশ্বাস যে টয়েন্‌বি নিজেও স্বীকার করবেন যে বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য, ভাববাদই তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস।

সভ্যতা সৃষ্টি করছে মুষ্টিমেয় সংখ্যায় লোক, জনসমাজ তাদের অনুকরণ করে অনুসরণে প্রবৃত্ত। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোকের ধ্যানধারণা সংকল্পের উৎস কোথায়? বিশেষ মত বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে কেনই বা উদিত হয়, যুগধর্মই বা কি ভাবে গড়ে' ওঠে? সেকালের ভাববাদীরা ঈশ্বরের নির্দেশ দেখতে পেতেন, আজকের ভাববাদী ব্যক্তিত্বের কথা তুলেই থাকাস। সৃষ্টিকর্তা নেতাদের তাই ফুঁইফোড়ের অবস্থা, জনসাধারণের কাছ থেকে তারা কি পায় সে-কথাটা উহ্য থেকেই যায়।

তারপর কালের চক্রে সৃজনশীল সংখ্যায় পরিণতি পায় অত্যাচারী সংখ্যায়ে, সমাজদেহে চিড় খায়, আর অমনি প্রগতির চাকা হয় বন্ধ। কিন্তু এই ছবির মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় যে সৃজনশীল যুগে কি সংখ্যায়ের অত্যাচার থাকে না, তখনকার সামাজিক ঐক্য কি নিখুঁত? ইতিহাস বরং এই সাক্ষ্য দেয় যে সমাজের জীবনের প্রত্যেক যুগেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে এসেছে—সভ্যতার জন্ম বা বৃদ্ধির সময় অত্যাচার ও প্রতিরোধের কোনই অভাব নেই।

অনেক সভ্যতার তথাকথিত স্বর্ণযুগেও সঙ্ঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়, যদিও পতনোন্মুখ অবস্থায় নিশ্চয়ই সঙ্ঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বকে দেবপর্যায়ের লক্ষণ মনে করে' টয়েন্‌বি একথাই বলতে চেয়েছেন যে সভ্যতার উত্থান ও পতনের যুগের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবধান আছে, নেতাদের একজাতীয় নৈতিক পতনই ধ্বংসের কারণ। পশ্চিমী সভ্যতার বেলা তিনি স্পষ্টই উত্থানের পথ খুঁজেছেন ধর্ম ও নীতির শক্তির মধ্যে। সমাজের ওঠাপড়ার মধ্যে আর্থিক কারণ কিছু থাকতে পারে কিনা তার সন্ধান পর্যন্ত তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি। ভাববাদী প্রস্তাবের স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

১০

সমালোচকের চোখে টয়েন্‌বির ধর্ম ও দর্শনই একমাত্র দুর্বলতা নয়। Analogy অথবা সাদৃশ্যের সন্ধান মাঝে মাঝে কষ্টকল্পনার আভাস তাঁর লেখার মধ্যে এনে ফেলেছে।

হেলেনিক সমাজ থেকে পশ্চিমী সমাজের বিবর্তন তাঁর চোখে যে রূপ নিয়েছে তার থেকে সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠা খানিকটা জোর করেই করতে হয়েছে। প্রথমতঃ

এই রূপান্তরের ছবি নিখুঁত নয়। টয়েন্‌বি এখন বর্ব্বর জাতিগুলির অবদান নিতান্তই তুচ্ছ করে' দেখছেন, রোমান জগতের দাসত্বপ্রথার অবসান-ও তাঁর কাছে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নয়, আসল কথাটাই হ'ল নূতন ধর্ম্মের স্পন্দন। সেই নূতন ধর্ম্মকে আশ্রয় করে'ও অবশ্য রোম সাম্রাজ্য টিঁকতে পারে নি।

যাহোক এই খানিক-বিকৃত ছকটাও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু টয়েন্‌বি এর মায়া কাটাতে পারলেন না—তাই সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান চলেছে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য, সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম আর বর্ব্বর অভিধানের। ফলে অন্য দিকে নানা ঘটনা অবহেলিত হয়েছে, না হয়ে উপায় ছিল না।

ছকে ফেলতে গিয়ে অনেক সময় বিপদ গুরুতর হয়েছে। সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের আগে times of trouble আর সেখান থেকেই breakdown আরম্ভ করতে হবে। অতএব হেলেনিক সমাজের শেষ আট শতাব্দী, সিরিয়াক সভ্যতার প্রায় সবটাই হ'ল বার্দ্ধক্যের যুগ। Challenge-and response-এর মূল অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে ইতিহাসে কোন ব্যাখ্যাই চলে না? কোনও কাজ ব্যর্থ হয় আর অন্য চেষ্টা হয় সফল, কিন্তু কেন তা কে জানে! তথাকথিত সাধারণ বুদ্ধিকে এমন গভীরভাবে বলবার সার্থকতা কি? সমস্যা আসছে, আর তার সমাধান হচ্ছে অথবা হচ্ছে না, তার কারণ আবার ব্যক্তি বিশেষ কিভাবে সাড়া দেয় এটুকু মাত্র—ইতিহাসের এ-ব্যাখ্যা কি কখনও তৃপ্তি দিতে পারে? সমস্যা আর সমাধানের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা, স্থিতি অথবা গতি, ইন ও ইয়াং-এর স্পন্দন, ইতিহাসকে এভাবে চিত্রিত করলে তার সার্থকতা কতখানি?

টয়েন্‌বির সার্থকতা তাই তাঁর বিশিষ্ট মতবাদে নয়, পাঠককে ইতিহাসের বিচিত্র রাজ্যে কৌতূহলী করে তোলাই তাঁর আসল সফলতা, বিশেষজ্ঞের নির্জ্জীবতার ক্ষেত্রে ব্যাপক দৃষ্টির সরস আবাহন তাঁর কৃতিত্ব, দুঃসাহসিক ব্যাখ্যায় tour de force তাঁর কীর্ত্তি।

ভারতের ঐক্য

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় মহাজাতির মানস ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমিকে এক রাজচক্রবর্তীর শাসনাধীন মহারাষ্ট্রে পরিণত করিবার কল্পনা সুদূর বৈদিক যুগেই ভারতীয় ঋষিগণের মন আলোড়িত এবং উদ্দীপিত করিয়াছিল। সেই কল্পনা কার্যে পরিণত হইয়াছিল নন্দবংশের রাজত্বকালে। অতঃপর মৌর্য এবং গুপ্তবংশীয় পরাক্রান্ত সম্রাট্‌গণ দিগ্বিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন অংশের ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত করেন। গুর্জর-প্রতিহার বংশের পতনকালে এই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী রাজত্বকালে ভারতের ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দু যুগের কোন রাজবংশ দীর্ঘকাল ভারতের ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সাধারণভাবে বলা যায়—পরাক্রান্ত সম্রাট্‌গণের দুর্বল বংশধরগণ সাম্রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ ছিলেন, সাম্রাজ্যের আয়তন অত্যধিক বিস্তৃত হওয়ার ফলে উহার বিভিন্ন অংশের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হইত, ইত্যাদি। কিন্তু সেকালে সাম্রাজ্যের গঠন যে স্থায়িত্বের পরিপন্থী ছিল তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যে অর্দ্ধস্বাধীন সঙ্ঘ ও নগর ছিল। এই সকল সঙ্ঘ-রাজ্য এবং নগরের সহিত সাম্রাজ্যের বন্ধন কতখানি দৃঢ় ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির কি সম্বন্ধ ছিল তাহা এলাহাবাদ শিলালিপি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব সীমান্তবর্তী সমতট প্রভৃতি রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত যৌধেয় প্রভৃতি জাতির গণরাষ্ট্র গুপ্ত সম্রাটের মর্য্যাদা এবং আধিপত্য স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে দিগ্বিজয় এবং শাসনতান্ত্রিক দৃঢ়ীকরণ এক কথা নহে। সেকালের সম্রাট্‌গণের মর্য্যাদাবোধ দিগ্বিজয় দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইত, বিজিত রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীভূত শাসন দ্বারা সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়োজন তাঁহারা তেমনভাবে উপলব্ধি করেন নাই। ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে দুর্বলতার চিহ্ন প্রকাশিত হইলেই চতুর্দিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, শাসনতান্ত্রিক বন্ধন দৃঢ়ীভূত না হওয়ায় ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য সহজেই খসিয়া পড়িত। বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা পৃথক ছিল, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মূলগত ঐক্য আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের মানচিত্রের খানিকটা মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যরূপে চিত্রিত করিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তাহা অনেকাংশে অবাস্তব।

তুর্কী আমলে প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতি নানাকারণে দুর্বল ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ কেন্দ্রের নির্দেশ পালনে উৎসাহী ছিলেন না, নিজ নিজ শাসনাধীন প্রদেশগুলিকে স্বাধীন রাজ্য পরিণত করিবার সুযোগ অন্বেষণেই তাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্যগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া করদ রাজ্যরূপে রাখিবার নীতি সফল হয় নাই। যে সুশৃঙ্খল শাসনপদ্ধতি সুগঠিত সাম্রাজ্যের অপরিহার্য্য ভিত্তি তাহা তুর্কী আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। মুঘল সম্রাট্‌গণের এদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। মুঘল আমলের শাসন-পদ্ধতি নানাবিধ দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাট্‌গণও অর্দ্ধস্বাধীন করদ রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। রাজপুত রাজগণ যতখানি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতেন ততখানি সাম্রাজ্যের ঐক্যের অনুকূল ছিল না। ঔরংজীব মারোয়ার রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যবিনাশে উদ্যত হইয়া ত্রিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

ইংরেজ আমলে করদ রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের শক্তিস্তম্ভে পরিণত হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী নানা কারণে করদ রাজ্যগুলির ধ্বংসসাধনে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ নীতি অনুসারে অন্যান্য গভর্ণর-জেনারেলগণ প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর শাসন প্রসারিত না করিয়া করদ রাজ্যগুলির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ দৃঢ়মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "সিপাহী বিদ্রোহ" এই নীতির সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডরাজের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর করদ রাজগণ কাযমনোবাক্যে ইংরেজের দাসত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে ভারত-বাসীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ দমন করা ব্রিটিশ নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সুতরাং ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয় জীবন শক্তিশালী না করিয়া বরঞ্চ উহাকে দুর্বল করিয়াছিল। যে রাজনৈতিক ঐক্য বিদেশী শাসকের হস্তে কঠোর নিপীড়নের যন্ত্ররূপে পরিণত হয় তাহা ক্রমশঃ জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে, কারণ নিপীড়িত জাতির অন্তর হইতে উদ্ভূত শক্তি উহাকে সর্ব্বদা প্রবলভাবে আঘাত করিতে থাকে। আবার বিদেশী শাসক নিজের প্রয়োজনে ঐ ঐক্যবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, শাসিত জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া আপন শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসকগণ ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবোধে শঙ্কিত হইয়া করদ রাজগণকে এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজের কূটনীতি আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছে—মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি অনুসারে ভারতের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া পাকিস্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু করদ রাজগণের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ জয়ী হইয়াছে—ইংরেজের কূটনীতি তাঁহাদিগকে স্বাধীন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে নাই।

বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐতিহাসিকের মনে বেদনাবোধ স্বাভাবিক। আর্যজাতির আদি বাসভূমি পঞ্চনদ আজ বিখণ্ডিত; পাণিনি ও কৌটিল্যের জন্মভূমি আজ ভারতের সীমার বাহিরে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালিপিতে প্রখ্যাত সমতট প্রভৃতি জনপদ এবং লৌহিত্য প্রভৃতি নদী আজ সমগ্র বা আংশিকভাবে ভারতের সীমার বহির্ভূত। বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতীয় মহাজাতি ঐক্যের যে স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইতিহাসের স্রোত দীর্ঘকাল একই খাতে প্রবাহিত হইতে হইতে অকস্মাৎ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অস্বীকার না করিয়াও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ আজ যে ঐক্য লাভ করিয়াছে তাহা আমাদের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। আজ সমগ্র ভারতবর্ষে কোন অর্দ্ধস্বাধীন করদ রাজ্য নাই, স্বাতন্ত্র্যভোগী সঙ্ঘরাজ্য বা নগর নাই, রাজবংশস্থাপনলোলুপ প্রাদেশিক শাসক নাই। আজ একই শাসনতন্ত্র সমগ্র দেশে সমভাবে প্রযোজ্য, একই শাসক-গোষ্ঠী সমগ্র দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী, একই মহাধর্ম্মাধিকরণ সমগ্র দেশের বিচার-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে আসীন। বিগত কোন যুগে কোন রাজবংশের আমলে এই সুবৃহৎ উপ-মহাদেশের শাসন-ব্যবস্থা এমন ভাবে কেন্দ্রীভূত হয় নাই, ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য আর কখনও শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে এত সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় নাই।

যে শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইতেছে তাহা কোন বৈরাচারী দেশীয় বা বৈদেশিক শাসক কর্ত্তৃক অনিচ্ছুক জাতির উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই; উহা জাতির প্রতিনিধিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, বাহিরের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকিয়া, জাতির মঙ্গলার্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই স্বপ্রণীত শাসনতন্ত্র ("We, the people of India,·····do Hereby Adopt, Enact and give to Ourselves this Constitution"—Preamble) জাতির বিভিন্ন অংশকে সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতেছে। ইহা সমগ্র জাতির গৌরবের বস্তু, সমগ্র জাতির জীবনাদর্শ ইহাতে প্রতিফলিত হইতেছে। ভবিষ্যতে জাতির ইচ্ছা বা আদর্শের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে (৩৬৮ ধারা), কিন্তু যে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ইহার ভিত্তি তাহার প্রতি আনুগত্য অপরিবর্ত্তনীয় রূপে গণ্য করিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে যে মহাজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য তাহার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। যুক্ত-রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, ভারতের নাগরিকগণকেও ভারতের শাসনতন্ত্রকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্র সমগ্র ভারতের জন্য একই নাগরিকত্ব স্বীকার করিয়াছে—অর্থাৎ যে কোন ভারতবাসী ভারতের যে কোন অংশে জন্মগ্রহণ বা বসবাস করুক না

কেন, সে সমগ্র ভারতের নাগরিক (৫—১১ ধারা)। শাসনতন্ত্রে যদি প্রাদেশিক নাগরিকত্ব স্বীকৃত হইত (অর্থাৎ যে যে প্রদেশের লোক সে কেবলমাত্র সেই প্রদেশে নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে, এই ব্যবস্থা থাকিত) তবে আমাদের একজাতীয়তা বোধ ক্ষুণ্ণ হইত, ভারতের ঐক্য অসম্পূর্ণ থাকিত। শাসনতন্ত্রের ১৯ ধারা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার এবং ভারতবর্ষের যে কোন অংশে বসবাস করিবার অধিকার আছে। নাগরিকের অধিকারের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমগ্র ভারত এক এবং অবিভাজ্য।

ভারতবর্ষ কার্যতঃ রাজ্যসঙ্ঘ (Federation) হইলেও শাসনতন্ত্রে ইহাকে "Union" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। Federation শব্দের পরিবর্তে Union শব্দের প্রয়োগ মোটেই লক্ষ্যহীন নহে। Federation-এ সাধারণতঃ প্রাদেশিক সরকারের উপর জোর দেওয়া হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাদেশিক অধিকারের উপর জোর দেওয়ার ফলে জাতির ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়, দেশের বিভিন্ন অংশে স্বাতন্ত্র্যবোধ সদাজাগ্রত থাকে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক অধিকার খানিকটা স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাদেশিক স্বার্থবোধ যাহাতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শাসনতন্ত্রের ২৪৫—২৬৩ ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাসনকার্য এবং আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা এই সকল ধারায় পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ৩৫২—৩৬০ ধারায় রাষ্ট্রপতিকে আপৎকালে (emergency) ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর বলা যায়, শাসনকার্য সংক্রান্ত দৈনন্দিন সাধারণ বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রদেশগুলি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। এতখানি কেন্দ্রীকরণ ভারতের ন্যায় সুবৃহৎ দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের ঐক্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে শাসনতন্ত্রের প্রণেতৃগণ মোটেই কার্পণ্য করেন নাই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতের প্রদেশ বা রাজ্যগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে (First Schedule)। ইহার মধ্যে দুইটি শ্রেণী (চীফ কমিশনার-শাসিত রাজ্যসমূহ) সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন। বাকী দুইটি শ্রেণী (গভর্ণর এবং রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্যসমূহ) খানিকটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির সমপর্যায়ে আনা হইয়াছে (২৩৮ ধারা)। মন্ত্রী মিশনের (Cabinet Mission) ব্যবস্থা অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে ভারতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল না; যে সকল রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতে যোগদান করিত তাহাদের পক্ষে মাত্র তিনটি বিষয়ে—বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, যোগাযোগ রক্ষা—কেন্দ্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করার

ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্য ভারতে যোগদান করিয়াছে, এবং প্রত্যেকটি রাজ্যই মন্ত্রী মিশনের ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্য রাখী না করিয়া সর্ববিষয়ে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির ন্যায় কেন্দ্রের কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। সুতরাং করদ রাজ্যের সহিত কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যের চিরাগত পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট সমুদয় হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে পারিবে (১৩২ ধারা)। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইন ভারতের সমুদয় আদালত মানিতে বাধ্য থাকিবে (১৪১ ধারা)। ভারতের সর্বত্র সুপ্রীম কোর্টের আদেশ প্রতিপালিত হইবে (১৪২ ধারা)। ভারতের ঐক্য রক্ষায় সুপ্রীম কোর্টের অধিকার ও মর্যাদা যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জনসাধারণের মানসিক গতির উপর। হৃদয়ের বন্ধন না থাকিলে আইনের বন্ধন অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে সাম্প্রদায়িকতার ফলে পাকিস্থানের উদ্ভব তাহা এখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় নাই। প্রাদেশিকতা বোধ নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য নূতন সংগ্রামের প্রস্তুতি চলিতেছে। আঞ্চলিক ভাষা রক্ষার অজুহাতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহুধাবিভক্ত করিবার আয়োজন হইতেছে। চতুর্দিকেই বিপদের ইঙ্গিত, সুতরাং সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন। আজ এই পরম সঙ্কটকালে আমরা যদি ইতিহাসের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য জাতীয় ঐক্য বলি দিতে প্রস্তুত হই তবে শাসনতন্ত্রের প্রাণহীন শঙ্খমালা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যে উদার দৃষ্টি সেই শঙ্খমালায় প্রাণসঞ্চার করিতে পারে তাহা সমাজের সর্ব স্তরে প্রসারিত করিবার কঠিন দায়িত্ব শিক্ষিত সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও নিকটপ্রাচ্য

শ্রীখগেশচন্দ্র বসু

[*Revue Anthropologique, 1937*; *Georges Poisson*'র ফরাসী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।]

মানবসভ্যতার অরুণাভাসের সর্ব্বপ্রথম সূত্র কোথায়, আর কেমন করেই বা তা ক্রমোজ্জ্বল হয়ে উঠে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে,—এ প্রশ্নের জবাব এখনও অস্পষ্টতার সীমারেখা অতিক্রম করে নি। প্রাচীন প্রস্তরযুগের শেষে মানুষ সভ্যতার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। নব্য প্রস্তরযুগেই প্রথম লক্ষ্য করা যায় যে কোন কোন মানবগোষ্ঠি সুসংবদ্ধ রূপ নিয়ে উন্নততর অস্তিত্ববিকাশের উপযোগী উপাদানের অধিকারী হচ্ছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমাগ্রগতির অন্যতম অপরিহার্য্য পাথেয় ধাতুর ব্যবহার। বর্ত্তমানে সাধারণমত স্বীকার করে যে ধাতুর ব্যবহার বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হয়েছে নব্যপ্রস্তরযুগে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে নিকটপ্রাচ্য,—বিশেষ করে মিশর এবং মেসোপটেমিয়াকে, চিহ্নিত করা হয় মানুষের সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্ররূপে। এদের মধ্যে আবার কে বেশী প্রাচীন তা নিয়ে মতভেদ আছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে দুই জায়গার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের আদানপ্রদান থাকলেও উভয়েই সমসাময়িক এবং তাদের স্ব স্ব স্বাধীন সত্তা ছিল। স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে বহিরাগত প্রভাবের মিলনে মিশরীয় সভ্যতা জন্মলাভ করেছে বলে হয়ত ধরা যেতে পারে, কিন্তু মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতার প্রাচীনতম স্তরেই অগ্রগতির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা সম্পূর্ণভাবে সেখানেই গড়ে উঠেছিল বলে মেনে নেওয়া চলে না। মানুষের সৃষ্টি আর কোন সভ্যতাকেন্দ্রের প্রবাহ এসে ক্রমে এখানে মিশেছিল তার সন্ধান করবার চেষ্টা হয়েছে ককেশাস্ আর আলতাই পর্ব্বতমালার দুর্গমপ্রদেশে ও তুর্কীস্থানের দূরতর প্রান্তরে,—কিন্তু সে অন্বেষণের নিশ্চিত উত্তর এখনও মেলে নি।

আধুনিককালে কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সেই অন্বেষণের ধারাকে ভারতবর্ষের দিকে টেনে এনেছে। ভারত সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত প্রকাশের সময় এখনও আসে নি। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে ভারতের দান সম্বন্ধে বহু প্রকল্পিত আলোচনা করা হয়েছে বটে কিন্তু এদেশীয় সভ্যতার প্রাচীনতার দাবী এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চয়তিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। উপরন্তু আমরা স্বীকার করি যে দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের প্রারম্ভে যখন আর্য্যেরা এদেশে আসেন তখন তাঁদের চোখে পড়েছিল আদিম, অর্দ্ধসভ্য মানুষের দল। ঋক্‌বেদ বর্ণিত সেই "দাস" বা "দস্যু"দের অবস্থা সভ্যতার প্রগতির দিক থেকে মোটেই উৎসাহজনক নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে সিন্ধু উপত্যকায়,—বিশেষতঃ মহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায়, যে বিরাট সভ্যতার ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাওয়া

গেছে তাকে অনায়াসে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অবশ্য দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। সুপ্রাচীন সভ্যতার তৃতীয় কেন্দ্ররূপে, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার পাশাপাশি তাই সিন্ধু উপত্যকার নাম করা যায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে তিনটি স্থানই প্রায় একই অক্ষাংশে তিনটি বিভিন্ন নদীস্রোতকে অবলম্বন করে ও প্রায় সমপর্যায়ী পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে গড়ে উঠেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই প্রাচীন উৎপত্তিস্থানগুলির পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে জানতে হলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ ছিল তা বিচার করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে ভারতীয় জগতের পরিচয়, প্রত্নতত্ত্ব, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কিম্বদন্তী—প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব :—সিন্ধুউপত্যকায় খননের ফলে যে সমস্ত বহু রকমের জিনিষপত্র পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বোধ হয় হাতী, গণ্ডার, বাঘ, কুমীর, হরিণ প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদাই করা চারকোণা সীলমোহরগুলি। এদের ওপরে লেখা লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি বটে, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার সংস্পর্শের প্রমাণ হিসাবে সীলমোহরগুলি বিশেষ মূল্যবান। মেসোপটেমিয়ার মোহর সাধারণতঃ বৃত্তাকার হলেও সেখানে সিন্ধুউপত্যকার মতন কিছু কিছু চার কোণা ধরণেরও পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে কতকগুলিকে বিশেষভাবে ভারতীয় বলে নির্দ্দেশ করা চলে। অপরদিকে, কেবলমাত্র মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত বৃত্তাকার ধরণের মোহরের উদ্দেশ সিন্ধু-উপত্যকায়ও মিলেছে ;—যেমন মিশরীয় বৃত্তাকার সীলমোহর আনাটোলিয়া, ক্রীট ও থেসালীতে পাওয়া গেছে। চক্রবিশিষ্ট যানবাহনের প্রচলন হিক্সস আমলের মিশরে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ক্রীট ও সিন্ধুসভ্যতায় তাদের ব্যবহার বিভিন্ন সভ্যতাকেন্দ্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের আর একটি দৃষ্টান্ত। মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণ পদ্ধতিতে, ধাতুর ব্যবহারকৌশলে এবং বয়ননিল্প ইত্যাদিতে আলোচ্য স্থানগুলির ঐক্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এককথায় বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্য্যন্ত এক .সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে যার কারণ হয়ত ঔপনিবেশিক বিস্তার বা বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও জাতিগত ঐক্য।

নৃতত্ত্ব :—ভারতবর্ষ থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকা বরাবর আটলান্টিক পর্য্যন্ত অঞ্চলে, এবং অপরদিকে ওশেনিয়া অবধি যে সমস্ত মানুষের দল বাস করত, নৃতত্ত্ববিদেরা তাদের Great Race বলে এক বিরাট গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই Brown Race বা বাদামীবর্ণের জাতি একদিকে কৃষ্ণকায়দের (Black Race) থেকে আলাদা এবং অপরদিকে য়ুরোপীয় (Europoid Race) গোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উত্তরের শ্বেতকায় এবং দক্ষিণের কৃষ্ণকায়দের মাঝে পড়ে

এরা দু'দিক থেকেই সংক্রামিত হয়, ফলে উত্তরাংশে প্রায়-শ্বেতকায় শ্রেণী, যেমন ইরানীয়, সেমেটিক, ভূমধ্যসাগরীয় ইত্যাদি এবং দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রো জাতীয় ইথিওপীয় ও দ্রাবিড় শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে। ডাঃ হিডেট এবং হাডনের মতে এই বাদামী জাতি ভারত থেকে—বিশেষ করে হিমালয়ের দক্ষিণে শিবালিক পর্বতমালার কেন্দ্র হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে মহেন্-জো-দড়োয় প্রাপ্ত নরকঙ্কালের তিনটি শ্রেণীবিভেদ আছে—

Australoid শ্রেণী, যা থেকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন আদিম অধিবাসীরা এসেছে।

Brown Race এর সমগোত্রীয় Euro-African শ্রেণী।

বিদেশী সংমিশ্রণে সৃষ্ট Brachycephalic, Alpine বা Armenoid শ্রেণী।

মেসোপটেমিয়া ও মিশরেও এই তিন শ্রেণীর অস্তিত্ব ভাল ভাবেই দেখা যায়। খোদাই করা স্তম্ভ ও ফলকে উৎকীর্ণলিপিও অতি প্রাচীনকাল থেকে উপরোক্ত সাদৃশ্য সমর্থন করে আসছে। নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তিনটি সুপ্রাচীন সভ্যতার সাদৃশ্য এবং সমসাময়িকতায় একটা বিশেষ অঙ্গ গড়ে উঠেছে এই Brown Race দিয়ে।

স্থানীয় সংস্কৃতি :—Graebner একই সাংস্কৃতিক বিশেষত্বযুক্ত বিভিন্ন মানব গোষ্ঠি সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করে গেছেন (Cyclo-Cultural School)। তাঁর মতে আফ্রিকা এবং ইউরোপে ওশেনীয় সংস্কৃতির পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে—যার কিছু এসেছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে, কিছু বা অতি প্রাচীনকালের অবশেষ হিসাবে বর্ত্তমান সভ্যতার ধারায় থেকে গেছে। ডাঃ হিডেটও তার উপসংহারে বলেন যে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার তলে ওশেনীয় কৃষ্টির ফল্গুধারা প্রবাহিত। তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি প্রথমেই ভাষাগত প্রমাণ দিতে চান। সেজন্যে তিনি ভারত, সুমের, মিশর, ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রাক্-আর্য্য ভাষাগুলির তুলনামূলক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এই সমস্ত জায়গাতেই তিনি অস্ট্রো-নেশিয়া ওশেনীয় ধারার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর মতে Brown Race অধ্যুষিত স্থানগুলিতে দু'রকমের ভাষাগত বিবর্ত্তন হয়েছে। একদিকে সবচেয়ে পুরাতন শ্রেণী যাকে প্রকৃত ওশেনীয় বলা যায়। এর মধ্যে ওশেনীয় ভাষাগুলি ছাড়াও Mon-khmer নামে অষ্ট্রো-এশিয় শ্রেণীও আছে (Mon হচ্ছে বর্ম্মার প্রাচীন ভাষা এবং Khmer কাম্বোডিয়ার)। ভারতে মুণ্ডাদের ভাষা এই বিভাগের অন্তর্গত। অপরদিকে রয়েছে দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা— যা বেশী সমৃদ্ধিশালী ও অপেক্ষাকৃত সভ্যগোষ্ঠিদের দ্বারাই ব্যবহৃত এবং সুমেরীয়, মিশরীয়, বাবিলীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে চলতি ছিল।

সংস্কৃতিগত ঐক্যের দ্বিতীয় পরিচয় পাওয়া যায় উপরোক্ত বিভিন্ন জায়গায় মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রকরণের মধ্যে। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে

Mr. Autran-এর বই "Mithria and Zoroastra"-এর পাতায়। তাঁর লেখার উপসংহারে আছে যে সিন্ধু উপত্যকায় খননের ফলে এক মাতৃদেবী ও তাঁর সঙ্গী অনেক দেবতার সন্ধান মিলেছে। হিন্দুদের, বিশেষতঃ আদিবাসীদের মধ্যে এখনও অনেকটা ঐ ধরণের আরাধনা পদ্ধতি চলতি আছে শিব উপাসনার মাঝ দিয়ে। শিব পশুপতির ও বংশের দেবতা—আবার তাঁর প্রতীক লিঙ্গমূর্তি সৃষ্টিরও সূচক। তাঁর অপর নাম "কাল" তাঁকে কৃষ্ণকায় শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট জাতিদের সঙ্গে যুক্ত করছে। তাঁর সঙ্গিনী তাই "কালী"—কৃষ্ণকায়া এবং মাতা ও মহাদেবী। এই ধর্মের আদিম অনার্য্যভাব বিশেষ সুপরিচিত এবং যদিও হিন্দু ধর্মের ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সঙ্গে শিবকেও (মহেশ্বর) পাশাপাশি বসান হয়েছে তবুও উচ্চবর্ণের মধ্যে শৈব প্রভাব খুবই কম। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই দুই দেবদেবী আর্য্যপূর্ব্ব যুগের এবং সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া মাতৃমূর্তি ও তাঁর সঙ্গীর পরবর্ত্তী সংস্করণ। এঁরাই নীলনদের উপত্যকায় ও ইউফ্রেটিস অঞ্চলে মিনোয়ানদের মাঝে সিবেলাস, এ্যাটিস, ওসিরিস, আইসিস প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই সুবিখ্যাত মাতৃদেবীর আরাধনাপদ্ধতির সুরু প্রাগৈতিহাসিক সময়ে। ভূমধ্যসাগরীয় স্থানগুলিতে ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে বহু প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাসে এ ধরণের অর্চ্চনার উল্লেখ পাওয়া যায়। Poisson তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে (Rev. de Synth. historique, 1920 ; Rev. Anthrop. Oct. 1916 ; Congr. inter. d' Histoire des Religiones, 1923.) দেখিয়েছেন যে মাতৃদেবী অর্চ্চনা ভূমধ্যসাগরীয় জাতিদের একটি বিশেষত্ব। এখন বলা যেতে পারে যে সমস্ত Brown Race এর মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কিম্বদন্তী :—ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্যে উপরোক্ত প্রাচীন সভ্যতাকেন্দ্রগুলির ঘনিষ্ঠতার যে আভাস পাওয়া যায় তা বহু পুরাতন বলে অনেক জায়গায়ই অতি অস্পষ্ট ও অপরীক্ষিত কাহিনীর রূপ নিয়েছে। আবার কয়েক স্থানে পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট কাহিনীকে নিশ্চয়তার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবশ্য এ ধরণের উপকরণ অতি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যখন সম্ভাব্য কিম্বদন্তী অন্য বিষয়দ্বারা সমর্থিত তখন তার ব্যবহার যুক্তি সঙ্গত।

কেবলমাত্র নামের সাদৃশ্য দ্বারা বহুবিস্তৃত ভূভাগে অবস্থিত রাজা বা জন-সাধারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করার চেষ্টা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি তাথা-তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে চেষ্টা করা হয়, ও একেবারে নতুন মত প্রতিষ্ঠা না করে অন্য উপায়ে পাওয়া উপকরণের সমর্থনের জন্যে এই প্রথার প্রয়োগ করা হয় তবে বোধ হয় প্রমাদের সম্ভাবনা কম থাকে। এই নিয়মানুসারে Autran তাঁর "Mithria and Zoroastra" নামক বইতে ভারত ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের

অতি প্রাচীন সম্পর্কের বৎসোদ্ঘাটন করার প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে দ্রাবিড় জাতি প্রাচীনকালে নাম বদলে দ্রামিলাস বলে পরিচিত ছিল। গ্রীকেরা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া মাইনরে ত্রেমিল বা তেরমুলাই জাতির কথা জানত যা নিশ্চয় পূর্বোক্ত নামেরই উচ্চারণভেদ। প্রাচীন লাইসিয়ান জাতি যে এই নামে খ্যাত ছিল একথা তাদের শিলালিপি থেকে জানা যায়। অপরদিকে পুরাকাহিনী অনুসারে লাইসিয়ানরা ক্রীটদ্বীপ থেকে এসেছে। সুতরাং দ্রাবিড় ও ঈজিয়ানের মিনোয়ানরা সম্পর্কযুক্ত বলে আমরা ধরতে পারি। M. Rene Dessnot তাঁর "Lydie et son Voisin" বইতে বলেছেন যে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনরের জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত লিসিয়ানরা হিটাইটদের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয় এবং গ্রীক বিজয় পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সুমের ও আক্কাদের আত্মীয়তার কাহিনী বিশেষ পরিচিত ছিল। অপরদিকে সুমের ও আক্কাদের সঙ্গে আর্য-পূর্ব ভারতের ঘনিষ্ঠতা সুপরিচিত। হেরোডোটাস লিখেছেন যে লিসিয়ানরা মাতার নামানুসারে নিজেদের পরিচয় দিত এবং বংশাবলীর ধারা কন্যাদের থেকেই গণনা করা হত। ঠিক একই ধরনের রীতি ভারতের মালাবার উপকূলে প্রচলিত আছে।

Autran তাঁর রচনায় ফিনিসিয়দের অ-সেমেটিক জাতিরূপে চিত্রিত করেছেন ও তাঁর মতানুসারে সিরিয়ার উপকূলে বসবাসের ফলে সেমেটিক হবার আগে ফিনিসিয়রা এশিয়া মাইনরে বাস করত। Raymond Weill এই ধারণা সমর্থন করেন এবং বলেন যে ফিনিসিয়া নাম সমগ্রভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রযুক্ত ছিল—পরবর্তীকালেই তা কেবল প্যালেস্টাইনকে বোঝায়। হেরোডোটাসের মতে ফিনিসিয়রা লোহিত সাগরের উপকূল থেকে প্যালেস্টাইনে আসে। অপরাপর লেখকেরা তাদের পারস্য সাগরের উপকূলবাসী বলে গণ্য করলেও লোহিত সাগরের তীরে তাদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। মিশরীয় পুস্তকে লোহিত সাগরের কূলে পান্ট নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়—যা পোনি বা পুনি কথার সমতুল্য এবং ল্যাটিন ভাষায় এই শেষোক্ত নামে কার্থেজের ফিনিসিয়দের পরিচিত করা হত। কথিত আছে যে পান্টে এক বিরাট সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল যার অধিনেত্রী ছিলেন এক রাণী। স্বভাবতঃই এ কাহিনী আমাদের রাণী সেবার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে লিসিয়ানদের ও মালাবার উপকূলের মাতৃমুখী সমাজের ইতিহাস। তিনি তালবৃক্ষসমন্বিত ভারতের পূর্ব উপকূল ফিনিসিয়দের আদি নিবাস বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে Phoenicks কথার অর্থ—তালবৃক্ষ সমন্বিত উপকূলের অধিবাসী।

এই সম্বন্ধে Baron d'Eckstein ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "Athenian Francais" বইতে যে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন তা সমসাময়িক জগতে বিশেষ আদর পায় নি।

ও Fancois Leuormant তাঁর "Manual d'Histoire ancienne de l' Orient" পুস্তকে উক্ত প্রবন্ধগুলি ব্যবহার করেছেন। Eckstein প্রথমে কুশ (Kousch) শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। Genesis (x, 6) এর বংশ পরিচয় তালিকায় Kousch-কে বলা হয়েছে Cham এর পুত্র, এবং তা থেকে বোঝা যায় যে সে বাদামী বর্ণের জাতির অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে অনেকে কুশ পারস্য উপসাগরকূলের দেশগুলির ভৌগলিক নাম বলে স্থির করেছেন। যেহেতু কুশ নাম সেখানে আসে Elam এর Cosseans বলে পার্ব্বত্যজাতি থেকে। কেউ কেউ আবার ব্যাবিলনস্থ কাসাইটদের সঙ্গে এ নাম যোগ করেছেন। কিন্তু কাসাইটরা বহু উত্তর থেকে এসেছিল ও তারা Cosseansদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কুশের বংশধরদের লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের আশে পাশে বসবাসকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এদেরই একজন, নিমরড, ব্যাবিলনের স্থাপয়িতা ও সে কারণে সুমেরীয় বলে খ্যাত। কুশ ও নিমরড যে বাদামী জাতির লোক ছিলেন তার সমর্থন পাওয়া যায় ব্যাবিলনের স্মৃতিফলকে খচিত উদাহরণে ও সুসার ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত কোন কোন পারসিক সৈন্যের আকৃতি থেকে।

সুসার থেকেই গ্রীক কাহিনীতে পূর্ব্ব ইথিওপীয়দের রাজা মেমননের নাম এসেছে। এরা পশ্চিম ইথিওপীয়দের থেকে পৃথক হলেও তাদেরই মত বাদামীবর্ণের ছিল। ভারত সাগরের কূলে পর্যন্ত ইথিওপীয়দের নগর ছিল এবং প্রাচীন গেড্রোসিয়াতেও তাদের জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাকাহিনী অনুসারে এ জায়গা ছিল বাদামী বর্ণের জাতিদের বাসভূমি। এইভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানবগোষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ যার উত্তরে প্রসারিত হউচ্চ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা। মিশরীয় বইতে পাওয়া যায় যে হেরোরা নীলনদের উপত্যকার নিউবীয়দের কুশ নামে ডাকত। মিশরীয়দের দ্বারা শাসিত হয়ে তারা মিশরের সভ্যতা গ্রহণ করে ও পরে তারা মিশর জয় করে সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করেছিল। গ্রীকেরা এদের ইথিওপীয় বলত। মিশরীয় ইতিহাসগবেষক মেসপিরাস্ এদের Elam অর্থাৎ পূর্ব্ব ইথিওপীয়দের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। অপরপক্ষে Edouard Meyer 'কুশ' শব্দটি অনেকের মনেই মোহজাল বিস্তার করেছে বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ শব্দটি অতি সঙ্গতভাবে মিশর ও ভারতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এক সাংস্কৃতিক ও জাতিগত ঐক্যের সন্ধান দিচ্ছে। Genesis কুশ ও তার এক পুত্র সম্পর্কে সিন্ধুর তটবর্ত্তী এক স্বর্ণময়ী নগরীর উল্লেখ করছে (Genesis II, 11, 13 ; Josephe, Arch. I, 13 ; Usebe, I, 14). Eckstein-ও বলেন যে আর্য্যরা ভারতের জম্বুদ্বীপ নাম দেবার আগে এদেশের প্রাচীন নাম ছিল কুশদ্বীপ। তিনি এই প্রসঙ্গে গুজরাটের কুশস্থলী নগরীর উল্লেখ করেছেন।

Genesis-এর বংশ তালিকায় উল্লিখিত মিশরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট Capthorim নামের বিভিন্ন অপভ্রংশও ভারতের পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে আফগানিস্থান, ব্যাবিলন, ক্রীট, গ্রীস প্রভৃতি জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা জনপদের মধ্যে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ Kap শব্দটি আদিম অর্থে ভারত থেকে ভূমধ্যসাগরাঞ্চল ব্যাপী Brown Race-এর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

এইভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা ভারত ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে যোগা-যোগের যে সব নিদর্শন পাই, প্রাচীন জগতের আর্য্যপূর্ব্ব জাতিসমূহের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তা একেবারে প্রামাণ্য না হলেও অত্যন্ত কার্য্যকরী।

অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর

জন্ম—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ

মৃত্যু—১৯৫০

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতীয় প্রত্নবিদ্যার অনুশীলন ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। ৭৫ বৎসর পূর্বে—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তিনি মহারাষ্ট্র দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর—সেকালের একজন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভারতীয় প্রত্নবিদ্যার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ সাধক। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার অসীম অধ্যবসায় ও প্রবল অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে যে সকল গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, ঐগুলি এখনও পর্যন্ত অনুসন্ধানরত ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক সকলেরই পথপ্রদর্শকের কার্য করিতেছে। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর তাঁহার পিতার নিকট হইতে পুরাতত্ত্ব অনুশীলনের প্রতিভাও উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন; কারণ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই তাঁহার মনে নিজ দেশের পুরাতন ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার বাসনা প্রবল হইয়াছিল। তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'ভগবানদাস পুরুষোত্তমদাস সংস্কৃত স্কলারশিপ' লাভ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি বোম্বাই এডুকেশনডিপার্টমেণ্ট সার্ভে বিভাগের অবৈতনিক সহকারী অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত

হ'ন। এই পদাধিকার কালে তিনি ভারতীয় জাতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন তাহা অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার গবেষণা কার্যে বিশেষ সহায়ক হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে (Indian Archaeological Survey) কর্ম গ্রহণ করেন ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিভাগের Western Circleএর Superintendent নিযুক্ত হন। ইহার বহু পূর্ব হইতেই তিনি পুরাতত্ত্ব অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিজ নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ও তাঁহার কয়েকটী মৌলিক ও মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যের আদর মিলিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। Royal Asiatic Societyর বোম্বাই শাখা তাঁহাকে ঐ সময়ে (১৯১১) Sir James Campbell স্বর্ণ পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। তখন ইহা পাণ্ডিত্য খ্যাতির এক অতি উচ্চ সম্মান ছিল; দেবব্রত ভাণ্ডারকরের পূর্বে উক্ত পদক Sir Aurel Steinকে দেওয়া হইয়াছিল। সংস্কৃতজ্ঞ, প্রত্নতাত্ত্বিক, উচ্চাঙ্গের গবেষক ও আবিষ্কারক হিসাবে Steinএর নাম সর্বজনবিদিত। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাণ্ডারকর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম কেন্দ্রের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি তাঁহার বিভাগীয় কার্য সম্বন্ধে যে সকল বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা এদেশের পুরাতত্ত্ব অনুশীলনকারীদের পরম আদরের বস্তু, কারণ ঐগুলি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও শিক্ষাপ্রদ।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডারকর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক নির্বাচিত হ'ন। ঐ সময়ে তিনি একই সময়ে কারমাইকেল অধ্যাপক এবং Indian Museumএ Arebaeological Sectionএর Superintendent ছিলেন। এই সূত্রে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ancient Indian History and Culture এবং Anthropology বিভাগদ্বয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকদিগের কার্যে বিশেষ সাহায্যপ্রদ হইয়া উঠে। আজ পর্যন্ত সে যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই এবং উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সকল ও অনুরূপ বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিশেষত্ব। কারমাইকেল অধ্যাপকরূপে কয়বৎসর তাঁহাকে ইতিহাস বিভাগের কার্যেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে A. I. H. C. বিভাগের নিয়মিত অধ্যাপনার ব্যবস্থা বস্তুতঃ ১৯১৮ সাল হইতেই আরম্ভ হয়, এবং ভাণ্ডারকর ইহার তদানীন্তন কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহচর্যে উক্ত বিষয়ের যে পঠনপ্রণালী প্রস্তুত করেন, তাহা মূলতঃ আজও পর্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ভারতের অপর কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়েও উহার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এ বিষয়ে অগ্রণী। ভাণ্ডারকর প্রায় বিশ বৎসর কাল (১৯১৭—৩৬)

কারমাইকেল অধ্যাপক পদে অভিষিক্ত ছিলেন ; তিনি এই সময়ে ও ইহার পরও বহু কৃতী ছাত্রের গবেষণাবৃত্তির পূরণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুশীলনে তাঁহার সুযোগ্য ছাত্রগণের দান উল্লেখযোগ্য।

জীবনে তিনি বহু সম্মান পাইয়াছিলেন। এই সকল তদানীন্তন ভারত সরকার অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এবং দেশের ও বিদেশের বিদ্বজ্জনসমাজ ও নানাবিধ সংস্কৃতিমূলক গোষ্ঠী কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐগুলির ধারাবাহিক উল্লেখ করিয়া আমার এই স্মৃতিতর্পণ সম্পর্কিত প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক যে পাণ্ডিত্যপ্রতিভার জন্য তিনি নানাপ্রকার সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন, আমি কেবল উহার বৎসামান্য পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব। দেশুণের প্রায় একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক পত্রিকা 'Indian Antiquary'তে তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অতীব মূল্যবান্। আমি উহাদের মধ্যে মাত্র একটীর নামোল্লেখ করিব। উক্ত পত্রিকার Jackson Memorial সংখ্যায় (১৯১১) তিনি 'Foreign Elements in Hindu Population' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, উহা অতীব তথ্যবহুল, মৌলিকতার পরিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণার একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলা আবশ্যক যে তিনি বহু বৎসর যাবৎ উক্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক রূপে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক গবেষণার প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কিছু পরেই পত্রিকাটীর প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়। প্রায় একই সময়ে তিনি তাঁহার দুইজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বন্ধুর সাহচর্যে কলিকাতায় "Indian Culture" নামক ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত একটী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহা আজিও তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া সুধীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। Archaeological Survey of India's Western Circleএর অধ্যক্ষ থাকা কালে এবং তাহার বহু পূর্বে ও পরে তিনি লকুলীশ পাশুপত (শৈব) সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার নানা প্রবন্ধে যে নূতন এবং উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির ঐতিহ্যানুসন্ধানকারীগণের নিকট পরম আদরণীয় হইয়া আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব ও অশোক সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি এসম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন লেখমালার পাঠোদ্ধার ও তথ্য বিচার বিষয়ক তাঁহার বহু মৌলিক ও মূল্যবান প্রবন্ধ ভারতীয় প্রত্নবিদ্যাসাধকদিগের অবশ্য পাঠ্য ও বিচার্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কয়েকজন ছাত্র

ও সহকর্মীর সহায়তায় Kielhorn's List of North Indian Inscriptions এর যে পরিশোধিত, পরিবর্দ্ধিত এবং অধুনাতন সংস্করণ কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় ঐতিহাসিকদিগের গবেষণা কার্যের বিশেষ সহায়ক। তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদি গভীর ও মহামূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ ও তাঁহার রচনা প্রণালীর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাতে তাঁহার লেখা সাধারণ পাঠককেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের কিছু পরেই তিনি একটি সুকঠিন কার্যের ভার লইয়াছিলেন। Fleetএর Gupta Inscriptions (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর গুপ্ত ও অব্যবহিত গুপ্তোত্তর যুগ সম্বন্ধীয় তথ্যবহুল বহু লেখমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নবিভাগ সে জন্য Fleetএর গ্রন্থের একটা দ্বিতীয় ও অধুনাতম সংস্করণ বাহির করিবার সম্বন্ধে বহুদিন হইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সংস্করণের সম্পাদনার গুরুভার তাঁহারা দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে এ ভার অর্পিত হইতে পারিত না—কারণ ভাণ্ডারকর এ বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে তিনি এ কার্য লইয়াই অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ তাঁহার বিশেষ স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার অনেক বন্ধু আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে হয়ত ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি প্রারব্ধ কার্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রচুর কর্মশক্তি, অসীম বিদ্যানুরাগ ও অদম্য ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জয়ী ও কৃতকার্য করিয়াছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি উক্ত বিরাট গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য যথাস্থানে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনে হয় একার্য অসমাপ্ত রাখিয়া গেলে পরলোকে তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করিতে পারিত না।

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি বিষয়ক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীতে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যাঁহারা তাঁহার রচনাসমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই ঐবিষয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন। তথাপি ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসূত তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির প্রত্যেকটাই যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য ও সর্বজনগ্রাহ্য একথা বলিলে সত্যের অপলাপ ও তাঁহার স্মৃতির অবমাননা করা হইবে। এমন কোনও পণ্ডিতের কথা অন্ততঃ আমার জানা নাই যাঁহার গবেষণার ফলসমূহ অভ্রান্ত, চিরগ্রাহ্য ও সমালোচনার বহির্ভূত। বিশেষতঃ ভারতের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানরাশি স্বতঃই পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের কোনও পূর্বকৃত সিদ্ধান্ত নূতন নূতন তথ্যাবিষ্কারের ও বিচারের ফলে শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী

হইতে পারে নাই সত্য। কিন্তু যেগুলি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া আছে ও যাহা নাই, ইহাদের প্রত্যেকটার সম্পাদনে তিনি যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে ইতিহাসানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই অনুকরণযোগ্য।

ভাণ্ডারকর মহাশয় সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সহজাত সৌজন্য ও ভদ্রতার অধিকারী হইয়াছিলেন। কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে বাংলায় আসিতে ও বসবাস করিতে হইয়াছিল। এদেশে অবস্থানের প্রারম্ভকাল হইতেই বাংলা ও বাঙালীকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম্মজীবন তিনি কলিকাতাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে সুপরিণত বয়সে আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতা মহানগরীতেই তাঁহার নশ্বর দেহাবসান হইয়াছে। সত্যই ইহা তাঁহার বাংলাদেশের ও বাঙালীর প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যের পরিচায়ক।

সুবা বাংলার পর্তুগীজ বাসিন্দা

(১)

হুগলী সহর এবং বণিক ও পাদ্রী সম্প্রদায়

শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী

ষোড়শ শতকের গোড়া থেকেই পর্তুগীজরা বাংলাদেশে আসতে সুরু করে। ১৫১৫—'১৬ সনে যখন এদেশে মুঘল রাজত্বের গোড়া পত্তন হল তা'র আগেই বাংলার নানা জায়গায় পর্তুগীজরা ছোট ছোট ঘাঁটি করে বসেছে। আর এই সময় তারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসার জন্য বাংলায় নিয়মিত আনাগোনাও করত। আকবর বাদশার আমলে হুগলী সহরের পত্তন হওয়ার পর থেকেই পূর্বভারতে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি বিশেষ বেড়ে যায়। এবং শাহজাহান বাদশার রাজত্বে ১৬৩২ সনে মুঘল ফৌজের হাতে হুগলী ধ্বংস হওয়ার আগে পর্য্যন্ত বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য তাদের প্রায় একচেটিয়া দখলে ছিল। তার পরেও অনেকদিন তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় ছিল। এমন কি আঠারো শতকের শেষ অবধি তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অনেক নজীর পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্বন্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। মিঃ কাস্পোস "The Portuguese in Bengal" এবং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের লিখিত পরিচ্ছেদে এই ইতিহাসের সুষ্ঠু আলোচনা করা হয়েছে। সুধা বাংলায় পর্তুগীজ বাসিন্দাদের সামাজিক জীবনই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

সে যুগের বিদেশী ভ্রমণকারী এবং পর্তুগীজ পাদ্রীদের লেখা ভ্রমণকাহিনী আর চিঠিপত্রে এ বিষয়ে অনেক খবর ছড়ান আছে। মুঘলরা বাংলাদেশ দখল করার বছর দশেক আগে ভেনিসীয় পর্যটক Cesar Federici বাংলাদেশে আসেন। এদেশে পর্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক সংবাদ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায়। বাংলায় প্রথম ইংরাজ আগন্তুক Ralph Fitch (১৫৮৩—'৯১)* পর্তুগীজদের সাহায্যেই এদেশের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। এজন্য তাঁর ভ্রমণ কথায় হুগলী এবং চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান। প্রায় একই সময় ওলন্দাজ পর্যটক Huyghen van Linschoten (১৫৮৩—'৮৯) পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতে এসে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে যান। চট্টগ্রামের পর্তুগীজ ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। সম্ভবতঃ তাঁর লেখা প্রাচ্যের পর্তুগীজ বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার সুদীর্ঘ বর্ণনা বাংলার পর্তুগীজদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ বিষয়ে তার দীর্ঘ পরিচ্ছেদটির শিরোনামা—"Of the customes of the Portingales,···as wel of Goa, as of all the Oriental countries"—দেখেও এই সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয়। Van Linschoten এর মত ফরাসীদেশের Francois Pyrard de Laval (১৬০২—'১০) পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতে অনেকদিন ছিলেন। তাঁরও চট্টগ্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। ফলে এ-দুজনের বর্ণনায় যথেষ্ট মিল আছে। ইটালীয় পর্যটক Pietro della Valle (১৬২৩—২৪) প্রাচ্যের পর্তুগীজদের সাধারণভাবে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও প্রায় একই ধরণের। তবে বাংলাদেশে তিনি নিজে কখনও আসেন নি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে ক্যাথলিক পাদ্রীদের বর্ণনা এবং চিঠিপত্র এইসব ভ্রমণ বৃত্তান্তের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে লেখা জেসুইট পরিদর্শক Nicolas Pimenta এবং পাদ্রী Francois Fernandes আর Melchoir da Fonseca-র চিঠিপত্র এদিক থেকে বিশেষ স্মরণীয়। ষোড়শ—সপ্তদশ শতকের ফরাসী ঐতিহাসিক Pierre du Jarric-এর Histoire des Indes Orientales (Bordeaux, 1610) নামক গ্রন্থে এবং Samuel Purchas-সঙ্কলিত Purchas—His Pilgrimes এর দশম খণ্ডে এর কয়েকটি চিঠির অনুবাদ পাওয়া যায়। সুধা বাংলার পর্তুগীজ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রামাণ্য নবীন পর্তুগীজ পাদ্রী Sebastian Manrique—এর (১৬২৯—১৬৪৩) ভ্রমণ বৃত্তান্ত। আরাকান

---

* বন্ধনীর ভিতরকার তারিখগুলি ভ্রমণকারীদের ভারতবর্ষ বা প্রাচ্য ভ্রমণের সময় নির্দেশক। মোটামুটি ভাবে সঠিক হলেও এর কয়েকটি কিছুটা আনুমানিক।

আর বাংলায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিস্তৃত বর্ণনা তিনি লিখে রেখে গেছেন তা'তে এদেশে তাঁর স্বজাতিদের জীবনযাত্রার একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁরই সমসাময়িক John Cabral-এর চিঠিতে হুগলী সহর এবং মুঘল ফৌজের হাতে হুগলী ধ্বংস হওয়ার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হুগলীতে মুঘল আক্রমণের সময় Cabral সেখানে উপস্থিত ছিলেন। Luard ও Hosten-এর অনুদিত Manrique—এর ভ্রমণবৃত্তান্তের (অক্সফোর্ড, ১৯২৭) পরিশিষ্টে এই চিঠির একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আওরঙ্গজেবের আমলে যে সব ইউরোপীয় পর্যটক এদেশে আসেন তাঁদের অনেকেরই বর্ণনায় বাংলার পর্তুগীজদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তার ভিতর ইংরাজ নাবিক Thomas Bowrey এবং ফরাসী পর্যটক Francois Bernier-এর বর্ণনা কিছুটা বিস্তৃত।

এ বিষয়ে তথ্য শুধু যে বিদেশীদের লেখায়ই রয়েছে তা নয়। পর্তুগীজদের উৎপাত সম্বন্ধে অনেক খবর জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার সমকালীন ইতিহাস 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়বী'-তে পাওয়া যায়। আর চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের আমলের বাংলার ইতিহাস 'ফতিহা-ই-ইবরিয়ার' বর্ণনা প্রামাণ্য। হুগলীর পর্তুগীজদের বিশদ বর্ণনা রয়েছে শাহজাহানের রাজত্বের ইতিহাস 'বাদশাহনামা' এবং 'আমাল-ই-সালিহ'তে। তাছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে 'ফিরিঙ্গী' অর্থাৎ পর্তুগীজদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামগোপালের শাখানির্ণয় এবং রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলের' নাম করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে 'পুর্তুকিস' শব্দটিও পাওয়া যায়। অবশ্যি বাঙ্গালী কবিরা পর্তুগীজদের নামোল্লেখ করেছেন মাত্র, তাদের বিষয় বিশেষ কিছু খবর দেন নি। তবে বাংলার কুলপঞ্জীগুলিতে পর্তুগীজ অত্যাচারের অনেক নজীর আছে।

বিদেশী পর্যটকরা বাংলার পর্তুগীজদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক সময়েই সাধারণভাবে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে তাঁরা প্রায় সবাই একমত যে সুবা বাংলায় পর্তুগীজ বাসিন্দাদের 'না ছিল কোন, না ছিল সরকার, যে যার খেয়ালখুশী মত থাকত এবং তারা বেশীর ভাগই সেই জাতের লোক যারা কোনও না কোনও কুকীর্তি করে সভ্য শাসনের আওতায় থাকবার সাহস হারিয়েছে।' ফিরিঙ্গী হার্মাদদের সম্বন্ধে কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। এবং মগ রাজার অপকীর্তির সহায়ক চট্টগ্রাম-দিয়াঙ্গার পর্তুগীজ অধিবাসীদের জীবনধারা সম্বন্ধেও মন্তব্যটা খাটে—সে কথা ঠিক। যারা দেশী রাজাদের ফৌজে চাকরী নিয়ে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টায় বাংলাদেশের নানা আনাচে কানাচে গিয়ে বসত করেছিল, তারাও ঠিক ভদ্র জীবন যাপন করত না—Nicolas Pimenta এবং তাঁর সমসাময়িক পাদ্রীদের চিঠিপত্রে তার নজীর আছে।

বাদশাহী ফরমানের আওতায় পর্তুগীজ কাপ্তেন Pedro Tavares যখন হুগলী বন্দরের পত্তন করেন, তখন তাঁর পক্ষেও নতুন সহরের বাসিন্দা নেওয়ার ব্যাপারে বেশী বাছবিচার করা সম্ভব হয় নি। বন্দর গড়ে তোলার উৎসাহে পর্তুগীজ আর ফিরিঙ্গী জেলেবাদী চোরবদমাস তাকাত যে এসেছে তা'কেই তিনি যথাসাধ্য টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। ফলে হুগলী বন্দরেও জীবনযাত্রার তালমান কিছুটা স্তব্ধ ছিল সন্দেহ নেই।

গোড়ার দিকটায় হুগলী থেকে গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের কাছে নানা রকম নালিশ-ফরিয়াদ পৌঁছাত বটে, কিন্তু সত্যিতে নিজেদের ব্যাপারে হুগলীবাসীরা বাইরের কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করত এমন মনে হয় না। ক্রমে ক্রমে হুগলী সহরে ভদ্র জীবনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে। তবে মাঝে মাঝেই ল্যাটিন জাতির স্বাভাবিক প্রাণ-প্রাচুর্য্য তথাতার বেড়া ভেঙে বেরুত সন্দেহ নেই। হুগলীর পর্তুগীজরা শুধু গোয়ার সরকারকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাত না, বাদশা সুবাদারেরও তারা অল্পই তোয়াক্কা করত। 'সায়ার' অর্থাৎ শুল্ক দেওয়া ছাড়া মুঘল সরকারের তারা বড় একটা ধার ধারত না। বন্দরে ঢুকতে হলে সুবাদারের জাহাজকেও রীতিমত আদব মেনে হুগলীর পর্তুগীজ সরকারকে সম্মান জানাতে হত। একমাত্র স্পেনের রাজার কর্তৃত্ব নামে স্বীকার করা হত। তাঁরই হুকুমমত সহরবাসীরা প্রতি বছর একজন Capitan Convidor এবং চারজন সহকারী নির্বাচন করত। সহরের ভিতরকার সমস্ত ব্যাপারে Capitan Convidor এর ক্ষমতাই ছিল সবার উপরে। Cabral এর চিঠি থেকে জানা যায়, মুঘল আক্রমণের সময় সহরের কাপ্তেন বাসিন্দাদের ভিতর বন্দুক বিলি করে দেন এবং নগর রক্ষার জন্য ক'জন সহকারী কাপ্তেন নিয়োগ করেন। সে সময় সহরের লোকেরা সভা করে কর্তব্য স্থির করত বলেও জানা যায়।

ঢাকা বা মুঘল সরকারের অধীন আর সব সহরে বা তার কাছাকাছি যে সব পর্তুগীজরা থাকত তারা ঠিক এতটা স্বাধীন ছিল না, সে কথা না বললেও বোঝা যায়। তবে দৈনন্দিন জীবনে তাদের খুব কিছু সরকারী বাধা-নিষেধ মেনেও চলতে হত না। বিশেষ করে জাহাঙ্গীরের আমলে বাদশা তাদের একটু বেশী খাতির করতেন বলে বাংলায় পর্তুগীজরা নানা রকম সুযোগ সুবিধা পায়। অনেকে বিস্তর জায়গাজমিও ইনাম পেয়েছিল।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রথম সুরু হল পর্তুগীজদের চেষ্টায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের জীবনে এদেশের পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী স্থায়ী হয়েছে বলতে হবে। তবে সে যুগে সম্ভবতঃ ফিরিঙ্গী বলতে বাঙালীরা হার্মাদদের-ই বুঝত। কারণ হার্মাদদের অত্যাচার পর্তুগীজদের আর সব কার্য্যকলাপকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শুধু সে অত্যাচারের কত-

চিহ্নগুলি আজ মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ফিরিঙ্গী বণিকরা এদেশের জীবনে যে নতুন স্রোত বয়ে আনল তার ধারা এখনও শুকায় নি।

প্রথমে ষোলশ' পর্তুগীজ বণিকরা বাংলাদেশে, বিশেষ করে হুগলী সাতগাঁ অঞ্চলে, এসে কিছুদিনের জন্য ঘাঁটি করে থাকত, কিন্তু স্থায়ীভাবে বসত করত না। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, চীন, ফিলিপাইন, পশ্চিম ভারত এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলি থেকে নানা মালপত্র এনে তারা বাংলার হাট-বন্দরে বিক্রী করত। হুগলী নদীতে চড়া পড়ায় সাতগাঁ পর্যন্ত তাদের বড় জাহাজগুলি আর যেতে পারত না। বেতোড়ে,—মানে বর্তমান হাওড়ার সন্নিহিত বাঁটড়ায়—বড় জাহাজগুলি নঙ্গর ফেলত। আর ছোট ছোট নৌকা করে পর্তুগীজরা হাটে হাটে কেনা বেচা করত। ক'মাস এদেশে থেকে মালপত্র কিনে তারা গোলা বোঝাই করত। অনেক বলেন সেই গোলা থেকেই নাকি হুগলী সহরের নাম হয়েছে। তারপর ঝড়-বাদলা কমে সমুদ্র আবার জাহাজ চলবার উপযুক্ত হলে পর ফের তারা বেড়িয়ে পড়ত বাংলার মালপত্র নিয়ে এশিয়ার নানা দেশে বেচতে। যাবার সময় তারা বেনেদের বহু টাকা দাদন দিয়ে যেত জিনিষপত্র কিনে রাখার জন্য। পরের বছর এসে সে সব জিনিষ আবার তারা গোলায় তুলত। ক্রমে তাদের থাকবার সময় বেড়ে মাস পেরিয়ে বছর হল। এমনি করেই আস্তে আস্তে হুগলী সহরের পত্তন হল এবং হুগলীকে কেন্দ্র করে বাংলায় পর্তুগীজদের ব্যবসা-বানিজ্য কেঁপে উঠল।

হুগলীতে যারা স্থায়ীভাবে বসত করল, অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের নাড়ীনক্ষত্র তাদের জানা। ফলে আগে যেমন নানা জায়গা থেকে পর্তুগীজরা বাংলায় এসে জিনিষ কেনা বেচা করে ফিরে যেত, এখন তেমনি সেগু, সিংহল, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পর্তুগীজ-অধিকৃত ভারত এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে বাণিজ্যের আর একটি ধারার সৃষ্টি হল যার উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশে। আর বিদেশী মানে বোম্বাই হয়ে বাংলার পর্তুগীজদের নৌকো পাটনা পর্যন্ত যাতায়াত সুরু করল। হুগলীর ফিরিঙ্গী বণিকদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন। ফলে সহরের রাস্তাঘাট হাটবাজারে পর্তুগীজ আর আধাপর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষীর ভীড় জমল। Pedro Tavares-এর কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে যে সব চোর বদমাস হুগলীতে বসত করেছিল, তারাও ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ দু' পয়সা করে অল্প দিনের মধ্যেই জাঁকিয়ে বসল। ফিরিঙ্গী বণিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কারণ মগ বা দেশী রাজাদের ফৌজে ঢুকে অথবা হার্মাদের দলে যোগ দিয়ে যারা প্রথম জীবনে লুঠতরাজ করে খেত তাদের অনেকেই মরুক ভাঁটা পড়লে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিত। মোট কথা, দশবিশ বছরের ভিতর হুগলীর ধনসম্পদ উপচে পড়ল। হুগলী নদীর দুই পাড়ে পর্তুগীজদের বসতি গড়ে উঠল।

দেশের চেহারা বদলে গেল। শোনা যায় বিশ্বাসঘাতক Martin Alfonso de Mello নাকি পর্তুগীজদের অসাধারণ সম্পদের লোভ দেখিয়েই মুঘলদের হুগলী আক্রমণের প্ররোচনা দেয়। ধর্মপ্রাণ Monrique-এর বাংলাদেশে এসে স্বজাতীয় বণিকদের ধরণ-ধারণ বেশী ভাল লাগে নি। তিনি দুঃখ করে বলেছেন—এরা জীবনে শুধু এক টাকাই চিনেছে। Du Jarric-এর উদ্ধৃত চিঠিপত্রেরও সুর একই। তাদের বক্তব্য—হুগলীর বণিকদের ঐহিক সম্পদ প্রচুর বটে, কিন্তু পায়ের কড়ি জোটাবার দিকে তাদের নজর কিছু কম। Tavernier লিখে গেছেন যে ওলন্দাজরা না এলে ভারতবর্ষের পর্তুগীজ 'ফ্যাক্টরী' গুলিতে লোহার জায়গায় শুধু সোনারূপাই দেখা যেত। ক্যাম্পোস সাহেব কিন্তু ঠিকই বলছেন যে ওলন্দাজরা আসা সত্ত্বেও এদেশে পর্তুগীজদের বাড়ীতে সোণারূপার কোনও অভাব হয় নি।

তাদের চরম প্রাচুর্যের যুগে পর্তুগীজ বণিকদের অনেকেই পরগাছাবৃত্তি অবলম্বন করে। ওলন্দাজ পর্যটক Huygben van Linschoten লিখে গেছেন—"ভারতবর্ষের পর্তুগীজ আর আধা-পর্তুগীজরা কখনও গায়ে খাটে না।.....তাদের দোকানপাটে কেনা গোলামরাই কাজ-কর্ম দেখে।" তাঁর লেখায় এই অলস জীবন-যাত্রার একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "পর্তুগীজদের মধ্যে অনেক বিবাহিত লোক বাঁদী-গোলাম কাটিয়ে রক্ষিত যোগাড় করে। এক এক জনের দশ বিশ কি ত্রিশজন পর্য্যন্ত গোলাম থাকে। কারণ তাদের পুষতে বিশেষ খরচ লাগে না। তারা পয়সা নিয়ে বাইরের লোকের কাছে মজুরী খাটে।.....বাঁদীরা নানান্ রকম যোগরুটী আর দেশী ফলের আচার বানায়। তারা অনেক সূক্ষ্ম সূঁচের কাজও করে...। শেষে তাদের ভিতর থেকে বেশ কমবয়সী আর খুবসুরত দেখে কাউকে বেছে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে পসরা নিয়ে বাজার রাস্তায় ফিরি করতে পাঠান হয়।" ওলন্দাজ পর্যটক বেশ খোলাখুলি লিখেছেন যে এই পসারিণীরা শুধু আচার যোগরুটী আর শিকন কাপড়ের-ই বেসাতি করত না। ফলে তাদের যোগানারে প্রভু-ভৃত্যা সবারই ভরণ-পোষণের বেশ ভালই ব্যবস্থা হয়ে যেত। Cabral-এর চিঠিতে পর্তুগীজদের চতুর ধাঁধুনী, মহুরা, মেয়ে পর্যন্ত এসবের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে Van Linschoten-এর বর্ণনা হুগলী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মুঘল আক্রমণের সময় সহরের বাসিন্দাদের বেশ একটা বড় অংশই ছিল গোলাম আর মজুরেরা,—এ খবরও তাঁর চিঠি থেকেই পাই।

জীবিকা অর্জনের আরও নিকৃষ্ট উপায়ও পর্তুগীজ বণিকদের অজানা ছিল না। মিয়ানমার বর্মা এবং পর্তুগীজ দাসব্যবসায়ী জলদস্যুদের সঙ্গে তাদের রীতিমত কার-কারবার ছিল। হার্মাদরা হুগলী, হিজলী এবং সম্ভবতঃ বাংলার অন্যান্য পর্তুগীজ ঘাঁটিতেও বাংলারই গ্রাম আর সহরতলী থেকে ধরে আনা অসহায় মেয়ে পুরুষদের বেচতে আসত। শুধু পর্তুগীজ নয়, ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও তাদের কিনে

নানাদিকে চালান দিত, শোনা যায় যে তাদের জাহাজে দাঁড় বাওয়ার জন্যও পর্তুগীজ বণিকরা বেশ নিয়মিত ভাবেই বাঙালী গোলাম কিনত এবং এই গোলামের সংখ্যা ক্রমেই এত বাড়তে থাকে যে দেশের অনেক জায়গা জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে।

তবে ফিরিঙ্গী বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সবাই যে শুধু অসদুপায়েই ফুলির জোগাড় করত তা নয়। অন্ততঃ তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গরীব কিছু লোক খেটে খেত বলেই জানা যায়। পর্তুগীজদের সম্পদের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এরাই টিঁকে যায়। নানা রকম হাতের কাজ আর রুটি-বিস্কুট মিঠাই-মণ্ডা আচার-মোরব্বা তৈরী করে তারা জীবিকা উপার্জন করত। টুপি, জুতা, নৌকার পাল, সিল্ক এবং সুতার মোজা এসব তৈরী করতে তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। ইংরেজ আর ওলন্দাজরা এদেশে এসে ঘাঁটি করার পর তাদের জাহাজে 'ফ্যাক্টরী'তে রুটি-বিস্কুট যোগানর ভার এদের উপর পড়ে। আঠারো শতকে ব্যাণ্ডেল থেকে দলে দলে কলকাতা চলে আসার পরও অনেক ফিরিঙ্গী তাদের জাত ব্যবসা ছাড়ে নি। কলকাতার 'নয়া বাজার' আর ফিরিঙ্গীপাড়ার কেক-বিস্কুটের দোকানগুলিতে খোঁজ করলে জানা যায় যে মালিকদের অনেকেই পর্তুগীজ বংশাবতংস এবং আর কিছুতে না হোক্ অন্ততঃ তাদের নামে এখনও পুর্তিগালিয়ার স্মৃতি বেঁচে আছে। সুপরিচিত 'Dacca cheese' এবং 'Bandel cheese'-ও এদেরই কীর্তিচিহ্ন বলেই মনে হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের আমলে বাংলার পর্তুগীজদের কথা বলতে গিয়ে Bernier আর Bowrey বিশেষ করে এই শ্রেণীর লোকের কথাই লিখেছেন।

সে যুগে এদেশের ফিরিঙ্গী সমাজে নানা সম্প্রদায়ের পাদ্রীদেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাংলাদেশে Jesuit, Augustinian এবং Dominican পাদ্রীদের কীর্তিকলাপ তাদের নিজের নিজের সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আলোচনা করা হয়েছে। কাস্পার্স্ সাহেবের বইয়ে এবং অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত Manrique-এর ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকায়ও এদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

গোড়ার দিকে বাংলার ক্যাথলিক মিশনগুলির কর্তৃত্ব ছিল কোচিনের 'Diocese'-এর হাতে এবং এদেশে প্রথম আসে Jesuit পাদ্রীরা। পরে কোচিনের এক বিশপ বাংলার সমস্ত গীর্জা আর তার সঙ্গে এখানে ধর্মপ্রচার করার অধিকার গোয়ার Augustinian-দের দিয়ে দেন। হুগলী পত্তনের সময় হুগলী এবং কাছাকাছি সমস্ত জায়গায় ধর্ম ব্যাপারে Augustinian-দের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এ সময় প্রথমে সাতগাঁ ও পরে হুগলীতে একটি 'vicarge' ছিল এবং Augustinian পাদ্রীরা একজন ধর্মাধ্যক্ষ বা 'vicar-general-এর অধীনে কাজ করত। ১৬০৬ সনে আবার বাংলাদেশের খৃষ্টানরা মায়লাপুরের 'Diocese'—এর এখতিয়ারে চলে যায়।

এইসব প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি থেকে পাদ্রীরা নানাদিকে বেরিয়ে পড়ত। বাংলার আনাচে-কানাচে যে সব পর্তুগীজরা থাকত, ঘুরে ঘুরে তাদের আত্মিক জীবনের তদারক করা আর সুবিধামত ধর্মপ্রচার—এই ছিল তাদের প্রধান কাজ। প্রয়োজন এবং সুযোগ অনুযায়ী তারা গীর্জা আর পাদ্রীদের থাকবার জন্য মঠ তৈরীর দিকেও নজর রাখত। ১৬১৬ সন নাগাদ ঢাকা, শ্রীপুর, হুগলী এবং সিপলীতে পাদ্রীরা ছোট বড় কয়েকটি ঘাঁটি করে বসে এবং বিশেষ করে যে সব জায়গায় অনেক ফিরিঙ্গী ব্যবসায়ীর ভীড় হত সেখানে নতুন নতুন গীর্জা হয়। সাধারণতঃ গীর্জার কাছেই থাকত পাদ্রীদের মঠ।

কি ভাবে তাদের খাওয়া-পরা চলত সে খবর Manrique এর ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায়। মুঘল সরকার মাঝে মাঝে তাদের জমিজমা টাকা পয়সা দিতে চাইত। কিন্তু অন্ততঃ Augustinian পাদ্রীরা 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' ভেবে এসব নিতে মোটেই রাজী ছিল না। মাধুকরী বৃত্তি আর নিজেদের বাজার দেওয়া ত্রৈমাসিক ভাতাই ছিল তাদের প্রধান সম্বল। তবে চতুর্বর্গ ফলের শুধু প্রথমটির উপরই এদের সবাইর নজর ছিল এমন নয়। অনেকেরই ব্যবসাবাণিজ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এবং এসব খুব কিছু গোপনে করাও তারা প্রয়োজন মনে করত না। পাদ্রীদের পক্ষে এজাতীয় কার্যকলাপ কাগজে কলমে নিষিদ্ধ থাকলেও, তাদের কর্তারা এ সম্বন্ধে কখনও কোনও উচ্চবাচ্য করতেন না। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে মুদ্রার ব্যবসা খুব লাভজনক ছিল। অনেকে বিশেষ বিশেষ ধরণের মুদ্রা জমিয়ে রাখত, এবং পরে সে সব ধরণের মুদ্রার কমতি দেখা গেলে উঁচু হারে বাটা নিয়ে বিক্রী করত। গোয়ার পাদ্রীরা গোপনে এই ব্যবসার পিছনে ছিল বলে জানা যায়। বাংলার ফিরিঙ্গী পাদ্রীরাও হয়ত এই লাভজনক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত।

তবে তাদের সবাই শুধু নিজের নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় থাকত,—একথা ভাবলে ভুল হবে। ধর্মজীবন সম্বন্ধেও তাদের অনেকেরই সত্যিকার আন্তরিক উৎসাহ ছিল। সুদূর গণ্ডগ্রামে তারাই গিয়ে স্বজাতীয় বাসিন্দাদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করত। বাংলার নানা পাণ্ডববর্জিত অংশে যে সব পর্তুগীজরা থাকত প্রায়ই তাদের ক্যাথলিক ধর্মজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ পেত। শ্রীপুর, বাকলা, মহিষাদল প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাদ্রীরা এই সব পথভ্রান্ত মেষশিশুদের পালে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করত এবং ক্যাথলিকদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করত। এমনি ভাবেই মেদিনীপুর পর্যটনের সময় Manrique-কে হিজলীর মস্নদ্-ই- আলার অধীনস্থ কাপ্তেন Salvador Dantes-এর মেয়ের নামকরণ করতে হয়। তখন কাছাকাছি আর যে সব পর্তুগীজ ছিল তারাও এসে তাঁর কাছে তাদের 'confession' করে যায়।

পাদ্রীদের কর্মজীবন শুধু পর্তুগীজদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের একটি প্রধান কাজ ছিল এদেশী লোকদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা। অবশ্য ধর্মপ্রচারের চেয়ে জোর করে ধর্মান্তরকরণেই তারা বেশী সাফল্যলাভ করেছিল। এ কাজটা তারা দাসব্যবসায়ী এবং হারমাদদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই করত। তবে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এইটেই তাদের ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্তব্য। ধর্মপ্রচারের জন্য অনেকেই বাংলা ভাষা শিখতেও চেষ্টা করত। Cabral কাজ চালাবার মত বাংলা জানতেন এবং Fray Manoel de la Concepcion বাংলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তমলুকে Manrique স্বয়ং বাংলায় ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক লোক হয়েছিল বলেও তিনি লিখেছেন। অবশ্য ভীড়ের কারণ সম্বন্ধে তিনি কোনও অনুসন্ধান করেন নি। শুধু দুঃখ করে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কারও হৃদয়ের পরিবর্তন হল না। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে যত্রতত্র 'বাবাম্বে' এবং লেখা চলে না এই ধরণের কিছুকিছু জোয়াল শব্দের ছড়াছড়ি দেখে বোঝা যায় যে বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠই ছিল। Pimenta-র চিঠি থেকে জানতে পারা যায়,—Domingo de Souza খৃষ্ট ধর্ম বিষয়ক একটি নিবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করেন। এ ধরণের অনুবাদ আরও হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। 'ব্রাহ্মণ-ক্যাথলিক সংবাদ' প্রকাশিত হওয়ার পর কথাটা অযৌক্তিক মনে হয় না।

পর্তুগীজ পাদ্রীরা বাংলাদেশেও লোকসেবার আদর্শ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছিল। হুগলীতে স্কুল করে তারা বাঙালী ছেলেদের লেখাপড়া শিখাত। তাদেরই উৎসাহে গোয়ার কলেজে কয়েকটি বাঙালী খৃষ্টান ছেলেকে লেখাপড়া করতে পাঠান হয়। ১৬২৫ সনের দুর্ভিক্ষের সময় Augustinian এবং Jesuit পাদ্রীরা দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য করে। সম্ভবতঃ এসব কারণেই শুধু পর্তুগীজ সমাজে নয়, দেশী লোকের কাছেও পাদ্রীদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। একাধিকবার হারমাদ ভেবে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর সত্যিকার পরিচয় জানতে পেরে Manrique-কে গ্রামবাসীরা 'ঠাকুর' বলে পরম আপ্যায়িত করে। পাদ্রীদের কৌমার্যব্রত-ও লোকের চক্ষে তাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল।

বাংলায় পর্তুগীজ বাণিজ্যের অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা : প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

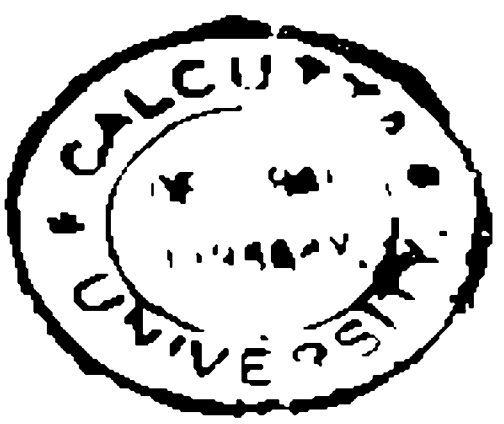

সম্পাদক :
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীসরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচীপত্র

বাংলার ইতিহাস—মধ্যযুগ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৭১

ইতিহাস-দর্শন

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু ৭৭

সপ্তদশ শতাব্দীর তিনখানি দলিল ও একটি গ্রামিক বিরোধের কাহিনী

শ্রীসুকুমার সেন ৮৭

শাম্বোপাখ্যান ও সূর্য্যপূজা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ৯১

সোভিয়েট অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন

শ্রীঅমান দত্ত ৯৭

ইতিহাসে মিথ্যা অপবাদ

শ্রীবিমলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১

তিব্বত

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ১২৩

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—দেড় টাকা, বার্ষিক পাঁচ টাকা

প্রকাশক :
শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩

ইতিহাস

প্রথম বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭　　[দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলার ইতিহাস—মধ্যযুগ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সাধারণতঃ বাংলায় মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী কালকে আমরা বলি মধ্যযুগ। এই যুগের শেষ কোথায় তাহা বলা কঠিন। তবে মোটামুটিভাবে পলাশীর যুদ্ধ হইতেই আধুনিক যুগের সূচনা হয় এইরূপ ধারণা একেবারে অসঙ্গত নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলার ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা হয় তখন এইরূপ বিভাগই স্থির করা হইয়াছিল। আশা ছিল এই দুই যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস অর্থাৎ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম শিল্প অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্য দুইটি বিভিন্ন খণ্ডে রচিত হইবে। প্রথম খণ্ডের রচনা পরিকল্পনা অনুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট তথ্য ইহার দ্বিতীয় ভাগে সঙ্কলিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ভাগের রচনা কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালী ঐতিহাসিককেই এই অসম্পূর্ণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

আমি নিজে এই ইতিহাসগ্রন্থ রচনার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে ইহার দোষগুণ বিচার করা আমার পক্ষে অশোভন ও অসঙ্গত। কিন্তু মোটামুটিভাবে অনেকেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতের অন্য কোন প্রদেশের অথবা বিশিষ্ট ভৌগোলিক অংশের এরূপ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই এবং এই ইতিহাস গ্রন্থ বাংলার অতীত কাহিনী সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে সচেতন করিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কি উপায়ে এই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করা যায় তাহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে এই প্রকার গ্রন্থ সংকলনের কথা উঠিলেই কি প্রকারে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাইবে তাহাই দুর্ভাবনার কারণ হইত। কিন্তু প্রথম খণ্ড প্রকাশের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে এই দুর্ভাবনার কোন কারণ নাই। কারণ এই গ্রন্থ প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করিয়া সমস্ত লেখকদিগকে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে এবং টাকার দিক দিয়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাভ ছাড়া কোন লোকসান হয় নাই। ইহার ফলে এই গ্রন্থের প্রকাশক নিজের খরচেই অবশিষ্ট খণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রধান বাধা লেখকের অভাব। বাংলার মধ্যযুগের সমাজ ধর্ম্ম অর্থনীতি শিল্প প্রভৃতির বিশিষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। এই খণ্ডের পরিকল্পনার সময় লেখক নির্ব্বাচন করা খুবই আয়াসসাধ্য হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই সমুদয় অধ্যায়ের লেখকের অভাবেই দ্বিতীয় ভাগ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ করিতে হইল। নচেৎ প্রথমে ঠিক ছিল যে প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগও এক খণ্ডেই প্রকাশিত হইবে।

বাংলা দেশের অনেক যুবকই ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য উৎসাহশীল। কিন্তু অধিকাংশই গতানুগতিক ভাবে একই বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। বস্তুত প্রাচীন যুগের ইতিহাস চর্চ্চায় যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনাকারীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। অল্পকাল অন্যান্য বিভাগেও যেমন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর ক্রম স্থির করা হয় ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধেও তাহাই করা উচিত। যাহাতে বাংলার ইতিহাসের সকল দিকেই বিশেষ ভাবে গবেষণার ব্যবস্থা হয় এবং যে সমুদয় বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত কম সেই দিকে যুবক গবেষণাকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে হওয়া উচিত। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে এই প্রকার অনুষ্ঠানের সার্থকতা প্রমাণিত হইবে।

যে দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর (১২৬০–১৭৫৭) আমরা মধ্যযুগ নামে অভিহিত করিয়াছি বাংলার ইতিহাসে তাহার মূল্য কি এবং কতটুকু প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। কিন্তু ইহার আলোচনার পূর্ব্বে এই ইতিহাস রচনার প্রণালী সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

এ কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন যে কেবল রাজা ও রাজবংশের কাহিনী ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে—ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, চিন্তা, সংস্কার প্রভৃতি বর্ণনা করাও তাহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে এই সমুদয় বিষয়ে সেই দেশে যেরূপ ক্রমশ বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি

বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। অন্যথা এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হয় এবং ইতিহাসের সাহায্যে আমরা ঐ দেশের সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভের আশা দাবী করিতে পারি তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় না। কিন্তু ইতিহাসের এই উচ্চ আদর্শ সকল সময়ে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না। কারণ ইতিহাস বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এইরূপ ঘটনার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সকল সময় সহজসাধ্য নহে। প্রাচীন যুগের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য—কারণ সুদূর অতীতের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বভাবতই কম হইবার সম্ভাবনা।

ইট কাঠ লোহা প্রভৃতি সম্পূর্ণ উপকরণ সংগ্রহ না করিতে পারিলে যেমন কল্পনানুযায়ী আদর্শ গৃহ নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না, প্রয়োজনীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণ সংগৃহীত না হইলে তেমনি আদর্শ অথবা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যায় না। ঘটনাবহুল তথ্যই ইতিহাসের প্রাণ এবং এই ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য ও পর্য্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। প্রচুর পরিমাণে ইট থাকিলেও লোহা কাঠ চূণ ও অন্যান্য মসলা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে গৃহ নির্ম্মিত হয় না। আবার এই সব উপকরণ যদি মজবুত না হয় তবে সে গৃহ বাসোপযোগী হয় না। তেমনি ঘটনা ও তথ্য যে পরিমাণে নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে ইতিহাসের গঠনকার্য্যও সেই পরিমাণে পূর্ণাঙ্গ ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইবে। যে পরিমাণে এই উপাদানের অভাব হইবে, সেই পরিমাণে এই গৃহ অসম্পূর্ণ ও ইহার বনিয়াদ কাঁচা হইবে। এই অভাব খুব বেশী হইলে বনিয়াদের উপর আর কিছুই নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে না। বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

বাংলা দেশের হিন্দুযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতই অনেক কিছু জানিতে চাই। এ যাবৎ এ বিষয়ে যে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান। শিল্প সম্বন্ধেও কিছু উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের পূর্ব্বোক্ত অন্য বিভাগগুলি সম্বন্ধে যে সমুদয় উপাদান আমাদের হাতে আছে তাহা এতই সামান্য যে তাহার সাহায্যে এই সমুদয় অর্থাৎ ধর্ম্ম, সমাজ ও সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা করা সম্ভব নহে। অন্তত আমার এই বিশ্বাস এবং এই জন্যই বাংলার ইতিহাসের প্রথম ভাগে এই সমুদয় বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অপর্য্যাপ্ত জানিয়াও ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই। কেবল খড় দিয়া যে ইট তৈয়ারী করা যায় না বাংলার ইতিহাসের এই সমুদয় অংশ সম্পাদনা করার সময় প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি।

হয়ত কেহ কেহ আমার এই যুক্তি স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা বলিবেন পুরাতন ঘটনা ও তথ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনা ও অনুমান যোগ করিয়া পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালীর ইতিহাস সৃষ্টি করা যায়। তাঁহাদের মতে অন্যান্য দেশে যে ভাবে

মনুষ্য সমাজের উদ্বর্তন ও বিবর্তন এবং ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে বাংলা দেশের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য এই স্বতঃসিদ্ধকে ভিত্তি করিয়া এই শ্রেণীর ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর। আমার মতে এই ধারণা ঠিক নহে, এবং যদি ঠিক হয় তবে বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার বিশেষ কোন অর্থ বা মূল্য থাকে না। কারণ তাহা হইলে ইতিহাসের সাধারণ প্রণালী প্রয়োগ করিলেই প্রাচীন বাঙ্গালীর তথা অন্যান্য জাতির সম্বন্ধে সকল তথ্য জানা যাইতে পারে। তা ছাড়া সামাজিক বিবর্তনের প্রণালী এবং ইতিহাসের অব্যাহত ধারা সম্বন্ধেও মতভেদের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে যাহার যেরূপ ধারণা তিনি বাংলা দেশের ইতিহাসও তদনুযায়ী রচনা করিবেন। ফলে ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার হাতে বাংলা দেশের অথবা বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে ইতিহাস রচনায় কল্পনা বা অনুমানের স্থান একেবারেই নাই। কিন্তু বাস্তব ঘটনার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। কতটুকু বাস্তবের সহিত কতটুকু কল্পনার সংমিশ্রণ চলিতে পারে, এই মিশ্রণের রীতি বা পদ্ধতি কি এই সব সম্বন্ধে কোনও সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভবপর নহে। নিজ নিজ অনুভূতি ও বিচারশক্তির দ্বারা এই পরিমাণ স্থির করিতে হয় এবং ইহার উপরই ঐতিহাসিকের (ও ইতিহাসের) উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৃণ্ময় মূর্ত্তির কাঠামো অর্থাৎ খড় ও মাটির অংশ বাস্তব এবং উপরের রং কল্পনা বা অনুমানের প্রতীক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তি বিশেষের মূর্ত্তির অবয়ব ও গঠন-প্রণালী মূলের অনুযায়ী হওয়া চাই—তবে তাহার পার্শ্বিক-পার্শ্বিকের সমাবেশ এবং রং ফলান প্রভৃতি ব্যাপারে শিল্পীর যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তিটি এমন হওয়া চাই যাহাতে অনায়াসে বিদ্যাসাগর বলিয়া চেনা যায়, তবে তাঁহার বসিবার আসন ও ভঙ্গী, বেশভূষা চুলের বিন্যাস এগুলির অবশ্য বদল হইতে পারে—যদিও তাঁহার পায়ে তালতলার চটিজুতা গায়ে মোটা থানের চাদর এবং মাথায় খাটো চুল আমাদের এতই সুপরিচিত যে ইহার অন্যথা হইলে মূর্ত্তিটি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যদি কেহ এমন একটি মূর্ত্তি রচনা করেন যাহা নিছক মানুষের মূর্ত্তি হিসাবে দেখিতে খুবই সুন্দর অথচ বিদ্যাসাগরের সহিত তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না, তাহা হইলে আমরা তাহার শিল্পের প্রশংসা করিতে পারি কিন্তু মূর্ত্তিটিকে বিদ্যাসাগরের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিদ্যাসাগরকে না দেখিলেও তাঁহার চেহারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আছে বলিয়াই আমরা এক্ষেত্রে বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি। কিন্তু যেখানে এইরূপ ধারণার অভাব সেখানে বাস্তব ও কল্পনার প্রভেদ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেহ যদি 'একটি সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়া বলেন, এটি মহাকবি কালিদাসের মূর্ত্তি, তবে অনেকেই হয়ত খুসী হইয়া বলিবেন যে এতদিনে দেশের

একটা বড় অভাব দূর হইল, আমরা মহাকবিকে প্রত্যক্ষ ধারণা করার সুযোগ পাইলাম,—এত ঐতিহাসিক সমালোচক প্রভৃতি যাহা করিতে পারেন নাই, ইনি তাহা করিলেন। এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসামুখর জনতার মধ্য হইতে যদি কেহ নিতান্ত মুখ্যভাবে প্রশ্ন করে—যে ইনিই যে মহাকবি কালিদাস তাহার প্রমাণ কি, তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী কেহ হয়ত বলিবে, দেখিতেছ না খাঁটি প্রাচীন ভারতীয় পরিচ্ছদ ও একেবারে কবির ভাবব্যঞ্জক মূর্তি? পূর্বোক্ত লোকটি যদি আবার সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করে যে ইহাকে ভবভূতি অথবা অশ্বঘোষ বলিতে বাধা কি, তবে হয়ত তাহার উত্তর মিলিবে না—জনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ধ্বনির মধ্যে তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ কেহ শুনিতে পাইবে না। কিন্তু 'নিরবধি' কালের দরবারে এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর একদিন মিলিবেই। তখন লোকে এই ভাবিয়া অবাক হইবে যে, এই মূর্তিটিকেই কালিদাস বলিয়া একদিন লোকে গ্রহণ করিয়াছিল।

যেমন মূর্তিটি সুন্দর হইলেই চলিবে না, কালিদাসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত ইহার মোটামুটি সাদৃশ্য আছে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে—তেমনি পূর্ণাঙ্গ ও সুপাঠ্য ইতিহাস হইলেও তাহাকে বাঙ্গালীর ইতিহাস বলা চলে না যতদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন বাংলার ঘটনা ও তথ্যের সহিত ইহার বিশেষ বিশেষ মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন না করা যায়। কিন্তু কালিদাসের মূর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না,—কেবল এইটুকু অনুমান করিতে পারি যে সাধারণ মানুষের মত তাঁহার দুই হাত দুই পা ও চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি ছিল। এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া যেমন কালিদাসের মূর্তি গড়া যায় না প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি তাহার উপর নির্ভর করিয়াও তেমনি বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখা যায় না। প্রাচীন ভারতের বেশভূষায় সজ্জিত করিলেও যেমন এই কবির মূর্তিটি কালিদাস ভবভূতি, মাঘ অথবা যে কেহ বলিয়া গ্রহণ করিলে অসঙ্গত হয় না, কেবল প্রাচীন ভারতের পরিচিত তথ্যের পটভূমিতে ইতিহাস রচনা করিলেও তাহা বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িষ্যা প্রভৃতি যে কোন ইতিহাস বলিয়া চালান যায়। মূর্তির নীচে কালিদাস লেখা থাকিলেই তাহা কালিদাসের মূর্তি হয় না, বইয়ের মলাটের উপর বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখা থাকিলেই তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাস হয় না।

অতিশয়োক্তি দ্বারা কোন মত বা নীতির যথার্থ স্বরূপ অনেক সময় পরকে বুঝান অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এই জন্যই আমি কালিদাসের মূর্তির অবতারণা করিয়াছি। নচেৎ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থমাত্রেই সর্ব্বথা ইহার সহিত তুলনীয়। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে এইরূপ গ্রন্থের যে অংশ বাস্তবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কেবল তাহাই ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভের যোগ্য, অপর যে অংশ বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার চিত্র তাহার এই রূপ ভিত্তি না থাকায় তাহা ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

হলিখিত হইলে এইরূপ গ্রন্থ পাঠে বাঙালীর তৃপ্তি অথবা আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে, সাহিত্য হিসাবে ইহা যথেষ্ট উপাদেয় হইতে পারে, ইহাতে অনেক বিষয়ে নূতন নূতন চিন্তার নির্দ্দেশ থাকিতে পারে, এবং ইহার ফলে বাঙালীর দৃষ্টি অতীতের অনেক রহস্যের সন্ধান পাইতে পারে—কিন্তু তথাপি ইহা বাঙালীর ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এবং ইহার অনুসৃত রীতি ইতিহাস রচনার আদর্শ প্রণালী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সুতরাং আমার মতে বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে, বাংলার ইতিহাসের প্রথমভাগে যে নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমভাগের তুলনায় এই দ্বিতীয়ভাগে ইতিহাসের উপকরণ অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কুলপঞ্জিকা ও রঘুনন্দন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে এই যুগের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীন যুগে তাহা দুর্লভ। বৈদেশিক বিবরণ ও সমসাময়িক গ্রন্থে সাধারণের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। ইহার যথাযথ আলোচনা এখনও হয় নাই। বস্তুতঃ এই যুগে বাঙালীর রচিত বহু গ্রন্থ আছে যাহা হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে দায়ভাগের মতবাদ, চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্ম্মপ্রণালী, নব্যন্যায়, কৌলীন্য প্রথা, নূতন নূতন পূজা-পার্ব্বণ, আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে প্রাচীন ধারার রক্ষা প্রভৃতি বাংলার বহু বৈশিষ্ট্য এই যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই যুগেই বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত সৃষ্টি হইয়াছে। আশা করা যায় যে এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সমুদয় বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত ধারণা করিতে পারিব—অন্তত এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইবে।

ইহাতে দুই দিক দিয়া আমাদের লাভ হইবে। প্রথমতঃ বাঙালীর বর্ত্তমান যুগ যে সমুদয় প্রভাবের ফলে গঠিত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইব, এবং ইহা দ্বারা বাঙালীর সামাজিক গতি ও সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত হইবে। আবার মধ্যযুগের ইতিহাস যেমন একদিকে বর্ত্তমান যুগের পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি আর এক দিকে ইহা প্রাচীন যুগেরই বিবর্ত্তনের ফল। সুতরাং মধ্যযুগের সামাজিক ও জীবনযাত্রার ইতিহাস হয়ত প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে কতক সহায়তা করিতে পারে। এই হিসাবে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস বিশেষভাবে মূল্যবান।

এই ইতিহাস প্রকৃতভাবে রচনা করিতে হইলে প্রথমেই সুনির্দ্দিষ্টভাবে ও নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে উপকরণ সংগ্রহের কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন। এই যুগের ইতিহাসের আধারস্বরূপ যে সমুদয় গ্রন্থ ও অন্যান্য দলিলপত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে সর্ব্বপ্রথমে তাহার একটি শ্রেণীবদ্ধ সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

তারপর কয়েকজন উৎসাহশীল ঐতিহাসিকের মধ্যে যদি এই সমুদয় গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করার ভার বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় তবে এই ইতিহাসের মাল মসলা সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপকরণ পরিমাণে কম হইলেও উদ্যোগী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশী থাকায় এবং এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বহুকাল যাবত অনেক আলোচনা হওয়ায় বাংলার ইতিহাসের প্রথমভাগের রচনা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার প্রধান বাধা এই যে উপকরণ বেশী, কর্মীর সংখ্যা অনেক কম এবং এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আলোচনাও খুব বেশী হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছে তাহাতেও অধিকাংশ স্থলেই কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করা হয় নাই। এই জন্যই এই ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা প্রয়োজন। সুতরাং বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ এই কার্য্যের ভার লইলে ইহার যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া হয় ও কাজটি সুসম্পন্ন হইবার আশা করা যায়।

ইতিহাস-দর্শন

(আদর্শবাদী ও প্রস্তাবনাধী)

শ্রীজতীন্দ্রনাথ বসু

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের কয়েকজন প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিলেন। সোবিয়েৎ রুশ থেকে এসেছিলেন তিনজন, তাঁদের নেতা ছিলেন একজন ইতিহাসের অধ্যাপক। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর—কারণ ইউরোপের কোন দেশ থেকে বা ভারতবর্ষের কোন প্রান্ত থেকে এ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। সোবিয়েৎ ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছে এবং বিজ্ঞান-সভায় ঐতিহাসিককে প্রাধান্য দিতেও কার্পণ্য করে নি।

সমাজের গতিরেখাকে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে চিহ্নিত করা যায়, এ দাবী বিশ্বের বিদগ্ধসমাজে আজও স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু হয় নি বলেই দাবীটা উড়িয়ে দেবার নয়। এ বিতর্ক বহুদিনের। ইতিহাসকে বিজ্ঞানের রূপ দেবার চেষ্টা চলে আসছে বহুদিন থেকে।

১। আদর্শবাদী

তা বলে আদিকাল থেকে নয়। আদিতে ইতিকথন ছিল হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক উৎসারণ। নিরপেক্ষ বিচার ও নির্মোহ জিজ্ঞাসার বালাই ছিল না। মানুষ খেয়ালখুশীতে মনের উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়েছে আদিম পাহাড়ের গায় কিংবা গাছের বাকলে, কথক ও গায়ক বেঁধেছে কথা ও গান। মানুষের আনন্দ-বেদনাপ্লুত মুহূর্তগুলিকে ছন্দ ও সুরের বাঁধনে তারা ধরে রাখতে চেয়েছে। কীর্তিকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে অমরের অমৃতপ্রলেপে। তাই তারা সত্যের ওপর মিথ্যার রঙিন আস্তরণ বুলিয়ে, লৌকিককে অলৌকিক আভায় আলোকিত করে রচনা করেছে লোকগাথা, মহাকাব্য, পুরাণ।

এ বৃত্তি বিজ্ঞানীর নয়, শিল্পীর। কথাশিল্পী তার কথকতার উপাদান সংগ্রহ করেছে জীবন থেকে। জীবনকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা শিল্পীর ধর্ম নয়, জীবনের আত্মিক আবেদনকে ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর ধর্ম। কাজেই কথা যদি কাহিনীর রূপ নেয় তাতে শিল্পী ধর্মভ্রষ্ট হয় না, তার তাৎপর্য অন্তরে পৌঁছলেই হলো। মহৎকে, সুন্দরকে বিবরণ দিয়ে বোঝা যায় না, কীর্তন করে উপলব্ধি করা যায়। তাই আদি ইতিহাসে ছিল উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, সাহিত্যের প্রাণঢালা রসায়ন। ইতিহাস ছিল শিল্পের আংগিক আর ঐতিহাসিক ছিলেন রসস্রষ্টা।

আদিপুরুষদের যেটা ছিল স্বভাব-বৃত্তি পরবর্তী যুগে সেটাই একটা সজ্ঞান প্রয়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হেরোডোটাস,—যিনি পূর্বাবৃত্তির জনক বলে বিখ্যাত, তিনি এ বিদ্যাকে সাহিত্যের অংগ বলে ধরে নিয়েছিলেন। হোমের আদিকথা লিখবার সময়ে লিভির সামনে ছিল সাহিত্যের মাপকাঠি। পরবর্তী কালের অনেক ঐতিহাসিকের মধ্যেও শিল্পপ্রধান রচনাশৈলী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—যেমন কার্লাইল, মেকলে, ট্রেভেলিয়ান।

সাহিত্যের অনুগামী ইতিহাস স্বভাবতই কতকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মনের ভাব-উচ্ছ্বাস মহত্ত ও বীরকে অবলম্বন করে উৎসারিত হয়। ব্যক্তিত্বকে ও ব্যক্তির মূলগত আদর্শকে শিল্পরসে অভিষেক করা হয় ঐতিহাসিকের ধর্ম। বিশেষ করে সমাজ যখন ক্লেদ ও ক্লীবতার ভারে অবসন্ন হয়ে পড়ে, সমকালে যখন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার মত কোন উপাদান মেলে না, তখন দৃষ্টান্ত ও বিষয়ের জন্তে ইতিহাসশিল্পীকে অতীতের মুখাপেক্ষী হতে হয়। যেমন হতে হয়েছিল কবি শিলারকে। গ্যয়টে তাঁর বেদনা বুঝতে পেরে বলেছিলেন—"আমাদের যুগটা এমনই মন্দ যে কবি মানুষের মধ্যে এমন কোন বৃত্তি খুঁজে পান না যা তাঁকে আশান্বিত করতে পারে।" প্রাচীন রোমের ঐতিহাসিক লিভিয়াসের কাছে মাতৃক ইতিহাস ছিল রাষ্ট্রশাসনের পাঠশালা, আর ইতিহাস ছিল নিয়তির আঘাত ধীরভাবে সহ

করবার বিরাট শিক্ষাশালা। ট্যাসিটাস থেকে লর্ড একটন পর্যন্ত বহু লেখক ইতিহাসের এই আদর্শধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মধ্যযুগের পাদরীরা অতীত ও সমকালীন ঘটনাবলিকে খৃষ্টান আদর্শে অনুরঞ্জিত করে লিপিবদ্ধ করতেন—ঘটনাকে শাস্ত্রীয় ছাঁচে ঢেলে সাজা হোত। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদীরা এক অবার্থ প্রগতির নিয়মে বিশ্বাস করতেন। সমাজ-বিবর্তনে যুক্তির প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী, মানুষের বিচারশক্তি সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতির পথে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্য, স্বাধীনতা, ন্যায় ও নীতিধর্ম। কারণ এদের প্রভাবেই নিয়ত উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন সমাজ, শাসন ও সংস্কৃতি। এই সমস্ত আদর্শবাদীকে প্যারিটো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে আঘাত করেছেন,—এদের বিশ্বাসগুলিকে সমাজতান্ত্রিক না বলে ধর্মান্ধ বললেই ঠিক হয়। কিন্তু আদর্শবাদী লক্ষ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের দল বাতিল হন নি, আদর্শ ও লক্ষ্যের রূপান্তর হয়েছে মাত্র।

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে ইতিহাস ছিল শিল্পচর্চা। উনিশ শতকে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের হাতে ইতিহাস হোল আত্মিক বিজ্ঞানের (geisteswissenschaften) সমপর্যায়ভুক্ত। আত্মার মুক্তি ও বিকাশের জন্যে ইতিহাসশাস্ত্রের প্রয়োজন, নিছক জ্ঞানের জন্য নয়। জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানচর্চা একটা বুদ্ধির খেলা বা বিলাসিতা—এ হোল গ্যয়টের মত। "যা আমার কর্মশক্তিকে উৎসাহিত না করে শুধু কতক উপদেশ দেয় সে সব কথায় আমার শ্রদ্ধা নেই।" নীট্‌শের উদ্দেশ্য-নিষ্ঠা আরও স্পষ্টবাদী। একটা ঐতিহাসিক তথ্য যখন শুষ্কমাত্র একটা জ্ঞানের বিষয়ে পর্যবসিত হোল তখন জাতার কাছে তথ্যটা একেবারে মৃত। এই মৃতসাধনা বা অতীতের রোমন্থন জীবন্তকে পংগু করে শেষে ধ্বংস করে ফেলে—এমনি করে মানুষ, জাতি বা সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। এই স্বেচ্ছালব্ধ সঞ্চীয়মান অতীতের বোঝা মানুষকে পিষে মেরে ফেলছে। পশুদের সৌভাগ্য যে এই জগদ্দল পাষাণ তাদের বইতে হয় না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা ও নির্দেশ নেবার আছে কি? বরং ইতিহাস রচিত হবে একটা প্রচণ্ড প্রভাবের নির্দেশে, ইতিহাস অনুগামী হবে একটা জীবনদায়িনী শক্তির, একটা প্রাণবন্ত সংস্কৃতির। তবেই না ঐতিহাসিক পাঠ হবে সৃষ্টিধর্মী, সার্থক। সুতরাং "ইতিহাস যেখানে জীবনের তাঁবেদার সেখানে সে এক অনৈতিহাসিক শক্তির তাঁবেদার। কাজেই ইতিহাস কখনো গণিতের মত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পর্যবসিত হতে পারে না।"

নীট্‌শের ইতিহাসদৃষ্টি রূপ গ্রহণ করল ট্রাইট্‌শে'র কলমে। জার্মানীর ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হোল শক্তিবাদী, প্রয়োজনধর্মী পুরাদর্শন।

গ্রীক গাথাকারদের কাছে ইতিহাস ছিল শিল্পচর্চা। নীট্‌শে ও ট্রাইট্‌শের হাতে ইতিহাস হোল প্রয়োজনধর্মী—শক্তি সাধনার উপাদান। শুধু এঁরাই যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি অস্বীকার করেছেন তা নয়। আর একদল

যারা লক্ষ্যমুক্ত সত্যের অবিকৃত প্রকাশে বিশ্বাসী, তাঁরাও ইতিহাসের কোন বৈজ্ঞানিক রূপ স্বীকার করেন নি। বিজ্ঞানের কাজ সঠিক ও বিশ্বজনীন সত্য নিয়ে,—বিজ্ঞানের দুনিয়া হোল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অনন্ত বাস্তব সত্তা। আর ইতিহাসের কারবার ব্যষ্টি ও বিশেষ ঘটনাকে নিয়ে, তার বিশ্ব. কালের আবর্তে চিরচঞ্চল। প্লেটো তাই বিশ্বাস করতেন, যে শাস্ত্র যে পরিমাণে দৃশ্যমান দুনিয়াকে আশ্রয় করে থাকে সে শাস্ত্র সে পরিমাণে অবৈজ্ঞানিক। আর যে শাস্ত্র পরিবর্তনশীল ঘটনার ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে অনন্ত ও নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান করে সে শাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইতিহাসের কাছে চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। তার সাধনা ক্ষণিকের বিবরণে, ঘটনার সমাবেশে বিবর্তনের রূপ মেলে ধরা। সেখানে না আছে বিজ্ঞানের কড়াকড়ি, না আছে আদর্শের পূজা, না আছে শিল্পীর উচ্ছ্বাস। রেনেসাঁস যুগের বিদগ্ধ ও বিজ্ঞানীরা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের এই প্রকার বিপরীত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে পরবর্তীদের প্রভাবিত করে গেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে ইতিহাস কতক আকস্মিক ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা—তার প্রত্যেকটী ঘটনা এক একটী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, প্রত্যেকটী ঘটনা মানুষের স্বাধীন কার্যশক্তি দ্বারা রচিত—সুতরাং বিজ্ঞান-জগতে ইতিহাসের স্থান নেই। কিছুকাল আগে এডোয়ার্ড মেয়ার তাঁর History of Antiquitiesএর মুখবন্ধে (১৯১০) এই মত ঘোষণা করেছেন—"ইদানীং ইতিহাসের সত্তাকে বদল করে এর সামনে উচ্চতর আদর্শ তুলে ধরবার যে হেওয়াজ চলেছে তাতে ঐতিহাসিক বিচলিত হবেন না। ইতিহাসের ঘটনা যা আছে তাই এবং চিরকাল তেমনই থাকবে। ঐতিহাসিকের কাজ ঘটনার অবিকৃত প্রকাশ, তা থেকে কোন নীতি বা মতবাদ খুঁজে বার করা নয়। এতে ইতিহাসের দাম বাড়লো না কমলো তা তার দেখবার প্রয়োজন নেই।"

লক্ষ্যহীন বুদ্ধিবিলাসী নিজ খেয়ালে কতক অসম্বন্ধ ঘটনাকে যোড়া দিয়ে এক বিবরণী রচনা করছেন। কিংবা শক্তিসাধক জাতির বা যুগের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে সত্যকে বিকৃত বা রঞ্জিত করে এক কারণবারি পরিবেশন করছেন। এরই নাম কি ইতিহাস?

ঘটনাপরায়ণ ও প্রয়োজনধর্মী ইতিহাসকার সমাজের গতিধারার দিকে অন্ধ হয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন মুষ্টিমেয় অভিজাতের ও চমকপ্রদ কোলাহলের ওপর। কোথায় সেনেটররা পরিষদকক্ষে কি মন্ত্রণা করলেন, রাজসভায় দার্ঘলোভীয় দল কোন কূটচক্রের জাল বুনছে, কোন রণক্ষেত্রে হতভাগ্য সৈনিকের দল তোপের মুখে উৎসন্ন হোল, ওয়াটার্লুর জয়, ভিয়েনার সন্ধি, ইসাবেলার বিবাহ, বিসমার্কের কূটনীতি,—এই সব হয়েছে তাঁদের উপাদান। এর বাইরে যে বিরাট সমাজ, চির-উত্থান-পতনশীল জনসমুদ্র, তা রয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। মানুষের জীবিকা

ও জীবনযানের কথা, ভৌগোলিক বিন্যাস ও জলবায়ুর প্রভাব, প্রকৃতির সংগে মানুষের সংগ্রাম, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, যন্ত্রের উদ্ভাবন, সামাজিক জীবনযাত্রা—এমন শত শত প্রভাবে স্পন্দমান যে মৌথ জীবন তার ওপর এঁরা আলোকপাত করেন নি। মিশরের মাস্তাবাহ, বোগাজ্ কই'র শিলাফলকে, সাঁচি ও বারহুতের স্তূপে, জাতকের লোকগাথায়, আইসল্যাণ্ডের সাগায় যে জীবনচিত্র অংকিত হয়ে আছে তার উদ্‌ঘাটন কি আজও ভাল করে হয়েছে?

যখনই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাকে অতিক্রম করে সমাজের অভ্যন্তরে জনতার জীবনযাত্রার ওপর দৃষ্টিনিবেশ করেছেন তখনই ইতিহাস নিছক অতীতাবৃত্তি থেকে সমাজ-বিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে,—তখন তাকে কতক আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ বলে মনে হয় নি, তার মধ্যে যোগসূত্র বা নিয়ম খুঁজে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ইতিহাস বিজ্ঞানের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। এদিকে বিজ্ঞান সম্বন্ধেও প্লেটো বা গ্রীকরা যে ধারণা পোষণ করতেন তা আজ অচল। আধুনিক বিজ্ঞান কোন নির্বিকল্প সত্যের ধ্যান করে না। তার অনুসন্ধান চলেছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। সে দেখছে যে সত্তা চির-পরিবর্তনশীল। শুধু জীব ও উদ্ভিদ কেন, গ্রহনক্ষত্র, নদীপর্বত কিছুই স্থায়ী ও স্থানু নয়। বিবর্তমান বিশ্বের অভ্যন্তরে আজ জীববিজ্ঞান, নভোবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান এমন কি পদার্থবিজ্ঞানও গবেষণা করছে প্রাচীন ও নবীনের সম্বন্ধ নিয়ে, আবিষ্কার করছে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খলা। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাঠ এখন ক্রমবিকাশের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজ বা প্রকৃতির প্রতিটী সত্যকে আজ উদ্ধার করতে হয় কালের নিরিখে।

২। প্রজ্ঞানবাদী

ইতিমধ্যে হেগেল এলেন তাঁর যুগান্তকারী ভাবোদর্শন নিয়ে, নির্ধারণ করলেন ইতিহাসের নূতন সংজ্ঞা, নূতন বিচার-প্রণালী। সুদূর অতীত থেকে মানুষের পদচিহ্ন অনুসরণ করে নির্ণয় হোল এক সুস্পষ্ট পথরেখা, এক সার্বভৌম, সর্বকালীন গতিভংগী। জীবনের প্রত্যুষ থেকে মৌথ মানুষের জীবনযাত্রায় ফুটে উঠেছে বিশ্ববিবর্তনের অটুট রীতি—নির্বিকল্প প্রজ্ঞার সংঘাতশীল অভিযান। বিশ্বসত্তা প্রজ্ঞা বস্তু ও ঘটনার মধ্যে নিয়ত সংঘাত সৃষ্টি করছে, সংঘাতের মধ্যে নিজ মুক্তির পথ রচনা করছে। অধোক্ষিপ্ত ত্রয়ংগুমৌলির শীর্ষচূড়ায় সমাধানের পর সমাধানে হয় প্রজ্ঞার ক্রম-উন্মেষ। দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রজ্ঞার আত্মপ্রকাশ—বিশ্বপ্রগতির তথা ইতিহাসের এইটেই মূল সূত্র।

সমাজে অথবা প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে অখণ্ড সত্তা বা নির্বিশেষ বস্তুর সন্ধান মেলে তা হোল প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। গণিতের নিয়মে, ন্যায়শাস্ত্রে অধিষ্ঠিত এই পরম প্রজ্ঞা এক স্থাণু স্থির সত্তা নয়—এ এক ধারাবাহিক চকল সত্তা। দ্বন্দ্ব-

সমন্বয় প্রণালীতে অবিচ্ছিন্ন এর গতি। যুক্তি বা বুদ্ধি যখন সত্যকে জানতে চায় সে প্রথমে উপস্থিত করে এক প্রস্তাব। এ প্রস্তাব খণ্ডন করবার জন্যে তার দোষত্রুটী আশ্রয় করে সে উত্থাপন করে এক বিপরীত প্রস্তাব। দুই প্রস্তাবের সমন্বয়ে সে আসে সমাধানে। কিন্তু সমাধান স্থায়ী হয় না,—তার হেত্বাভাস থেকে আবার উত্থিত হয় নতুন প্রতিবাদ এবং নতুন সমাধান। এমনি করে কমবেশায় সক্রিয় বুদ্ধি ক্রমশ উচ্চতর মীমাংসায় উপনীত হয়। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বিশ্বের মূল সত্তা, তাই বিশ্ববিবর্তনও এই নিয়মের অনুগত। বিরোধী শক্তির সমন্বয়ে প্রকৃতি গতিশীল হয়, সমাজের প্রতি পদক্ষেপে আছে দ্বন্দ্ব ও মীমাংসার চিহ্ন। সুতরাং বিশ্ববিবর্তন ও সমাজপ্রগতির অবধারিত নিয়মরূপে প্রতিভাত হয় মূল সত্তা প্রজ্ঞার ধার্মিক অভিব্যক্তি।

অতীতের ঘটনা পরম্পরার দার্শনিক বিচার করলে দেখা যায় যে তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় সমর্থন করছে। ইতিহাস হচ্ছে থিয়োডিসীআ,—ঐশী এষণার পরিপূরণ। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হোল পরম প্রজ্ঞা—তা পূর্ণ হয় ঘটনার সূত্র ধরে প্রজ্ঞার উন্মীলনে। সোজা কথায় বলতে গেলে—ইতিহাসে দেখা যায় একটা যুক্তিসংগত ধারাবাহিকতা এবং সমাজজীবনে বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি বা যুক্তি একাধারে পরম সত্তা এবং পরম শক্তি—সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিয়ে যা হয় তাই। একদিকে এ বিশ্বের মূল বস্তু বা উপাদান, অন্যদিকে এ উপাদানের নির্মাণশিল্পী। একদিকে এ চিন্তা বা লক্ষ্য, অন্যদিকে এ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার আবেগ বা প্রেরণা। লক্ষ্য ও প্রেরণা, ভাব ও আবেগ, আইডিয়া ও প্যাসন, উভয়ের সংঘাতে প্রজ্ঞা ক্রমশ উন্মীলিত হচ্ছে, আর রচনা হচ্ছে ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা বা কোন একটি সুচিন্তিত লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করতে হলে নিছক গবেষণা বা তর্ক দিয়ে তা হয় না—তার জন্যে মানুষের আবেগ, অনুভূতি, স্বার্থবোধকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যুক্তি বা বুদ্ধি আপন কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে সক্রিয় প্রতিকূল শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। আবেগ ও স্বার্থের বশীভূত হলে মানুষের যৌথবল কেন্দ্রীভূত হয় এক লক্ষ্যে, দুরারম্ভ বিঘ্ন উত্তরণ ক'রে ইতিহাসের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলে। তাই ইতিহাসের পাতায় পাতায়, প্রতি যুগ-সন্ধিক্ষণে মানুষের ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করে এসেছে স্বার্থ ও আবেগের তুমুল দুর্যোগ। কিন্তু দুর্যোগের অবসানে মুক্ত সৌরালোকের মত বুদ্ধির দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণে দেখা যায় বিপ্লবের রুদ্র, রূঢ় মূর্তি, আর বিশ্ববিবর্তনের চলমান পটভূমিকায় দেখা যায় যে বিপ্লব মুক্তির বাহক।

লক্ষ্য-বস্তু ও আবেগ-শক্তির সমন্বয় হয় প্রজ্ঞার মুক্তিতে, মুক্তি রূপ পরিগ্রহ করে রাষ্ট্রের কাঠামোয়, নীতিধর্মের সংযমে মানবস্বাধীনতার বিকাশে। রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই মানুষ মুক্তিলাভ করে। কারণ সার্বিক লক্ষ্য ও ব্যক্তির ইচ্ছা উভয়ের

সমন্বয়েই মুক্তি, এবং এ সমন্বয় সাধিত হয় রাষ্ট্রে। একটা নীতিধর্মকে স্বীকার করে নিলে তবে রাষ্ট্রের জন্মলাভ সম্ভব। নীতিধর্ম হোল ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বভাবের সংরক্ষণ এবং তাদের ওপরে জনস্বার্থ ও জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠা। নীতিধর্ম বলতে ব্যক্তির বিবেকপ্রসূত ন্যায়-অন্যায়-বোধ বোঝায় না, বোঝায় সমাজের প্রতি দায়ীত্ববোধ, কর্তব্যজ্ঞান। প্রাচীন গ্রীক নাগরিকরা নীতিধর্ম বলতে বুঝতো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। তাদের স্বাধীনতাবোধ রাষ্ট্রের মাধ্যমে নীতিধর্মকে আশ্রয় করে বিকাশ পেয়েছে। সমাজ-কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বিকাশই যথার্থ স্বাধীনতা, তাতেই প্রজ্ঞার মুক্তি। রাষ্ট্র, নীতিধর্ম ও আইন এই মুক্তি সাধনার যন্ত্র। বহু ও ব্যক্তির মধ্যে অসংগতি হলে থাকে বন্ধনদশা, তাদের মধ্যে সংগতি ঘটায় নীতি ও আইন, মুক্তি দেয় মানুষকে, তার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাকে। ইচ্ছা যখন আইনকে মানে তখন সে স্বাধীন, কারণ তখন সে মানছে নিজেকেই, কারণ ব্যক্তি-ইচ্ছা আর সমাজ-ইচ্ছা (আইন যার প্রতীক) মূলত এক পরম প্রজ্ঞারই দুইদিক—আবেগ ও আদর্শ, প্রেরণা ও লক্ষ্য। সুতরাং রাষ্ট্র মুক্তিধাতা, তার আইনের মধ্যে বহু ব্যক্তির বাসনা-কামনা যুক্তিসংগত পরিপূর্ণতা লাভ করে, ব্যক্তি পায় অতিব্যক্তির সুযোগ, এবং তাই এখানে স্বাধীনতা ও বাধকতার মূলগত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

অনেকের ধারণা রাষ্ট্রের জন্মের আগে প্রাকৃতিক সমাজে মানুষ ছিল মুক্ত, রাষ্ট্র তাকে আইনকানুনের বন্ধনে বেঁধেছে। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নেই। প্রাক্‌রাষ্ট্র সমাজে মানুষ ছিল প্রকৃতির দাস। চারদিকে নিসর্গের আঘাত, স্বার্থের সংঘর্ষ, অজস্র বিভীষিকা ও কুসংস্কারের বন্ধন। সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র সংগঠন করে তবে সে পেল মুক্তির স্বাদ, আইনকে স্বীকার করে সে পেল আত্মবিকাশের সুযোগ, সে হোল স্বানুগত স্বানুবর্তী।

সুতরাং রাষ্ট্র-গঠন মুক্তি-অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ, রাষ্ট্র সকল উন্নতির সোপান। ধর্ম, শিল্প, দর্শন মানব-জীবনের যা কিছু সাধনা বহু ও ব্যক্তির মিলন সাধন করে কিছুই রাষ্ট্র ছাড়া টেকে না,—রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে সংস্কৃতির পল্লবগুলি বিস্ফারিত হয়, বহুর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের দায় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। রাষ্ট্রের ভাঙাগড়া, রাষ্ট্রের রূপান্তর দেখিয়ে দেয় কোন উপায়ে বৌথজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সামঞ্জস্য সাধন হচ্ছে, কতটুকু তার সফলতা, বা নিষ্ফলতা, বিশ্ব-আত্মা বা প্রজ্ঞার মুক্তি কতখানি সাধিত হোল। তাই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রগতির পতাকা বহন করে নতুন নতুন রাষ্ট্র-দর্শন আবির্ভূত হয়, নতুন নতুন শাসনতন্ত্র উদ্ভাবিত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিশ্বের আত্মা ছিল আচ্ছন্ন। প্রজ্ঞা ছিল নিসর্গের গহ্বরে সমাহিত। মানুষের অচেতন বৃত্তির মধ্যে তার ক্ষীণাতিক্ষীণ স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যেত। তারপর উদ্ভব হোল বুদ্ধির। সন্ধান ইচ্ছা ও সক্রিয় প্রয়াসের

দ্বারা সে তৎপর হোল সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে। প্রকৃতির শাসন থেকে বিশ্ব-আত্মার এই মুক্তি-অভিযান ইতিহাসের বিষয়বস্তু এবং পরিসর। এর প্রান্তে কোন সুদূর ভবিষ্যতে হবে আত্মার পূর্ণমুক্তি, সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে নিরিঙ্কুশ প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান হবে, হবে বহু ব্যক্তির পূর্ণ সামঞ্জস্য, সকল দ্বন্দ্বের সমাধান।

পৃথিবীর ইতিহাস অগ্রসর হচ্ছে প্রাচী থেকে প্রতিচীর দিকে। এশিয়ার আদিম সভ্যতা নিয়ে ইতিহাসের সূত্রপাত। প্রজ্ঞার ফল্গুধার উন্মুক্ত হয়েছে। বহুর বা সমাজের কল্যাণে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তির মুক্তি সাধিত হয় নি। প্রাচ্য সাম্রাজ্যগুলির বিরাট গাঁথুনির মধ্যে যুক্তিসংগত আইনকানুন ও বিধি-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বহুর মধ্যে সে বিলীন হয়ে গেছে অন্ধ বিশ্বাস ও আনুগত্যে। পিতৃ-রাজের একক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে আছে রাষ্ট্র। মুক্তি বা স্বাধীনতা কেবল একজনে নিবদ্ধ। এই প্রাচ্য একতন্ত্র ইতিহাসের শৈশব অবস্থা।

তারপর এল গ্রীক সভ্যতা। ব্যক্তিত্ব এখানে রূপ গ্রহণ করছে। নীতিধর্ম এখানে আত্মবিশ্বত অন্ধ আনুগত্য নয়, ব্যক্তির ইচ্ছা-প্রসূত। গ্রীক নাগরিক যথেষ্ট আত্ম-সচেতন হয়েও রাষ্ট্রের ন্যায়দণ্ড ও নিয়মকানুনকে মেনে চলতে অভ্যস্ত। ব্যক্তিএখানে অজ্ঞাতসারে ভাববস্তু বা সমাজ-কল্যাণের সংগে এক হয়ে গেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মুক্তিবোধ কেবল অল্প কয়েকজনে সীমাবদ্ধ। এই গ্রীক গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র ইতিহাসের কৈশোর অবস্থা।

তারপর এল রোমক রাষ্ট্র। এখানে সমস্ত ব্যক্তি-লক্ষ্য সমাজ-লক্ষ্যে পরিণতি লাভ করেছে। ব্যক্তির কাজ এখানে একনায়কের মতিগতির দ্বারা বা নিজের খেয়ালখুশী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয় এক সঠিক লক্ষ্য দ্বারা, যে লক্ষ্যে ব্যক্তি তার নিজ উদ্দেশ্য ও সাধনার পূর্ণতা অনুভব করে। রোমক রাষ্ট্র এথেনীয় পলিস্-এর মত গুটিকয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে গড়া হয়নি। ব্যক্তির লীলায়িত ছন্দ-মধুর প্রকাশের জায়গায় এসেছে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা—সামরিক কলাণ ও গৌরবের জন্যে, ব্যক্তি বহুর জন্যে উৎসর্গিত, কিন্তু বহুর অরণ্যে সে হারিয়ে যায়নি। আইন ব্যক্তিকে অধিকার দিয়েছে। দেশ-প্রদেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যও স্বীকৃত। পরবর্তী কালে যখন এই দুই তারসাম্য বা সমন্বয়কে বিপর্যস্ত করে সাম্রাজ্যের ওপরে ব্যক্তি ও প্রদেশের উত্থান সূচিত হোল, তখন রাজদণ্ড হাতে নিয়ে এল একনায়ক, তার ঐতিহাসিক দায়ীত্ব পালনের জন্য। নতুন করে হোল দ্বন্দ্বের মীমাংসা। কঠোর শাসনের ছত্রছায়াতলে মানুষ লাভ করল মুক্তির স্বাদ। রোমক প্রজাতন্ত্রে ইতিহাস যৌবন প্রাপ্ত হোল।

কিন্তু একতন্ত্রের কঠোরতা ক্রমে ব্যক্তিনিগ্রহে পর্যবসিত হোল। প্রজ্ঞা আবার সমাহিত হোল চেতনার গভীর তলদেশে, নিরীশ্বর বিশ্ব থেকে সরে গিয়ে সে নিজের

অভ্যন্তরে সমাধান অন্বেষণ করতে লাগল। বিশ্বাত্মার এই সমাহিত আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে এক ও বহুর সমন্বয় আর সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না—হচ্ছে ব্যক্তিমানবের অন্তরতলে, ধার্মিক খৃষ্টান যেখানে আত্মাকে বিশুদ্ধ করে বিশ্বাত্ম হতে চায়, খৃষ্টান মানবতাকে সার্বিক কল্যাণে মুক্ত করে দিতে চায়। সাম্রাজ্যের বস্তুপরায়ণতার বিরুদ্ধে আত্মার দ্বন্দ্বকে পরিচালনা করল খৃষ্টীয় মানবতা; প্রতিষ্ঠা করল এক আত্মার সাম্রাজ্য।

খৃষ্টীয় সমাধান ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনা করল। কিন্তু এ সমাধান জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিণতি লাভ করল না। জাতীয় রাষ্ট্রের অবতারণা করে, যুথ ও ব্যক্তির, আত্মা ও বস্তুর সমন্বয় ও প্রজ্ঞার পুনর্মুক্তি সাধন, এই ঐতিহাসিক দায়ীত্ব নিয়ে এল জার্মান জগত। বর্বর হানাদারদের নিরীশ্বর রাষ্ট্র এবং খৃষ্টীয় ধর্মতন্ত্র উভয়ের দ্বন্দ্বের নিরসন হোল জার্মান রাষ্ট্রে। দুর্নীতিগ্রস্ত চার্চ বাস্তব আঘাতে বিধ্বস্ত হোল, তা থেকে উদ্ভব হোল যুক্তিশীল চিন্তার। বুদ্ধি ও যুক্তির জয়লাভের মধ্য দিয়ে আত্মা পুনর্মুক্তি লাভ করল। এক বিরাট ঐতিহাসিক ধারার উদ্ঘাপন হোল জার্মাণ রিফর্মেসন ও জার্মাণ রাষ্ট্রগঠন দ্বারা। চার্চ ও ষ্টেটের দ্বন্দ্ব, বস্তু ও আত্মার দ্বন্দ্ব—সবার সমন্বয় হোল জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায়, বুদ্ধির নিরংকুশ জয়যাত্রায়, আর সমাজ-আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে। প্রজ্ঞার দুর্বার মুক্তি-অভিযান জার্মাণ যুগের বৈশিষ্ট্য। জার্মাণ রাষ্ট্রে ইতিহাস লাভ করল পূর্ণবয়স।

পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমেরিকার বিরাট ভূখণ্ডে ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায় রচনা হবে। মানুষের ভবিতব্যের লিখন উন্মোচিত হবে বোধ হয় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এক সংঘর্ষে। ভবিষ্যতের ওপর হেগেলের এই দৃষ্টিপাত অন্তত আংশিক ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

পূর্ব হতে পশ্চিম অভিমুখী এই হেগেলীয় ঐতিহাসিক ধারায় এক এক যুগে এক এক জাতি তার দায়ীত্বের ভার নিয়ে পুরোভাগে আসে। তার রাষ্ট্রপ্রণালীতে স্ফুরিত হয় প্রজ্ঞা-বিকাশের এক একটী স্তর। বিকাশের উৎস শুকিয়ে গেলে উদ্ভব হয় প্রতিকূল শক্তির,—পরবর্তী যুগের বাণী বহন করে নতুন জাতি, নতুন রাষ্ট্রচিন্তা আঘাত হানে প্রাচীন ব্যবস্থার ওপর। এমনি করে ডায়লেক্‌টিক্ প্রণালীতে ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হয়। এই বিরাট বিশ্ব-বিবর্তনের মধ্যে ব্যক্তির সক্রিয় অংশ অতি সামান্য। যে সমস্ত শক্তিমান পুরুষ বিশ্ব-প্রজ্ঞার অমোঘ অভীপ্সাকে নিজ জীবনলক্ষ্য রূপে গ্রহণ করতে পারেন, ইতিহাস তাঁদেরই ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে, তাঁদেরই কপালে জয়টীকা এঁকে দেয়। বীরের সংগ্রাম, মহতের সাধনা যুগলক্ষণের প্রতীক। সাধারণের স্বপ্ন অজানিতে বাস্তব হয়ে ওঠে এঁদের কীর্তিকলাপে, তাই তারা অন্ধভাবে এঁদের অনুবর্তন করে।

হেগেলের প্রজ্ঞানবাদী পুরাদর্শন আজ পুরাতত্ত্বের জীর্ণ পাতায় স্থান লাভ

করেছে। প্রাচ্য সভ্যতায় একতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়ে ছিল,—বেশ, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস ও লাওৎসে-র সংগে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তারা কখন একথা স্বীকার করবেন না। হিন্দু ও চীন সভ্যতার মূলেই হোল ব্যক্তিত্ব, মহান ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই ব্রাহ্মণ্য ও কনফুসিয় সমাজ দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। সমাজ হয়েছে ব্যক্তিত্ব-নির্ভর। প্রুশিয়ার হোহেনজোলার্ণ রাজত্বে হেগেল দেখেছিলেন প্রজার পূর্ণপ্রকাশ, যে রাজত্বের ঐতিহ্য হিটলারের সর্বনাশা দম্ভের বনিয়াদ রচনা করেছিল। হেগেলের ঐতিহাসিক মহাপুরুষের পংক্তিতে যীশুর আসনে বসেছেন আলেক-জাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান,—যীশু, বুদ্ধ, দান্তে, লুথারের স্থান অনেক নীচে। তাঁর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক প্রগতিবাদ প্রমাণসহ নয়। দুর্বল রাষ্ট্রের বুকেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে। তার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ।

কিন্তু এরূপ বহু স্থূল ত্রুটির জন্যে হেগেলের ইতিহাস-দর্শন মূল্যহীন হয়ে যায় নি। বিবর্তনের ভাবসর্বস্বতা, রাষ্ট্রীয় একদেশদর্শিতা এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির কথা আজ বহুলাংশে বিবর্জিত। কিন্তু এ তত্ত্ব বহুলাংশে স্বীকৃত যে ঘটনা জন্মলাভ করে বিরোধী শক্তির সংঘাত থেকে, এবং ইতিহাস এক যুক্তিক গতিধারার পট উন্মোচন করছে। এই স্বীকৃতিকে সম্বল করে পরবর্তী কালের মনীষীরা অতীতের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিপাত করলেন।

[এঁদের কথা নিয়ে আগামী বারে আলোচনা হবে]

সপ্তদশ শতাব্দীর তিনখানি দলিল ও একটি গ্রামিক বিরোধের কাহিনী

শ্রীসুকুমার সেন

মুসলমান অধিকারের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ভূমি হস্তান্তর অথবা নালিশ-মকদ্দমার আর্জি প্রভৃতি দলিলপত্র বেশি কিছু পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা সবই ফারসীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা দলিল দুই একখানি মাত্র পাওয়া যায়। এমন দুর্লভ দলিল তিনখানি সাইত্রিশ বছর আগে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসুঠাকুর হাফ্‌টোন প্রতিলিপি সমেত প্রকাশ করেছিলেন মফস্বলের একটি মাসিক পত্রিকায়।* নানা দিক দিয়ে মূল্যবান্ এই দলিলগুলি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে দুখানি সন্ধিপত্রের মূল্যবান্ ভাষা-তাত্ত্বিকের ও ইতিহাসরসিকের কাছে।

দলিল তিনখানিতে একটি গ্রামিক বিরোধের কাহিনীর সূত্র মেলে। ঢাকা জেলায় কুমড়ায় গ্রামে যশোমাধব ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন স্বমন্দিরে। পুরুষানুক্রমে ঠাকুরের সেবায় ছিলেন কায়েত-পাড়া ("কায়স্থপল্লী") গ্রাম নিবাসী রামজীবন মৌলিক। রাম শর্মা, ভগীরথ শর্মা ও রাধাবল্লভ শর্মা ছিলেন পূজারী বামুন। ইতিমধ্যে একদা দেশে দেশে পাতশার হুকুম এল দেবস্থান ("দেওড়া" দেববাটিক) ও দেবমূর্তি ধ্বংস করবার জন্যে। খবর পেয়ে ঠাকুরের সেবায়েত-অধিকারী রামজীবন মৌলিক কুমড়ায়ের মন্দির থেকে ঠাকুরকে নিয়ে এলেন নিজের সদর মহলে। আশপাশের গ্রামের লোকেরা ঠাকুর দেখতে কায়েত-পাড়ায় রামজীবনের বাড়িতেই আসে। তারপর কালক্রমে দেউল-ভোড়ার ও দে-ভাঙার হুকুম থেমে গেল। ঠাকুর কিন্তু রামজীবনের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। অনুমান করি, এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে এবং রামজীবনের একচ্ছত্র সত্ত্বাধিকার স্বীকার না করে কুমড়ায় গ্রামের লোকেরা মতলব করেছিল ঠাকুরকে স্বমন্দিরে পুনঃস্থাপিত করতে। চৈত্র শেষে রামজীবন ও কায়েত-পাড়া গ্রামের লোকেরা ঠাকুরকে রামজীবনের বাববাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলে। ঠাকুর দেখতে এবং অপহরণ করতে (?) এসে দেখতে না পেয়ে কুমড়ায় অথবা কায়েত-পাড়া গ্রামের কায়স্থরা দুদিন পরে নালিশ-আর্জি পেশ করলে। এইটাই প্রথম দলিল। এটির শুদ্ধ ও যথাযথ পাঠ—

---

* প্রতিভা অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০, 'রামাইর পুরাকীর্তি' প্রবন্ধ।

হকীকত মজুর্র শ্রীযুত অসোমাধব ঠাকুর কুমতায়
গ্রামে দেবালয়ত আছিলা রামসর্ম্মা ও তস্য
ভগীসর্ম্মা ওগয়রহ সেবকেরা আপনার
আপনার ওয়াদাগ্রাফিক সেবা করিতে
ছিল রাত্রিদিন চৌকী দিতেছিল শ্রীরাম
জীবন মৌলিক সেবায় সমবয়াহ পুরুসাত্তুক
যে করিতেছেন ইহার মৌধ্যে পয়গনা
পয়গনাতে দেওড়া ও মুকুত তোড়িবার
আহাদে হজুর থাকীয়া পরোয়ানা লইয়া আল
আয় পয়গনাত দেওড়া ও মুকুত তোড়িতে
লাগীল এ বার্ত্তা শুনিয়া ঠাকুর ঠাকুর রামজীবন
মৌলিকের বাড়িতে বাহির-বাড়িতে আসিয়া
বসিলা রামসর্ম্মা ও ভগীরথসর্ম্মা ওগয়রহ
ঠাকুরের সেবা ও চৌকীপহরা রাত্রিদিন নিযুক্ত
আছিল তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর
দেখিবার প্রাতঃকালে সকল লোকে গেল ঠাকুর
সেখানে না দেখিল রামসর্ম্মা ও ভগীরথসর্ম্মা
ওগয়রহতে সেবা করিতেছিল তাহার সেখানে
নাহি তদবধি রাম রামজীবন মৌলিকের
বাড়িতে ঠাকুর ও রামসর্ম্মা ও ভগীরথ
সর্ম্মা ওগয়রহ কেহ নাহি—
ইতি স ১০৭৯ তে ২৯ মহরম মাহে ৩০ [জৈষ্ঠ]

কায়স্থরা ঠাকুরের মূল পরিচায়কদের উপকিয়ে দিলে। ঠাকুরের কীর্ত্তনিয়া শ্যাম মালি ও সেবক গোকুল মালি এরাও রামজীবন ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে নালিশ করলে। এই আর্জির জবাব দেওয়া হয়েছিল ঠাকুরের পূজারীদের পক্ষ থেকে। এইটিই দ্বিতীয় দলিল। এটির ফটো প্রতিলিপি না থাকায় প্রবন্ধকারের পাঠই একমাত্র অবলম্বন। মূলে ছেদচিহ্ন নেই। অর্থবোধের সুবিধা হবে বলে বন্ধনী মধ্যে ছেদচিহ্ন দেওয়া গেল।

শ্রীযুত যশোমাধব
ঠাকুরের
শ্রীশ্যাম মালাকার তথা শ্রীগোকুল মালি ওপ
এবহ মালিবর্গ তথা শ্রীকুলিনত[1] মুচরিতেষু আগে
তোমরা যে কারণ শ্রীরামজীবন মৌলিকে
য নামে ফৈয়াদ করহ (।) কারণ কী তোমরাকে (।) তো
মরা মালিনত পকবিত্তি আবদরুণ তোমরা
৺ দাও আকারণ (।) ও শ্রীরামজীবন মৌলিক
পুরুসানক্রমেই ৺ সেবায় অধিকারি মনিব (।)
আমরা পুজাহারি ব্রাহ্মণ (।) ও মুদ্র পরিচায়ক
তোমরা (।) নাহঃক[2] ফৈয়াদ করহ (।) শ্যাম মালি তোমা
কে দুই বছর ধরিআ চাকর রাখাইছি কীর্ত্তোনি ক
রিতে কারণ (।) তুমি যে ফৈয়াদ করহ নাহঃক (।) আ
মরা পুরুসানক্রমেই ৺ সেবা করিতেছি
ইতি সন ১০৭৯ তেং ২১ আষাঢ়

শ্রীরামজীবন মৌলিক

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সাক্ষীদের সই আছে,

ইসাদি

শ্রীঘনশ্যাম রায় :	নরোত্তম খানস্ত	শ্রীনরোত্তম মিত্র :	শ্রীরাধাবল্লভ দাস

এই দলিলের ইসাদি রাধাবল্লভ দাস ও প্রথম দলিলের অন্যতম কবিয়াদি রাধাবল্লভ দাস যদি এক ব্যক্তি হন তবে ধরা যেতে পারে যে কায়স্থদের সঙ্গে বিবাদ চুকে গিয়েছিল। প্রথম দলিলে সই আছে "রাধাবল্লভ", দ্বিতীয় দলিলের সইয়ে যদি এই পাঠ থাকে তো সন্দেহ মিটে যায়।

তৃতীয় দলিল সম্পাদিত হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে। কায়েত-পাড়ায় যশোমাধবের স্থিতি পাকা হয়ে গেল গ্রামের এক দানশীল মহিলার ভূমিদানে। এই দান যে স্থানীয় শাসনকর্তার[3] অনুমোদন পেয়েছিল তার প্রমাণ দলিলের মাথায় ফারসী লিপি।[4] দলিলটির শুদ্ধ পাঠ এই,

---

১ মুদ্রিত পাঠ 'শ্রীকুলিনত'। ২ ঐ 'নহঃক'।

৩ এই ভূমিদানের পত্রের অনুমোদনের তারিখ ২০শে শাবন, ১০৮৪ হিজরি।

৭ স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তাদ্যুপেতসততবিরাজমানমহারাজা
বিরাজ বাদসাহক শ্রীযুত অরংজেব [নাং দান ? বিধ]
যিনি তত্তদ্যাজ্যে তদ্বিযুক্তক নবাবক শ্রীযুত • • •
খানক মহাপদ্মানামধিকারে তদ্বিযুক্তক জায় [গি]
বিদায়ক শ্রীযুত ইন্দ্রিজিয়ায় খানক[১] মহাপদ্মানামদি [কা]
যে তদ্বিযুক্তক সিগদায়ক শ্রীলালবেহারী মহাশ [য়]
স্ত বিষয়িনি সুলুতানপ্রতাপান্তর্গত ধর্ম্মরাজী [ত]
পাকীয় কায়স্থপল্লী গ্রাম নিবাসিনঃ শ্রীগোপী
নাথ মজুমদারকস্ত সভাস্থামনেকেষামুপরি [ত]
পঞ্চনবত্যধিক পঞ্চদশ শত শকাব্দে সুলুতান
প্রতাপান্তর্গত কায়স্থপল্লী গ্রাম নিবাসি—গোপীনা
থ দেবকস্ত স্ত্রী শ্রীমতী সদাদাসী তৎপত্তে [র্গো]
পীনাথ দেবকস্ত স্বর্গকামনয়া তস্ত ভূমি [ম্]
পমেতৎ নিজাংশ তাম্রকং তত্রনিবাসিনে শ্রীরা [ম]
জীবন মৌলিকায় দত্তবতীতি—সন্ ১০৮২ দি • •
২৩ আগ্রহায়ণস্ত—

উল্টা পিঠে,[২]

অত্রার্থে সাক্ষি—

শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা — শ্রীমহেশ শর্ম্ম
শ্রীগোপীনাথ দেবক : — শ্রীঅভিরাম দাস

• • বিরচিত শ্রীজগদ্বল্লভ দেব
• শ্রীউমাপতি দাস উদ্যোগেন
শ্রীশিবরাম শর্ম্মণা লিখিতমিতি

দলিলটিতে সেকালের রাজস্ববিভাগীয় শাসনকার্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সেটুকুতেই এর মূল্য পর্য্যবসিত নয়। প্রাক্-মুসলমান আমলের শাসনপট্টের ভাষারীতি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। ভূমিদান পত্রটির লেখক শিবরাম শর্ম্মা গুপ্ত-পাল-সেন শাসনের দূতক শিল্পীদের সঙ্গে একত্র স্মরণীয়।

১ কপালচুকি করে লেখা। ২ এই পিঠের হাফটোন প্রতিলিপি নেই।

শাম্বোপাখ্যান ও সূর্যপূজা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হলেও ঐতিহাসিক রচনায় দরিদ্র। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের কাজে যাঁরা ব্রতী, তাঁদের অনেক সময়ে নানা বিচিত্র ক্ষেত্র হ'তে উপাদান সংগ্রহের প্রাথমিক পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়। ব্যাপারটি যে নিতান্ত সহজ তা নয়। কেননা মাঝে মাঝে এমন সব উপকরণ হাতের কাছে আসে, যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য এক নজরে বোঝবার উপায় নেই, অথচ সেগুলি কোনও ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা সেগুলির নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করতে পারলে, তবে উপলব্ধি করা যায় তা'দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের বিরাট পৌরাণিক সাহিত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। আপাত:-দৃষ্টিতে আজগুবি রূপকথার সামিল, পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে নানা স্থানে আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সেগুলিকে বাছাই করে নেবার মত সন্ধানী দৃষ্টি গবেষকদের থাকা প্রয়োজন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রভাসখণ্ডের "বস্ত্রাপথমাহাত্ম্য" শীর্ষক অধ্যায় বিশ্লেষণ করে ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন যে কান্যকুব্জের প্রতীহারবংশীয় রাজা প্রথম ভোজদেবের রাষ্ট্রীয় অধিকার যে পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র বা কাথিওয়াড় পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে আছে। স্কন্দপুরাণের উক্ত অংশ থেকে আরও জানা যায় যে সম্ভবতঃ রাজা ভোজ তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে সাময়িক-ভাবে রাজপদ ত্যাগ করেছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতকে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্পর্কে এ তথ্য মূল্যবান সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে অনুরূপ নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ইঙ্গিত পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় একটি পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে কিছু আলোচনা করা গেল। ভারতীয় সূর্যোপাসনা ও সৌর সম্প্রদায়ের ইতিহাসে কাহিনীটির তাৎপর্য ও মূল্য কম নয়।

ভারতে ঐতিহাসিক যুগে প্রচলিত সূর্যোপাসনার ধারাকে মোটামুটি দুটি পর্বে ভাগ করা চলে। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত সৌরধর্ম এর প্রথম বা বৈদিক পর্ব। পরবর্তীকালে (সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক হ'তে) সূর্যপূজার এক নূতন পদ্ধতি পারস্য থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উক্ত নবধারার প্রবর্তক ছিলেন প্রাচীন পারস্যের ম্যাগি (Magi) পুরোহিত সম্প্রদায়, ভারতীয় ঐতিহ্যে যাঁরা মগ বা

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা তার কাছাকাছি সময়ে এই বিদেশী পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে এবং সূর্যপূজার নূতন ঐতিহ্য এদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়। বিদেশী প্রভাবপুষ্ট সূর্যোপাসনার উল্লিখিত নবরূপ ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে প্রচলিত সৌরধর্মের দ্বিতীয় পর্ব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শককুষাণ অধিকারের যুগে এই মাগি পুরোহিতবৃন্দ এদেশে আসেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে এই আগমনকাল খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক। সম্ভবতঃ এরও কিছুকাল পূর্বে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে, ভারতের মাটিতে এঁরা প্রথম পদার্পণ করেন; কেননা খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে ভারতে এঁদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পারসীক সূর্যোপাসক মাগি পুরোহিতবৃন্দের ভারতবর্ষে আগমনের স্মৃতির ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে রয়ে গিয়েছে পৌরাণিক সাহিত্যে। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত পুরাণবর্ণিত শাম্বোপাখ্যান সেই ঐতিহ্যের বাহক; ভারতবর্ষে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসের এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাটিই মূল উপাদান।

কৃষ্ণপুত্র শাম্বের এই কাহিনী পৌরাণিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে খুঁটিনাটির পার্থক্য থাকলেও বর্ণনাগুলির মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। মূল গল্পটি যা দাঁড়ায় তা এই : "মগ ব্রাহ্মণগণ ছিলেন শাকদ্বীপের অধিবাসী। মিহিরগোত্রসম্ভূত ঋষিস্থ নামক ঋষির কন্যা নিক্ষুভার গর্ভে সূর্যের ঔরসে জলদস্যু বা অরুণস্থ নামক এক পুত্র জন্মায়। সূর্য ও নিক্ষুভার এই পুত্রই মগ-সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। একবার জাম্ববতীর গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বের অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করে রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অপরাপর পত্নীগণ কামার্ত হ'য়ে উঠেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে শাম্বকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপের ফলে শাম্ব কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হ'ন। দেবর্ষি নারদ তখন শাম্বকে রোগমুক্তির জন্য ভগবান সূর্যের আরাধনা করতে উপদেশ দেন। তদনুসারে শাম্ব সূর্যের আরাধনা করেন ও সূর্যানুগ্রহে কুষ্ঠ ব্যাধি হ'তে আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তিনি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে একটি সূর্যমন্দির স্থাপন করেন এবং সেই মন্দিরে এক সূর্যমূর্তি স্থাপন করেন। কিন্তু মন্দিরে পুরোহিতের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ এদেশে সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল না। অবশেষে তিনি সূর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণগণের দেশ শাকদ্বীপে গমন করেন এবং এই বিদেশী সৌর-পুরোহিতবর্গের মধ্য হ'তে আঠারোটি পরিবারকে সঙ্গে করে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) নিয়ে আসেন। এঁদের দ্বারা তাঁর সূর্যমন্দিরের সৌরোহিত্যকর্ম উপযুক্তভাবে সম্পাদিত হয়। শাম্ব কর্তৃক ভারতে আনীত মগ পুরোহিতবৃন্দ দ্বারকার ভোজবংশের কন্যাগণের মধ্য হ'তে পত্নী গ্রহণ করে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই ভাবে মগব্রাহ্মণ সম্প্রদায়

কর্তৃক সূর্যের পূজা ভারতে প্রবর্তিত হয় এবং সূর্যের পুরোহিত হিসাবে এই সম্প্রদায় ভারতবর্ষে সুপরিচিত হন।" গল্পটির মধ্যে মগব্রাহ্মণগণের ভারতে আগমনের এবং এদেশে সৌর-পুরোহিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে উল্লেখ আছে তা' যে মোটামুটি সত্য সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে তার সমর্থন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে উত্তর-ভারতে সূর্যোপাসক ব্রাহ্মণ বলতে মগ বা শাকদ্বীপী সম্প্রদায়কেই বোঝাতো। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বরাহ-মিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে এ'কথা স্পষ্ট করেই বলে গিয়েছেন। দক্ষিণভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলেই মনে হয়, যদিও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে, গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী দাক্ষিণাত্যে Brakhmanai Magoi (মগব্রাহ্মণ) নামে এদের একটি উপনিবেশ উল্লেখ করে গিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উক্ত পৌরাণিক শাম্বোপাখ্যান ভারতীয় সৌরধর্মের ইতিহাসে একটি অতি মূল্যবান ঐতিহ্যকে বহন করেছে। পৌরাণিক সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় ভবিষ্য ও শাম্ব পুরাণদ্বয়ে। উভয়ত্র মূল আখ্যায়িকাটির রূপ প্রায় একই। প্রশ্ন উঠবে, এর মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর। এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। জটিল তর্কের অবতারণা না করে বলা যেতে পারে, যে যতদূর জানা যায় ভবিষ্যপুরাণই শাম্বপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং ভবিষ্যপুরাণোক্ত শাম্বের কাহিনী অবলম্বন করে পরে শাম্ব নামক উপপুরাণ রচিত হ'য়েছিল। পার্জিটার প্রায় সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করেছেন যে ব্রহ্মাণ্ড বায়ু এবং মৎস্য পুরাণত্রয়ে কলিযুগের যে রাজবংশাবলীর তালিকা পাওয়া যায়, তার মূল হ'ল ভবিষ্যপুরাণের "বংশানুচরিত" অংশ। অতএব এক হিসাবে ভবিষ্যপুরাণ যে প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম, তা মেনে নিতে বিশেষ কোনও বাধা নেই। তা ছাড়া অন্যান্য পুরাণেও দেখা যায় যে ভবিষ্যপুরাণকেই সূর্যপূজাসম্পর্কিত উপাখ্যান ও কিংবদন্তীর প্রধান বাহক বলে গণ্য করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে (৫৩।৩০-৩১) বলা হয়েছে

"যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য চতুর্মুখঃ।
অঘোরকল্পবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গেন জগৎস্থিতিম্।
মনবে কথয়ামাস ক্ষুত্তগ্রামস্য লক্ষণম্।
চতুর্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ।
ভবিষ্যচরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিহোচ্যতে॥"

সুতরাং এই বর্ণনানুসারে ব্রহ্মা ভবিষ্যপুরাণে মনুর নিকট অঘোরকল্প প্রসঙ্গের সহিত আদিত্যমাহাত্ম্য কীর্তন করে শুনিয়েছেন। বরাহপুরাণে শাম্বোপাখ্যানের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে সেই প্রসঙ্গে উক্ত আখ্যায়িকার মূল হিসাবে দু'বার ভবিষ্য-পুরাণের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা নারদ শাম্বকে বলছেন (বরাহপুরাণ ১৭৭।৩৪)—

"ভবিষ্যৎপুরাণমিতি তব বাদাদ্ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মলোকে পঠিষ্যামি ব্রহ্মণোঽগ্রে সদা।
মমজন্মর্ত্যলোকে চ মনোঃ প্রকথয়িষ্যতি॥"

আবার ঐ অধ্যায়ে বরাহের মুখ দিয়ে বলানো হ'য়েছে (বরাহপুরাণ ১৭৭×৫০-৫১)—

"শাম্বস্য সহ সূর্যেণ মমত্বেন দিবানিশম্।
রবিং শপ্তঞ্চ ধর্মাত্মা পুরাণং সূর্যভাষিতম্।
ভবিষ্যৎপুরাণমিতি খ্যাতঞ্চক্রে পুনর্নবম্।
শাম্বঃ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠাঞ্চ কারয়ামাস তত্ত্ববিৎ॥"

অগ্নিপুরাণে (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণ, ২৭১।১২) ভবিষ্যপুরাণকে সূর্য হ'তে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে (চতুর্দশসহস্রাণি ভবিষ্যং·সূর্যসম্ভবম্···)। নারদীয় পুরাণে (১।১০০) ভবিষ্যপুরাণের অন্তর্গত "ব্রাহ্মপর্ব্ব"কে "আদিত্যচরিত-প্রায়" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় উক্তপর্ব্বেই শাম্বের কাহিনী সূর্যমাহাত্ম্য এবং সূর্যপূজাবিধির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। পৌরাণিক ঐতিহ্যে যে ভবিষ্যপুরাণকেই শাম্বোপাখ্যান এবং সূর্যপূজাসম্পর্কিত কিংবদন্তীর মূল ও প্রধান আধার বলে মনে করা হ'য়েছে, উপরিউক্ত উদাহরণগুলির থেকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। অপর পক্ষে শাম্বপুরাণের কাহিনী যে ভবিষ্যপুরাণ থেকেই নেওয়া হ'য়েছে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মৎস্যপুরাণে। শাম্বপুরাণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণে (৫৩।৬১) বলা হয়েছে

"যত্র শাম্বং পুরস্কৃত্য ভবিষ্যেঽপি কথানকম্
প্রোচ্যতে তৎ পুনর্লোকে শাম্বমেতন্মুনিব্রতাঃ॥"

আলবেরুণী আমাদের অষ্টাদশ পুরাণের যে দুটি তালিকা দিয়েছেন তার দুটিতেই ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ আছে, কিন্তু শাম্বপুরাণের উল্লেখ আছে মাত্র প্রথমটিতে। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভবিষ্যপুরাণ শাম্বপুরাণ অপেক্ষা অধিকতর সুপরিচিত ছিল এবং সম্ভবতঃ তার প্রামাণিকতাও ছিল শাম্বপুরাণ অপেক্ষা বেশী। কূর্মপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের যে তালিকা পাওয়া যায়, সেখানেও ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ করা হ'য়েছে প্রথম পুরাণের তালিকায় (১।১।১৩)। পরে বলা হ'য়েছে যে মুনিগণ ঐ অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করে সংক্ষেপে অন্যান্য উপপুরাণ লিখেছেন (১।১।১৬)। তারও পরে অষ্টাদশ উপপুরাণের নামোল্লেখ করা হ'য়েছে এবং সেই উপপুরাণের তালিকায় শাম্বপুরাণের নাম দেখা যায় (১।১।২০)। সুতরাং ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনী যে শাম্বোপাখ্যানের আদি রূপ তা আমরা ধরে নিতে পারি। সম্ভবতঃ শাকদ্বীপী বা মগ ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে যখন সূর্যপূজার প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সূর্যপূজার দ্বিতীয় পর্বের প্রতিষ্ঠাতা শাম্বের নামে স্বতন্ত্রভাবে একখানি উপপুরাণ

প্রচারিত হয়। এই উপপুরাণে শাম্বোপাখ্যান ও সূর্যপূজার বিবরণাদি ভবিষ্য-পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছিল। তখন পাশাপাশি ভবিষ্য ও শাম্ব এই দুখানি পুরাণগ্রন্থই চলতে থাকে, যদিও প্রথমখানিতে শাম্বোপাখ্যান বা সূর্যোপাসনার ব্যাখ্যান ছাড়া আরও অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছিল এবং সেখানার প্রসিদ্ধি ছিল বরাবরই বেশী। ভবিষ্যপুরাণের মৌলিকতার আর একটি প্রমাণ এই যে পরবর্তী কালের স্মৃতিকারগণ সূর্যপূজার আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় সকলেই এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন এবং এর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, শাম্বপুরাণ সে'ক্ষেত্রে প্রায় উপেক্ষিত। ভবিষ্য ও শাম্বপুরাণদ্বয়ে প্রাপ্ত শাম্বোপাখ্যানের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। কাহিনী অনুসারে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শাম্বপুর নামক স্থানে শাম্বকর্তৃক প্রথম সূর্যমন্দির নির্মিত ও সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলবেরুণীর সাক্ষ্যে সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে এই শাম্বপুর বর্তমান সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত মূলতান। এখানকার সুবিখ্যাত সূর্যমন্দির ও সূর্যমূর্তির উল্লেখ হিউএন সাঙ্, আল ইদ্রিসি, আল বেরুণী প্রমুখ বিদেশী লেখকগণের রচনায় পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে শাম্বোখ্যান সূর্যপূজার যে ঐতিহ্য বহন করছে, প্রথম যুগে তা জড়িত ছিল উত্তর-ভারতের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে। শাকদ্বীপী বা মগব্রাহ্মণগণ পারস্য থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম যে ঐ সকল অঞ্চলে কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করবেন, তা খুব স্বাভাবিক।

ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আমরা শাম্বোপাখ্যানের আর একটি রূপ পাই বরাহপুরাণে। এর মূল যে ভবিষ্যপুরাণোক্ত শাম্বের কাহিনী তার উল্লেখ পূর্বেই করা হ'য়েছে। আখ্যানভাগের দিক দিয়ে বরাহপুরাণ কথিত শাম্বোপাখ্যানের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করবার তা হ'ল মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের অনুল্লেখ। দ্বিতীয়তঃ বরাহপুরাণ অনুসারে শাম্ব যে সকল স্থানে সূর্যমন্দির নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে মথুরা অন্যতম। এই দু'টি পরিবর্তনই যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। মগ বা শাকদ্বীপী সৌরপুরোহিতবৃন্দ ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে স্থান লাভ করলেও মূলতঃ বিদেশী হওয়ার দরুণ খাঁটি ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ চিরদিনই তাঁদের কতকটা অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। এ তাচ্ছিল্যের রেশ আজও ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজ থেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। সম্ভবতঃ প্রাচীন সূর্যোপাসক মগব্রাহ্মণগণের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য শাকদ্বীপী, সেবক, দেবল, গ্রহবিপ্র, অগ্রদানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বর্তমান কালেও ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে অপেক্ষাকৃত অল্পমর্যাদার অধিকারী। সুতরাং মগব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রচারিত সূর্যোপাসনার নূতন অধ্যায় যখন ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বস্বীকৃত হ'য়ে গেল, তখন এই ব্যাপারে উক্ত বিদেশী সৌরপুরোহিতবর্গের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কৃতিত্ব অস্বীকার করবার একটা প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই গোঁড়া ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে দেখা দিয়েছিল। খুব

সম্ভবতঃ সেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বশেই বরাহপুরাণের আলোচ্য অংশের রচয়িতা মগব্রাহ্মণগণের আগমনসংবাদটুকু বাদ দিয়ে শাম্বোপাখ্যানকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। শাম্ব কর্তৃক মথুরাতে সূর্যমন্দিরস্থাপনের কাহিনী থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মগব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রবর্তিত সূর্যপূজার নূতন বিদেশী রূপ আর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে নেই। তা ক্রমে উত্তর ভারতের অভ্যন্তরে পূর্বমুখী অভিযান চালিয়েছে এবং মথুরা পর্যন্ত নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। শাম্বোপাখ্যান ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই মূলস্তান থেকে মথুরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

বিহারপ্রদেশস্থ গয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত গোবিন্দপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ১১৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে শাম্বোপাখ্যানের পূর্বমুখী অগ্রগতির পরবর্তী ধাপের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ লিপিতে এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণপরিবারের বংশ পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। এর নিম্নোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে শাম্ব ও মগব্রাহ্মণগণের উল্লেখ আছে।

"দেবো ঽীবাত্রিলোকীমণিরবয়বকণো যদ্বিবাসেন পুণ্যঃ
শাকদ্বীপস্তু দুগ্ধাম্বুনিধিবলয়িতো যত্র বিপ্রে মগাখ্যা।
বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততনোর্ভাস্করাদ্যঃ স বাজ (যুক্তঃ)
শাম্বো যানানিনায় স্বয়মিহ মহিতাস্তে জগত্যাং জয়ন্তি।"

"ত্রিভুবনের মস্তকস্বরূপ সেই দেব অরুণের জয় হো'ক, যাঁর নিবাসহেতু দুগ্ধসাগর পরিবেষ্টিত শাকদ্বীপ,—যেখানে ব্রাহ্মণগণ মগনামে আখ্যাত,—পবিত্র হয়েছে। সেখানে ভ্রমিযন্ত্রের ঘর্ষণে মুক্ত স্বয়ং সূর্যের অঙ্গ হ'তে এক দ্বিজবংশের উদ্ভব হ'য়। এঁরা স্বয়ং শাম্বকর্তৃক এখানে আনীত হ'ন। তাঁরা মহান্ এবং জগতে সম্মানিত।" এই লিপির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে শাম্বোপাখ্যানের পূর্বমুখী অভিযান থামেনি, মথুরা অতিক্রম করে তা গয়া জেলায় এসে পৌঁছেছে। মগ ব্রাহ্মণগণের পূর্বভারতে বসতিস্থাপনের সঙ্গে তাদের দ্বারা প্রবর্তিত সূর্যোপাসনাও যে এই অঞ্চলে প্রসারলাভ করছিল তা বলাই বাহুল্য।

যতদূর জানা যায়, শাম্বোপাখ্যানের পরবর্তী এবং শেষ উল্লেখযোগ্য বিবরণ আছে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গ্রন্থ কপিল সংহিতায়। গ্রন্থখানি উড়িষ্যার তীর্থ মাহাত্ম্য-বিষয়ক এবং এর রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতক। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত অর্কক্ষেত্র বা সূর্যক্ষেত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শাম্বোপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে আখ্যানভাগ থেকে মগ ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গ সযত্নে বাদ দেওয়া হ'য়েছে এবং এই বিষয়ে বরাহপুরাণের সঙ্গে কপিল সংহিতার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। উভয়ত্র গোঁড়া ভারতীয় ব্রহ্মণ্যপন্থী মনোভাব সম্ভবতঃ এই অনুল্লেখের জন্য দায়ী। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে ভবিষ্য ও শাম্বপুরাণদ্বয়ের মূল কাহিনীকে

সুকৌশলে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুরী জেলার অন্তর্গত কোণার্কের সুবিখ্যাত সূর্যমন্দির এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অর্ককেত্র রূপে পরিচিত। কপিল সংহিতা মতে এই হ'ল শাম্বের সূর্যার্চনা, রোগমুক্তি, এবং সূর্যমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল কেন্দ্র। তাই গ্রন্থকার চন্দ্রভাগা নদী, মৈত্রেয়বন প্রভৃতি সব কিছুকেই সুদূর পঞ্জাব বা সিন্ধু প্রদেশ থেকে সরিয়ে এনে উড়িষ্যার পুরী জেলায় কোণার্ক মন্দিরের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত বলে নির্দেশ করেছেন। ভারতের পূর্ব উপকূলে যখন সুবিখ্যাত কোণার্কে সূর্যমন্দির নির্মিত হ'ল তখন মূল শাম্বোপাখ্যানকে স্থানকালের উপযোগী নূতন রূপ দেওয়ার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। কপিল-সংহিতায় আমরা সেই প্রচেষ্টার রূপই দেখতে পাই।

এই ভাবে মূলস্থান থেকে মথুরা, মথুরা থেকে গয়া, গয়া থেকে উড়িষ্যার পুরী জেলা—শাম্বোপাখ্যানের এই বিচিত্র গতিপথ, ভারতীয় সৌরধর্মের দ্বিতীয় বিশেষ পর্বের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিস্তারের ইঙ্গিত দেয়। সূর্যপূজার মূল ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আখ্যায়িকাটির গুরুত্ব যথেষ্ট।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী কর্তৃক Brakhmani Magoi নামে শাক্ষদ্বীপী ব্রাহ্মণদের উল্লেখের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক ডাঃ বিভেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ'জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সোভিয়েট অর্থনৈতিক বিবর্তন

শ্রীঅমল বসু

(১)

বলশেভিক বিপ্লবের দ্বিতীয় দিনেই, ১৯১৭ সালের ছাব্বিশে অক্টোবরে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আদেশপত্র জারি হ'ল। শ্রেণীবিলুপ্তির ক্রমিকধারায় জমিদারশ্রেণীর বিলোপই বিপ্লবের প্রথম কীর্তি; ধনিক ও কুলক শ্রেণীর উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হ'তে আরও দশবছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে।

জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদের পর জমি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয় নি, প্রায় সব জমিই চাষীদের দখলে এসেছে। ছাব্বিশে অক্টোবরের আদেশপত্র জারি করবার সময় রাষ্ট্রনেতাদের অভিপ্রায় ছিল যে, জমিদারদের ভূসম্পত্তি প্রথমে স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলির নিয়ন্ত্রণে যাবে, পরে এ-সব জমির অনেকাংশ রাষ্ট্রপরিচালিত ও সমষ্টিগত ক্ষেতখামারে পরিণত হ'বে, অবশিষ্টাংশে ব্যক্তিগত চাষপ্রথা প্রচলন হ'বে। কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে ভুচ্ছ ক'রেই ইতিহাস রচিত হ'ল। চাষীরা আদেশপত্রের ধারাকে

অগ্রাহ্য ক'রে স্বেচ্ছাসঘলধারায় জমিদারের জমি কেড়ে নিল এবং নিজেদের ভিতর সে জমি ভাগাভাগি ক'রে বসল। চাষীদের অধিকৃত জমিতে প্রবর্তিত হ'ল ব্যক্তিগত চাষপ্রথা, সমষ্টিগত বা যৌথ চাষপ্রথার প্রচলন বড় দেখা গেল না। রাষ্ট্রকে অনেকটা অসহায়ভাবেই এই ভাঙা-গড়ার কাজে সায় দিয়ে যেতে হ'ল।

ব্যক্তিগত চাষপ্রথা প্রবর্তনের—এবং রাষ্ট্রপরিচালিত ও সমষ্টিগত চাষপ্রথার অপ্রচলনের—এই ইতিহাস উল্লেখযোগ্য; কারণ জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের পর ব্যক্তিগত চাষপ্রথার প্রবর্তনের ফলেই এমন কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হ'ল যে-সমস্যা সমাধানের বিবিধ প্রচেষ্টাতেই ১৯২৯ পর্যন্ত সোভিয়েট কৃষিনীতির পুনঃপুনঃ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম সমস্যা, উদ্বৃত্ত-খাদ্যশস্য-সংগ্রহের সমস্যা। জমিদারদের জমি অসংখ্য কৃষকের ভিতর ভাগ হ'য়ে যাওয়াতে অনেক বড় বড় ক্ষেতখামার লোপ পেয়ে যায়, আর তার পরিবর্তে সৃষ্টি হ'য়েছে অসংখ্য ছোট ছোট ক্ষেতের। বড় বড় ক্ষেতের তুলনায় ছোট ছোট ক্ষেতে উদ্বৃত্ত উৎপন্নের পরিমাণ শুধু সামষ্টিক হিসাবেই কম নয়, আনুপাতিক হিসাবেও কম। কাজেই ব্যক্তিগত চাষপ্রথা প্রবর্তনের পর উদ্বৃত্ত শস্য যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন হ'য়ে উঠল। দ্বিতীয় সমস্যা কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নিয়ে। কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হ'লে বৈজ্ঞানিক চাষপ্রণালীর প্রবর্তন প্রয়োজন; আর বৈজ্ঞানিক চাষপ্রণালী চালু করতে হ'লে বড় আয়তনের ক্ষেতের প্রয়োজন; ছোট ছোট ক্ষেতে উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রবর্তন অনেক সময়ে অনেকটাই অসম্ভব। তৃতীয় সমস্যা "কুলক"শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রে। বিত্তবান চাষীদের নিয়ে কুলকশ্রেণী। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই—বিশেষ ক'রে বিশশতকের প্রথম ভাগে—কুলকশ্রেণী ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠি হিসাবে বেড়ে উঠছিল। জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদের পর রাষ্ট্রপরিচালিত চাষপ্রথার প্রবর্তন হ'লে কুলকশ্রেণীও অবলুপ্ত হ'ত জমিদারশ্রেণীরই সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কার্যতঃ এসব কিছুই হ'ল না; ব্যক্তিগত চাষব্যবস্থায় কুলকশ্রেণীর স্থান অক্ষুণ্ণ থেকে গেল। পরবর্তী বেশ কিছুকাল কম্যুনিষ্টদল ও নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রের চোখে এই অনবলুপ্ত কুলকশ্রেণী সমস্যা হিসাবেই রয়ে গেছে। সমস্যা তিনটির জটিলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে, পরবর্তী বারো বছরে বার বার দেখা গেছে যে এই তিন সমস্যার কোনো একটির প্রতি দৃষ্টি রেখে যে-নীতিই গ্রহণ করা গেছে তাতেই অপর সমস্যা দু'টি—বা এদের কোনো একটি—আরও উৎকট হ'য়ে উঠেছে। উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার হ'বে। বিপ্লবের পর যে-সমস্যা সবচেয়ে কঠিন আকারে দেখা দিয়েছিল সে হ'ল উদ্বৃত্ত শস্যসংগ্রহের সমস্যা। উদ্বৃত্ত শস্যসংগ্রহের উপরই সৈন্যবাহিনী, শিল্পে নিযুক্ত মজুরশ্রেণী ও অন্যান্য সহরবাসীদের অন্নের সংস্থান নির্ভর করছিল। উদ্বৃত্ত শস্যসংগ্রহের উপায়-উদ্ভাবন বিপ্লবোত্তর যুগের অতি জরুরী কাজ হিসাবে স্বীকৃত হ'ল; উপায় অবিলম্বে উদ্ভাবিত এবং প্রযুক্তও হ'ল; কিন্তু শস্যসংগ্রহের এই

বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োগেই শস্যোৎপাদনের সমস্যা আরও গুরুতর হ'য়ে উঠল। কি ক'রে এ হ'ল দেখা যাক।

উদ্বৃত্ত সকল শস্য রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনবার জন্য বিপ্লবের পরেই নিয়ম হয়েছিল যে শস্য নিয়ে বেচা-কেনা চলবে না। শস্য বিক্রী করাটা বাধ্যতামূলক নয়; কিন্তু চাষী যদি শস্য বিক্রী করতে চায় তার একমাত্র ক্রেতা হবেন রাষ্ট্র। গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের সংকটজনক পরিস্থিতিতে ১৯১৮ সাল থেকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার প্রচলন হ'ল, আর সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহের নিয়ম আরও কঠিন হ'ল। স্থির হ'ল যে উদ্বৃত্ত সমস্ত শস্য চাষীকে বাধ্যতামূলক ভাবে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতেই হ'বে। প্রথমে কয়েকটি শস্য সম্বন্ধেই এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু তাতে ফল দাঁড়াল এই যে যে-সব শস্য সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে সে-সব শস্যের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে অন্যান্য শস্যের উৎপাদনেই চাষীরা আগ্রহশীল হয়ে উঠল। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক শস্যসংগ্রহ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করবার জন্য অধিকাংশ শস্যের ক্ষেত্রেই বাধ্যতার নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে হ'ল। এতে কিন্তু উৎপাদনের সমস্যা আরও উগ্র হ'য়ে উঠল। ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর ভিতর শস্যোৎপাদন বহুপরিমানে কমে গেছে, আর তার অন্যতম প্রধান কারণ বাধ্যতামূলক শস্যসংগ্রহ ব্যবস্থা। মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১৯১৭-তে ছিল ৩৬৪ কোটি "পুড্", আর ১৯২১-এ এসে দাঁড়াল ১৬৯ কোটি "পুড্"-এ—অর্থাৎ আগেকার পরিমাণের অর্দ্ধেকে। কৃষকদের ভিতর যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়ে উঠছিল; কাজেই রাজনৈতিক কারণেও, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর ভিতর সহযোগ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, বাধ্যতামূলক শস্য-আদায়-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হ'ল।

১৯২১ সালে লেনিনের উদ্যোগেই বাধ্যতামূলক শস্যসংগ্রহের ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল: প্রবর্ত্তন হ'ল শস্যকরের। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী চাষীরা উদ্বৃত্ত-শস্যের একটি বিশেষ অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রকে সমর্পণ করতে বাধ্য; কিন্তু কর অনুযায়ী শস্য সমর্পণের পরও অবশিষ্ট যে-শস্য তাদের হাতে থাকবে নিজেদের ইচ্ছানুসারে সে-শস্য তারা ব্যবহার অথবা বিক্রয় করতে পারবে। শস্যবিক্রয় সম্বন্ধে এই নির্বাধ অনুমতির ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে কতকগুলি বড় পরিবর্ত্তন দেখা গেল। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায়—১৯১৮ থেকে ১৯২১ অবধি—অবাধ বেচা-কেনা ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়, এবং বাজার-মাধ্যমে বিনিময়ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রের মাধ্যমে বণ্টনব্যবস্থার প্রচলন হয়। মুদ্রার ব্যবহারও সেই সঙ্গে অপ্রচলিত হ'য়ে পড়ে; ১৯২১ সালে শস্যকর প্রবর্ত্তিত হবার পর চাষীদের উদ্বৃত্ত শস্যের বিক্রয়স্থল হিসাবে অবাধ ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দ্রগুলি আবার সক্রিয় হ'য়ে ওঠে; সেই সঙ্গে মুদ্রারও পুনরাবির্ভাব

ঘটল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও কাঁচামালের সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করে অবাধ ক্রয়কেন্দ্রগুলির উপর নির্ভরশীল হ'তে লাগল। এমনি ক'রে "অর্থনৈতিক নব্যব্যবস্থা"র পত্তন হ'ল।

অর্থনৈতিক নব্য-ব্যবস্থার যুগে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন বাধ্যতামূলক শস্য-আদায়-ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হ'ল, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত চাষে লাভের অনুকূল কয়েকটি নূতন আইনও প্রবর্তিত হ'ল; উদাহরণ স্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিনিয়োগ লাভজনক করবার উপযোগী আইনের প্রচলন। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে-ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'ল তারই ফলে আবার উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহের সমস্যা কঠিন হ'য়ে উঠল; আর কম্যুনিষ্টদলের চোখে আরও বেশী আশঙ্কার কারণ হ'য়ে দাঁড়াল নব্যব্যবস্থার ফলে কুলক-শ্রেণীর সমৃদ্ধিবৃদ্ধি।

উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহের সমস্যা কঠিন হ'য়ে উঠবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। উৎপন্ন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি না-পাওয়াতে শস্যের তুলনায় শিল্পদ্রব্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। ফলে চাষীরা শিল্প দ্রব্যের পরিবর্তে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রী করতে ক্রমশই অনিচ্ছুক হ'য়ে উঠল। এ-সমস্যার সমাধান অবশ্য অসম্ভব ছিল না, সমাধান অনেকটা হয়েও এসেছিল; সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের পথেই সমস্যার সমাধান দেখা দিচ্ছিল।

দুর্ভোগের সৃষ্টি হ'ল কুলকশ্রেণীকে নিয়ে। অর্থনৈতিক নব্যব্যবস্থা কুলক-শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির অন্তরায় ছিল না, বরং সহায়কই ছিল; আর কুলকশ্রেণী কম্যু-নিষ্টদলের অন্যতম প্রধান শ্রেণীশত্রু। অমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাই কুলকশ্রেণীর সমৃদ্ধির ভিত্তি; কাজেই কুলকশ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাসী, এবং এ-হিসাবে সমাজতন্ত্রের বিরোধী। এই কুলকশ্রেণীর সমৃদ্ধিবৃদ্ধি সোভিয়েট সরকার বিপজ্জনক বিবেচনা করলেন। কুলকশ্রেণীর শক্তিহ্রাসের জন্য ১৯২৬-২৭ সাল থেকে নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'ল। কুলকদের উপর উঁচু হারে কর বসলো; সমবায় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ধনী চাষীদের অর্থাৎ কুলকদের, বিরুদ্ধে দরিদ্র চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা সুরু হল; কুলকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রব উঠলো "গরীব চাষীকে নিয়ে, মাঝারি চাষীর সহযোগিতায়, উৎপীড়ক চাষীর বিরোধিতায়"। কুলকশ্রেণীও সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ সুরু ক'রে দিল। ফলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহও আবার কঠিন হয়ে উঠল—কারণ ধনী চাষীদের বড় ক্ষেতেই উদ্বৃত্ত শস্য অনুপাতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যেত।

অবস্থার জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনও প্রবল হ'ল। দু'ধরণের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল; ব্যক্তিগত চাষপ্রথা বজায় রেখে এবং কুলকশ্রেণীর সমৃদ্ধিকে মেনে নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহের উপযোগী কর্মপন্থা

গ্রহণ করা যেত, অথবা ব্যক্তিগত চাষপ্রথার ও সেই সঙ্গে কুলকশ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে যৌথ চাষ ব্যবস্থার ভিত্তিতে কৃষি-উন্নয়নের নূতন নীতি অবলম্বন করা যেত। কুলক-শ্রেণীর স্বার্থিত্ব ও সমৃদ্ধি মেনে নিলে ব্যক্তিগত চাষপ্রথা মূখ্যত বজায় রেখেই—এবং কিছুটা সমবায় ব্যবস্থার উপর নির্ভর ক'রে—শস্যের উৎপাদন বাড়ানো যেতো বটে, কিন্তু সমষ্টিগত কৃষি ব্যবস্থার আশ্রয়ে উৎপাদন যত দ্রুততালে বাড়াবার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল না। আর কৃষিজাত কাঁচামালের সরবরাহের উপর শিল্পের প্রসার নির্ভরশীল, কাজেই. ব্যক্তিগত চাষপ্রথা চালু রাখতে হ'লে পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায়—১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা গৃহীত হয়—শিল্পের প্রসারকে দ্রুততাল থেকে হয় তো খানিকটা মন্দতালে নামিয়ে আনতে হ'ত। ("হয় তো" বলছি এই জন্য যে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার যুগে কৃষিজ উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি না-পাওয়া সত্ত্বেও শিল্পের দ্রুত প্রসার শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়েছিল।) অন্যদিকেও ভাববার বিষয় ছিল। ব্যক্তিগত চাষপ্রথার বিলোপ ঘটাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে কুলকশ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্র-শক্তির সংগ্রাম অনিবার্য্য এবং এ-সংগ্রামে প্রচুর দুঃখকষ্ট ও বৈষয়িক ক্ষতি দু'য়েরই সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। আর স্বাধীন সমাজব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে যাঁরা বিশ্বাসী কৃষির বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই অসামান্য প্রসারে তাঁদের অস্বস্তি বোধ করার বিশেষ কারণ ছিল। এই বিভিন্নমুখী চিন্তার আকর্ষণে কৃষিসম্পর্কিত নীতি নিয়ে মতবিরোধ স্বাভাবিক; বিরোধ দেখাও দিয়েছিল, ১৯২৭-২৮-এ তীব্রভাবেই। একদিকে ছিলেন বুখারিন ও তাঁর মতাবলম্বীরা, এঁরা ব্যক্তিগত চাষপ্রথা চালু রেখে কুলকশ্রেণীর সমৃদ্ধিকে স্বীকার ক'রে, উৎপাদনবৃদ্ধির উপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। অপরদিকে চরমপন্থী মতাবলম্বীদের নেতা ছিলেন ট্রট্স্কি, এঁরা অচিরাৎ ব্যক্তিগত চাষপ্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমষ্টিগত চাষপ্রথা প্রবর্ত্তনে উৎসাহী। ষ্ট্যালিন ছিলেন সমষ্টিগত চাষপ্রথারই সমর্থক; ট্রট্স্কির আপোষহীন অসহিষ্ণু নীতি ষ্ট্যালিন-পন্থীদের বিচারে অনাবশ্যকভাবে উগ্র। ষ্ট্যালিনপন্থীদের মতানুযায়ীই ১৯২৭-২৮ সালে কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হ'ল। অবিলম্বে ব্যক্তিগত চাষপ্রথার বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল না; কিন্তু যৌথ চাষপ্রথার ক্রমপ্রসারের চেষ্টা চললো, এবং কুলকদের শক্তিহ্রাসের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল।

এদিকে সরকারের বিরুদ্ধে কুলকদের প্রতিকূলতাও ১৯২৮-এ স্পষ্ট এবং তীব্র হয়ে উঠল। এই প্রতিকূলতার ফলে শস্যোৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পের সম্প্রসারণ কঠিন হ'য়ে উঠল। এই অবস্থায় ১৯২৯ সালে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসে তা স্মরণীয় : সিদ্ধান্ত হ'ল যে কুলকশ্রেণীকে সমগ্রভাবে অচিরাৎ উন্মূলিত করা প্রয়োজন।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ১৯১৭-১৮ সালে

ঘটনাক্রম সরকারী অভিপ্রায় অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়নি; কুলকশ্রেণীর উচ্ছেদের নীতি সরকারীভাবে গৃহীত হবার পর ১৯২৯—৩০ সালেও ঘটনার ধারা ঠিক রাষ্ট্রনেতাদের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হ'ল না। ১৯২৯-এ এবং '৩০-এর প্রথমভাগে কুলকদের বিরুদ্ধে যে চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে, মনে হয় রাষ্ট্রনেতাদের তা সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ছিল না। অত্যন্ত দ্রুততালে এ-সময়ে যে অসংখ্য যৌথ ক্ষেতখামারের সৃষ্টি হ'য়েছে সুষ্ঠু পরিচালনার সম্বল নিয়ে সেগুলি অগ্রসর হয়ে নি। ফলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ দুই-ই প্রকট হয়েছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌথচাষবিরোধী, এমন কি সোভিয়েট-বিরোধী, ব্যাপক বিক্ষোভও দেখা গিয়েছিল।

এই অবস্থাতেই ষ্ট্যালিন ১৯৩০-এর মার্চমাসে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা ও প্রবন্ধে যৌথচাষ আন্দোলনকারীদের আরও বিবেচনার সঙ্গে ধীরভাবে কাজ করবার আবেদন জানান। স্থির হ'ল যে, ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা পরিত্যাগ ক'রে সম্পত্তিমূলক ব্যবস্থায় যৌথচাষের প্রসার সাধন করতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুলকদেরও যৌথ ক্ষেতখামারগুলির সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে। আরও স্থির হ'ল যে যৌথ ক্ষেতখামারগুলি প্রধানতঃ হ'বে "আর্টেল"-জাতীয়। আর্টেল"-গুলিতে প্রত্যেক চাষীর জমির প্রধানাংশ যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হ'লেও একাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেও রাখা চলে, বাড়ীঘর এবং ঘরসংসারের কাজে প্রয়োজনীয় দু'একটি গরু এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই থেকে যায়। সামগ্রিক যৌথত্বের প্রচলন শুধু "কম্যুন্"গুলিতে; "কম্যুন্"গুলি সংখ্যায় নগণ্য।

ষ্ট্যালিনের বক্তৃতার পরও যৌথচাষের প্রসার বন্ধ হয় নি, বরং এগিয়েই চলেছে। ১৯৩২-এর শেষে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা যখন সম্পূর্ণ হ'ল তখন আবাদী জমির প্রায় চার-পঞ্চমাংশে যৌথ চাষপ্রথা প্রবর্তিত হ'য়েছে।

অথচ ১৯৩২-পর্য্যন্ত শস্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি; বরং যৌথ আন্দোলনের প্রথম যুগে, বিশেষত ১৯৩০-৩১ সালে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বিশেষভাবেই কমে যায়। এই উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আন্দোলনের প্রথম যুগে নির্য্যাতিত ও বিক্ষুব্ধ কুলকশ্রেণী লক্ষ লক্ষ গরু এবং অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রাণনাশ করে। তা ছাড়া এ-যুগে আরও অনেক গরু ও অন্যান্য জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটেছে যৌথ ক্ষেত-খামারগুলিতে উপযুক্ত যত্নের অভাবে। এই ক্ষতি পূরণ হ'ত যদি এ সময়ে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রচুর সংখ্যায় ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেত; কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে যথেষ্ট সংখ্যায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। ফলে আবাদী জমির আয়তন ও উৎপাদন শক্তি দুই-ই হ্রাস পেয়েছে।

পরবর্ত্তী যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা, যৌথ ক্ষেত-খামারের উৎপাদনশক্তি ও পরিচালনাদক্ষতা বাড়াবার জন্য আইনকানুনের প্রবর্ত্তন। নূতন ব্যবস্থার ফলে ক্ষেত-খামারগুলির প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এ-যুগে প্রবর্ত্তিত নূতন ব্যবস্থা ও আইন-

কারুনের দু'একটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানসম্পর্ক কর্মপদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কুশলীকর্মী এ-যুগে বহু সংখ্যায় তৈরী হয়েছে। কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় গরু-ঘোড়া ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা হয়েছে যে প্রত্যেক খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি, সম্ভব তিনটি, পশুরক্ষণক্ষেত্র থাকা চাই। কৃষিক্ষেত্রের আয়তনে গুরুতর বৈষম্যদূর দূর ক'রে সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে। পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণের নিয়মও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। প্রথমযুগে যৌথচাষপ্রথায় বিভিন্ন কৃষক পরিবারেরা অনেকটা প্রয়োজনের অনুপাতে পারিশ্রমিক লাভ করত; যে-পরিবারের সভ্যসংখ্যা বেশী সে-পরিবারকে প্রয়োজন অনুযায়ী মোট পারিশ্রমিকও বেশী দেওয়া হ'ত। পরে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিকদানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হ'ল; সভ্যসংখ্যার অনুপাতে নয়, কৃতকর্ম্মের পরিমাপ অনুযায়ী, বিভিন্ন পরিবারের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা গৃহীত হ'ল। কাজে উৎসাহ বাড়াবার জন্যই এই নূতন ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানবাহিনীর আক্রমণে রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থার অসামান্য ক্ষতি হয়েছে। রাশিয়ার যে অংশ জার্মানবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে সে-অংশেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বহু শ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রের অবস্থান। সাইবেরিয়ায় নূতন চাষ-আবাদ সুরু হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ায় কৃষি ব্যবস্থার যুদ্ধকালীন ক্ষতিকে কোনোমতেই সামান্য বলা চলে না।

যুদ্ধের পর চতুর্থ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সুরু হয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী এই কয়েক বৎসরে কৃষির দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। ১৯৫০ সালে কৃষিজ সামগ্রীর মোট উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব্বাব্দের মোট উৎপাদনের চেয়ে বেশী।

কিছুদিন আগে সংবাদ পাওয়া গেছে যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ ক্ষেতখামার-গুলিকে আয়তনে বৃহত্তর করবার চেষ্টা চলেছে। ফলে প্রচলিত গ্রামীণ সমাজে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হলে গ্রামগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষীণ হ'য়ে পরস্পর-নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। সংবাদ সত্য হ'লে এতে সোভিয়েট চাষপ্রথার বিবর্ত্তনে এক নূতন অধ্যায়ারম্ভের সূচনা মেলে। ব্যক্তিগত চাষপ্রথার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যবস্থা থেকে সোভিয়েট কৃষি আজ ধাপে ধাপে বহুদূর সরে এসেছে।

১৯১৮ সালে বড়-আকারের প্রায় সব শিল্পই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল, আর ১৯২০ সালে ছোট ছোট শিল্পগুলি অবধি ব্যক্তিগত মালিকানার গণ্ডি-বহির্ভূত হ'ল। অথচ কম্যুনিষ্ট নেতাদের অধিকাংশেরই অক্টোবর বিপ্লবের পরই ছোট-বড় সমস্ত শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার ইচ্ছা ছিল না; লেনিনের তো সে ইচ্ছা ছিলই না। লেনিন বলেছিলেন যে নূতন সাম্যবাদী ব্যবস্থা হঠাৎ চালু করবার প্রয়োজন নেই, ক্রমে ক্রমে সে-ব্যবস্থার দিকে এগুনোই নূতন সরকারের নীতি।

বিপ্লবের পর প্রথম আট মাস এই নীতি অনুযায়ীই কাজ চালাবার চেষ্টা হয়।

১৯১৮ সালের মে-মাস পর্যন্ত কোনো গোটা শিল্পই জাতীয় সম্পত্তি ব'লে নির্দ্দিষ্ট হয় নি, যদিও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানে জাতীয় অধিকার হ'য়েছে। অধিকাংশ শিল্পে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানেই এ সময়ে সরাসরি সরকারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত না-হ'য়ে বরং মালিক ও মজুরের এক ধরণের দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থায় ফ্যাক্টরীর পরিচালনা অংশত মালিক ও ম্যানেজারের হাতে, অংশত শ্রমিক সংগঠিত ফ্যাক্টরী-সমিতিগুলির হাতে। ১৯১৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তন করবার উদ্দেশ্যে এক আজ্ঞপ্তি প্রচারিত হ'ল। নূতন শাসন ব্যবস্থা কিন্তু কার্য্যকরী হ'ল না নানা কারণে। শিল্প পরিচালনায় নূতন ব্যবস্থায় মালিক ও মজুরগোষ্ঠীর ভিতর ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি চলে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক সমিতিগুলি রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়াই, ও সরকারী অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই, ফ্যাক্টরী অধিকার ক'রে বসে। ফ্যাক্টরী অধিকার করবার পর শ্রমিক সমিতিরা কিন্তু শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে পারদর্শিতার পরিচয় দেয়নি, অপারদর্শিতাই দেখিয়েছে।

শ্রমিক সমিতিগুলি যখন ফ্যাক্টরী পরিচালকদের তাড়িয়ে একের পর এক বহু ফ্যাক্টরী নিজেদের হস্তগত করছিল, সোভিয়েট সরকার তখন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার এই অকাল মৃত্যুতে উৎফুল্ল হ'ন নি, বরং শ্রমিক সমিতির এই বে-আইনী কাজে কিছুটা বাধা দিতেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই ব্যক্তিগত মালিকানা সম্বন্ধে সরকারী নীতিরও বদল হ'ল, এবং শিল্পের পর শিল্প সরকারী নির্দ্দেশেই জাতীয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হ'ল। জাতীয়করণ সম্বন্ধে এই নীতি পরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ ছিল। প্রধান কারণ, বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের সংকটজনক পরিস্থিতি।

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় শিল্পের পর শিল্পে সরকারী পরিচালনা প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থনৈতিক ফল ভাল হ'য়েছে বলা যায় না। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সালের ভিতর শিল্পজাত উৎপাদন কমে গেছে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে। এই তিন বছরে মোট উৎপাদন শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ কমে যায়; আর উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পায় বড় বড় শিল্পগুলিতে যেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোরতম। সরকারী নিয়ন্ত্রণের অপারদর্শিতা নিশ্চয়ই শিল্পের উৎপাদন-হ্রাসের একমাত্র কারণ ছিল না, অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নিঃসন্দেহে। বড় বড় শিল্পে "গ্লাভকি" নামে পরিচিত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা প্রবর্ত্তিত হয়, অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনতা এই গ্লাভ্‌কির অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য, ছোট ছোট শিল্পে স্থানীয় "গাব্‌সোভ্‌নারুহোজি"র পরিচালনা, আর মাঝারি শিল্পে গ্লাভকি ও গাব্‌সোভ্‌নার-হোজির যুক্ত পরিচালনার প্রবর্ত্তন হয়। বড় শিল্পগুলিতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের চাপে, এবং মাঝারি শিল্পগুলিতে গ্লাভ্‌কি ও গাব্‌সোভনারহোজির দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বে বিশৃঙ্খলা ও দক্ষতাহানি প্রচণ্ডভাবেই দেখা দেয়।

১৯২১ সালে অর্থনৈতিক নব্যনীতির প্রচলনের সাথে সাথে শিল্পপরিচালনায়ও নব্য ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ছোট ছোট কতকগুলি শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। মাঝারি ও বড় শিল্পগুলি অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানার গণ্ডিবহির্ভূতই থেকে গেল; কিন্তু এ-সব শিল্পেও কর্ম ও পরিচালনাপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় একদিকে যেমন চাষীদের বাধ্যতামূলকভাবে উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্য সরকারী জিম্মায় তুলে দিতে হ'ত, অন্যদিকে তেমনি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে শস্য ও অন্যান্য কাঁচামালের জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকতে হ'ত। অর্থনৈতিক নব্যনীতির যুগে এই নির্ভরতার অবসান হ'ল; অবাধ ক্রয়কেন্দ্রগুলি থেকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগাড় করবার স্বাধীনতা পেল। (এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেই সে ব্যতিক্রম প্রযোজ্য।) সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনার ব্যাপারেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনেক পরিমাণে শিথিল হ'ল। স্থির হ'ল, শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার শুধু সাধারণ নীতি নির্ধারণ করবেন, পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া হ'ল "ট্রাষ্ট্"-নামে এক নূতন ধরণের প্রতিষ্ঠানের হাতে। কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি ট্রাষ্ট্; ট্রাষ্টের একটি পরিচালনা-সমিতি থাকত, আর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হতেন এই পরিচালনা সমিতির পক্ষ থেকে। ট্রাষ্টের পরিচালনায়, ট্রাষ্ট্-নিযুক্ত ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে, শাখ-লোকসানের ব্যবসায়ী নিয়মানুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজ-কারবার নির্বাহ হ'ত। যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় এই নূতন ব্যবস্থায় শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ সুস্পষ্ট।

অবাধ ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দ্রগুলির সাথে সাথেই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব হ'ল। ১৯২১-এর পরবর্তী যুগে এরা "নেপম্যান" নামে সুপরিচিত। ১৯২৩ সালের পর থেকে নানা কারণে এই নেপম্যান্-দের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেবার সরকারী প্রচেষ্টা সুরু হ'ল, এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের স্থলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও সমবায়ী ব্যবসায়ের প্রবর্তন আরম্ভ হ'ল।

১৯২৬-এর পর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি পরিবর্তনের একটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক নব্যনীতির যুগে কৃষিজ দ্রব্যের তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এ-অবস্থায় সরকার শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তারই অঙ্গহিসাবে সমবায় ব্যবসায়ের প্রচলন সুরু হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের সরকারী চেষ্টা পরিণামে ভালই হয়েছিল; উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস সত্ত্বেও যাতে কারবার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ-জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি খরচ কমাবার চেষ্টায় মনোযোগী হয়, এবং এ-চেষ্টায় শিল্পপরিচালনার নানা ত্রুটি ও শৈথিল্য দূর হয়।

বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োগে সোভিয়েট সরকারের আগ্রহপ্রদর্শন অর্থনৈতিক নব্যনীতির যুগের একটি স্মরণীয় ব্যাপার। বৈদেশিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কিন্তু সোভিয়েট সরকারের আগ্রহান্বিত আবেদনে সাড়া দেয় নি। ১৯২১-২২ সালে কিছু বিদেশী মূলধনের সাহায্য পাওয়া গেছে; কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য। ১৯২২ সালে জেনোয়াতে এবং '২৩ সালে লণ্ডনে সোভিয়েট সরকার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য আবেদন জানান; কিন্তু বিদেশী সরকারেরা ঋণ দিতে শেষ পর্যন্ত সম্মত হয় নি। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য ছাড়াই বা যৎসামান্য সাহায্যসহ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক গঠনকর্মের যে-বিপুল প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হ'তে হয় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

এ-যুগের আরও একটি লক্ষণীয় ঘটনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাযন্ত্রের ক্রমোন্নতি। লেনিন প্রথম থেকেই অর্থনৈতিক গঠনকর্মে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ ও প্রসারের প্রয়োজন জোরের সঙ্গে জানিয়ে গেছেন। ১৯২১ সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমিতি বা "গস্‌প্লানে"র সৃষ্টি হয়; বৈদ্যুতিকশক্তির বিস্তৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক গঠনকর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৯২২ সালে সমিতির প্রধান কাজ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির কল্পনা কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই পরিত্যক্ত হয়; প্রথমে কয়েক বছর কয়েকটি আংশিক ও বিভাগীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতিতেই মনোযোগ দেওয়া হয়। ১৯২৫ সাল থেকে গস্‌প্ল্যান পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজে উদ্যোগী হয়। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা গ্রহণ যোগ্য আকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার প্রয়োগকাল, ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল। সাড়ে চার বৎসর কালে এই পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমসাময়িক অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের তুলনায় এ-সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যখন ব্যাপক বেকার সমস্যা সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তখন শ্রমশক্তির পূর্ণনিয়োগ সুস্পষ্ট। এ-যুগে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজসামগ্রীর মোট উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়-ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি এবং সামরিক সরঞ্জামের জোগানবৃদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়াতে নিত্যব্যবহার্য্য গৃহস্থালি দ্রব্যসামগ্রীর অকুলান থেকেই যায়। খাদ্যশস্য এবং নিত্যব্যবহার্য্য শিল্পজসামগ্রীর এই অনটনের যুগে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ক্রয়সংকোচের বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। এ-ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার মাঝামাঝিকাল পর্য্যন্ত চালু থাকে।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার যুগে শিল্পজসামগ্রীর উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের উৎপাদিকাশক্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নি। (পরিকল্পনাতিরিক্ত সংখ্যায় মজুর নিয়োগ ক'রে তবেই বহুশিল্পে পরিকল্পনানুযায়ী উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব

হয়েছে।) এ-অবস্থার প্রধান কারণ, মজুরেরা নূতন যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার তাড়াতাড়ি আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে নি। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় তাই যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহারে শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবেই সফল হয়। আশাতিরিক্তভাবে সফল হ'য়েছে এমনও বলা চলে; এজন্য প্রশংসার অধিকারী প্রধানতঃ ষ্টাখানোভ্ আন্দোলন। ইউক্রেনের কয়লার খনিতে আরম্ভ হ'য়ে এই আন্দোলন নানা শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে এবং উৎপাদনে শ্রমিকদের দক্ষতা অভাবিতরূপে বাড়িয়ে তোলে।

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার যুগে নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর সরবরাহ লক্ষ্যনীয়ভাবে বেড়ে যায়, জীবনযাত্রার মান স্বভাবতই বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৪ সালের শেষে ক্রয়সংকোচের বিশেষ ব্যবস্থা তুলে নেওয়া সম্ভব হয়। নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুর উৎপাদন বেশ খানিকটা বাড়লেও কিন্তু পরিকল্পনা-অনুযায়ী বাড়ে নি। প্রধান কারণ মূল পরিকল্পনায় অতিরিক্ত মাত্রায় যুদ্ধের প্রস্তুতিতে জাতীয় সম্পদের নিয়োগ।

১৯৩৮ সালে তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার আরম্ভ; দেশরক্ষার সামরিক ব্যবস্থাপনাই এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৪২ পর্য্যন্ত; কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্ম্মানির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হ'তে পারে নি।

যুদ্ধের প্রথম যুগে জার্ম্মানবাহিনী দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে শিল্পসমৃদ্ধ ইউক্রেণ ও উত্তর ককেশাস্ অঞ্চল দখল ক'রে নেওয়াতে রাশিয়ার শিল্পসম্পদের দারুণ ক্ষতি হয়। জার্ম্মানবাহিনীর ধ্বংসলীলা থেকে শিল্পসম্পদ যথাসম্ভব রক্ষা করবার জন্য এ-সময়ে বহু শিল্প পূর্ব্বাঞ্চলে—উরাল পর্ব্বতাঞ্চলে ও আরও পূর্ব্বে—স্থানান্তরিত করা হয়। যুদ্ধ বাধবার অনেক আগে থেকেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পের পূর্ব্বমুখী প্রসার সুরু হয়েছিল; যুদ্ধের চাপে শিল্পপ্রসারের এই বিশেষ ধারাটি লক্ষণীয়ভাবে এগিয়ে গেছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য যুদ্ধের পর চতুর্থ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়েছে। নূতন পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার মেয়াদ এখনও শেষ হয় নি; কিন্তু ইতিমধ্যেই শিল্পজ সামগ্রীর উৎপাদন পরিকল্পনার শেষ নিশানা অতিক্রম করে গেছে। জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হ'য়েছে। চতুর্থ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ছাড়াও সামরিক প্রস্তুতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আয়োজন আজ কতদূর এগিয়েছে তার সঠিক বর্ণনা সম্ভব নয়।

১৯২৮ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত প্রায় এক-চতুর্থ শতকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনযন্ত্রের কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি পেয়েছে,

ক্ষমতাও বেড়েছে। পরিকল্পনাসমিতি থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন-নিশানা নির্দ্ধারণ ক'রে দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনই প্রত্যেকটি শিল্প পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে কি-না সেদিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখা হয়। এই জটিল এবং সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বাবধানের যোগ্য ক্ষমতা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কর্ণধারদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

(৩)

সোভিয়েট সমাজে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিপ্লবোত্তরযুগে যে-বাক্‌বিতণ্ডা সুরু হয় তাকে অপ্রত্যাশিত বলা চলে না। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকসংগঠনকে কম্যুনিষ্ট দল মুখ্যত শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছে ও প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে ব্যবহার করেছে। বিপ্লবোত্তর যুগে শ্রমিক আন্দোলনের সরকার-বিরোধী ভূমিকার যখন অবসান হ'ল পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম সম্বন্ধে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল। ট্রট্‌স্কি মত প্রকাশ করলেন—এবং কাজের ভিতর দিয়ে এ-মত চালু করলেন—যে নূতন সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি হবে একান্তভাবেই রাষ্ট্রের অনুগত ও আজ্ঞাবহ—যেমন সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রের অনুগত ও আজ্ঞাবহ। অপরপক্ষে টমস্কির অভিমত যে, নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিই হবে শিল্পের প্রধান নিয়ন্তা ও পরিচালক; বিভিন্ন শিল্পে সেই সেই শিল্পের শ্রমিক সমিতির কর্তৃত্ব স্থাপিত হ'লে তবেই নূতন সমাজে শ্রমিকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হ'তে পারে।

১৯২২ সালে শ্রমিক সংঘের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এবং বাক্‌বিতণ্ডার একরকম নিষ্পত্তি ঘটে। গৃহীত নীতির সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে ১৯২২-এর শ্রমিক সংহিতায় (Labour Code) লিপিবদ্ধ আইন কানুনে। শ্রমিক সংহিতার আইন কানুনে শ্রমিক সংঘের সভ্য হওয়া বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; কোনো শ্রমিক নিজ ইচ্ছানুযায়ী সংঘের সভ্য হ'তে বা না হ'তে পারেন। সভ্য হওয়া বিষয়ে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও শুধু সভ্যদেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিশেষ সুবিধার খোঁজ শ্রমিক-সংহিতাতেই মেলে; সভ্য না-হওয়ার অসুবিধা অনেক। কোনো শ্রমিক সংঘকে আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হ'তে হ'লে তাকে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন-সমিতির অনুমোদন লাভ করতে হয়। ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, কেন্দ্রীয়-শ্রমিক-সংগঠন-সমিতির অনুমোদিত কোনো শ্রমিক সংঘের সম্মতিক্রমে পরিচালিত ধর্ম্মঘট যে-আইনী নয়। এই সর্ত্ত অনুযায়ী শ্রমিক ধর্ম্মঘট পরিচালনা করা কঠিন; কত কঠিন তা এ-থেকেই স্পষ্ট হবে যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২২-২৩-এ যে ৫০০টি ধর্ম্মঘটের বিবরণ পাওয়া যায় তার ভিতর ৪৮৯টিই অনুমোদিত ধর্ম্মঘট। ১৯২২

সালের সরকারী নীতি অনুযায়ী একদিকে যেমন শ্রমিকদের দাবী কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করবার এবং শিল্পের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবার অধিকার শ্রমিক সংঘগুলির ন্যায্য অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়, অন্যদিকে তেমনি সরকার ও শিল্পাধিনায়কদের আজ্ঞানুযায়ী কাজ করবার দায়িত্ব শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসাবে নির্দিষ্ট হয়।

১৯২২ থেকে ১৯২৯ পর্য্যন্ত সাত বছরে কয়েকবারই কেন্দ্রীয়-শ্রমিক-সংগঠন সমিতির সভাপতিপদ লাভ করেছেন টম্‌স্কি। শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দাবী নিয়ে আন্দোলন চালানোই টম্‌স্কির নেতৃত্বে শ্রমিক সংঘগুলি তাদের প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। টম্‌স্কি আরও চেষ্টা করেছেন ধনী ও দরিদ্র শ্রমিকদের মজুরীর অসাম্য যথাসম্ভব কমাতে। ১৯২৯ সালে টম্‌স্কি সভাপতিপদচ্যুত হন। পদচ্যুতির পরই টম্‌স্কির অনুসৃত নীতি বর্জ্জিত হয়। ১৯৩১ সালে ষ্ট্যালিন নূতন নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন তাঁর সুবিখ্যাত "ছয় ধারা বক্তৃতায়।"

বক্তৃতায় ষ্ট্যালিন বলেন যে, অতঃপর মজুরীর অসাম্য কমাবার চেষ্টা বন্ধ করতে হবে—কাজে কুশলতাবৃদ্ধির জন্য বরং অসাম্যের বৃদ্ধিই বাঞ্ছনীয়; আর শ্রমিক সংঘগুলির প্রধান কাজ হওয়া চাই সরকারের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন ও শ্রমিকদের ভিতর নিয়মনিষ্ঠার প্রবর্ত্তন। এই বক্তৃতার পরে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দাবী সম্পর্কিত আন্দোলন শিথিল হ'য়ে আসে। শ্রমিকদের ন্যায্য ছুটি কেড়ে নেওয়া হ'য়েছে, অথচ কোনো শ্রমিক প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ জানায় নি, এমন উদাহরণ বার বার দেখা গেছে। শ্রমিকদের কাজের অবস্থার ও থাকবার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে শ্রমিক সংঘগুলি স্পষ্টতই উৎসাহের অভাব দেখিয়েছে। শ্রমিকদের নিয়মনিষ্ঠা বাড়াবার কাজে সরকার ও শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান দুই-ই মনোযোগী হ'য়ে উঠেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে বিধিবদ্ধ এক আদেশপত্রের উল্লেখ করা যায়। এই আদেশপত্র অনুযায়ী, বিশ মিনিটের বেশী দেরী ক'রে কাজে এলে সেটা অনুপস্থিতির সামিল ব'লে ধর্ত্তব্য, কোনো শ্রমিক যদি সঙ্গত কারণ ছাড়া দু' মাসে চারবার কাজে অনুপস্থিত থাকেন তবে তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করা বিধেয়, কর্ম্মচ্যুত করা না হ'লে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আইন-অনুসারে দণ্ডনীয়। ১৯৩১-এর পর যদিও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, শ্রমিক সংঘের গণতান্ত্রিক কর্ম্ম-প্রক্রিয়ার কিন্তু অনিয়মেরই প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ ক'রে নিয়োগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনো শূন্যপদ পূর্ণ করা হ'য়েছে; কোথাও-বা নির্ব্বাচনের পরেও নির্ব্বাচনের ফলাফল উপেক্ষা ক'রেই উপর থেকে কর্ম্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এ-সব অগণতান্ত্রিক ঘটনের প্রতি নানাভাবেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'য়েছে; ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনসমিতির সম্পাদক তাঁর বিবরণীতে

একাধিক গণতন্ত্র-বিরোধী বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন। ক্রমে ক্রমে এসব বিচ্যুতি দূর করবার চেষ্টাও হয়েছে। তবু একথা সহজেই বলা চলে যে ১৯২৯ সালে টমস্কির পদচ্যুতির পর শ্রমিক সংগঠন বিষয়ে যে নূতন নীতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হ'য়েছে তাতে শ্রমিক আন্দোলনে গণতান্ত্রিক আদর্শের স্থান সঙ্কুচিত হ'য়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে স্বভাবতই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা আরও সীমাবদ্ধ হ'য়েছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, যুদ্ধের সময়ে সব দেশেই রাষ্ট্রের অধিকারের বিস্তৃতিতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠির অধিকার সংকীর্ণ হ'য়ে থাকে।

যুদ্ধোত্তর যুগে যে-সব নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হ'য়েছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে শ্রমিক সংঘগুলিকে সুদক্ষভাবে ব্যবহার করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি, শ্রমিকদের উৎপাদন-শক্তি বেড়েছে, এবং শ্রমিকদের সহায়তায় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সাফল্যের পথে চলেছে। যুদ্ধকালীন কয়েক বছরে শ্রমিক-স্বাধীনতার পরিপন্থী যে-সব বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে, যুদ্ধোত্তর যুগে সে-সব ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে সামরিক শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে আজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল যুদ্ধোত্তর যুগেও সে আজ্ঞপ্তি কার্য্যকরী আছে। উনিশ শ সতেরোর পর গণতান্ত্রিক শ্রমিক-আন্দোলনের যে-আদর্শ নিয়ে টমস্কিপন্থীরা এগিয়ে এসেছিলেন, অবস্থার চাপে ও নীতির পরিবর্ত্তনে উনিশ-শ পঞ্চাশে সে আদর্শ লুপ্তপ্রায়।

(৪)

১৯২৩ সালের পর থেকেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির ক্রমবিস্তৃতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৩-এর পর "নেপম্যানের" ক্রম বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার নিরঙ্কুশ হ'য়েছে, বহির্বাণিজ্য প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল; ১৯২৮ সালে পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার আবির্ভাবের পর শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার পূর্ণতা লাভ করেছে; ১৯২৯-এর পর কুলক শ্রেণীর উচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রপরিচালিত যৌথচাষ প্রথার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার সুব্যাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ১৯৩১-এ ষ্ট্যালিনের বিখ্যাত বক্তৃতার পর শ্রমিক আন্দোলনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হয়েছে। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে; কৃষিজ, শিল্পজ ও সামরিক সম্পদ নিঃসন্দেহে বেড়েছে। আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদন যে আজও অনেক কম এতে সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হয়

না; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নতির বিলম্বিত আয়তন এ-জন্য প্রধানত দায়ী।- ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ছাড়াও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনবৃদ্ধির অন্যপথ ছিল কি-না এ-প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র। আর সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে ক্ষমতার আত্যন্তিক কেন্দ্রীকরণের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ফলাফলও বিশেষ-ভাবে বিবেচ্য।

ইতিহাসে মিথ্যা অপবাদ

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও ঘটনা সম্বন্ধে একটা ধারণা একবার দাঁড়াইয়া গেলে তাহার হাত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ধারণাটা ক্রমে এমন বদ্ধমূল হইয়া বসে যে ঐতিহাসিকগণ নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সহজে শিথিল করিয়া তুলিতে পারেন না। বক্তিয়ার খাল্‌জীর মাত্র সতের জন অশ্বারোহীর সাহায্যে নদীয়া বিজয়ের কথা লইয়া এযাবৎ অনেক গবেষণা হইয়াছে। নানা দিক হইতে ইহার অযাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু তথাপিও এই কৃত এখনও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। অন্ধকূপ হত্যার আদ্যন্তবী কাহিনী ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে একপ্রকার মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও এবং সত্যাগ্রহের সাহায্যে Holwell স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও সিরাজদ্দৌলার এই মিথ্যা অপবাদ যে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রকারের অপর একটি কৃতের বিষয়েই আলোচনা করিব।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পূজার ছুটীতে লাহোর কোর্ট দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ঘুরিয়া ফিরিয়া কোর্টের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধিক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহারাজার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই একটি নাতিবৃহৎসমাধি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সেখানে একটি গুম্বজদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে দেখিলাম। রণজিৎ সিংহের সমাধি দেখা হইয়া গেলে পর ঐ গুম্বজদ্বারার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক শিখ ভদ্রলোককে রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়ক্ সিংহ ও পৌত্র নৌ নিহল সিংহের সমাধি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আগ্রহ সহকারে আমায় ঐ দুইটি সমাধির নিকট লইয়া গেলেন। পাশাপাশি সমাধি দুইটি রহিয়াছে দেখিলাম। আমি সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে নৌ নিহল সিংহের আকস্মিক মৃত্যু যেখানে ঘটিয়াছিল সেই স্থানটি তিনি আমায় দেখাইয়া দিতে পারেন কি না। তিনি সে কথার কোনও জবাব না দিয়া আমাকে নউ নিহল সিংহের

মৃত্যুকাহিনী বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই বলিলেন যে তৎকালীন উজীর ডোগ্রা রাজা ধীয়ান সিংহই কৌশল করিয়া কুমার নৌ নিহল সিংহের মৃত্যু ঘটাইয়া ছিলেন। এ বিষয়ে আমার কতকটা পড়াশুনা ছিল সুতরাং বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এখানেও একটি ভূত আসর জমাইয়া বসিয়াছে, তাহাকে সহজে সরান যাইবে না। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া একাকীই নৌ নিহল সিংহের মৃত্যুস্থানের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গেলাম।

কথাটা একটু খুলিয়া বলিতে হইতেছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুন তারিখে রণজিৎ সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার পুত্র খড়ক্ সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু খড়ক্ সিংহের এই গুরুভার বহনের কোন যোগ্যতাই ছিল না। Honigbberger নামক একজন অষ্ট্রিয়ান শিখ-সরকারে চাকুরী করিতেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার, তাহার চাকুরী ছিল গোলাবারুদের কারখানায়। সে যাহাই হউক, Honigbberger লিখিয়াছেন যে অধিকাংশ সময়ই খড়ক্ সিংহ অহিফেনের নেশায় বুঁদ্ হইয়া থাকিতেন এবং সমসাময়িক অন্যান্য লেখকেরাও তাহার অপদার্থতা সম্বন্ধে একপ্রকারের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং খড়ক্ সিংহের সিংহাসনারোহণের পরেই এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। শীঘ্রই খড়ক্ সিংহ তাহার অনুগ্রহভাজন কতিপয় ধূর্ত ভাগ্যান্বেষীর খপ্পরে পড়িয়া গেলেন। ইহাদের প্রধান ছিল চেৎ সিংহ নামে এক সর্দার এবং শীঘ্রই বুঝা গেল যে ইনি ধীয়ান সিংহকে সরাইয়া উজীরের পদ অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। স্বভাবতঃই ধীয়ান সিংহ আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হইলেন। এদিকে খড়ক্ সিংহের পুত্র নৌ নিহল সিংহ নিতান্ত যুবক হইলেও আত্মনির্ভরশীল, উদ্যমী এবং ক্ষমতাদিপ্সু ছিলেন, সুতরাং তিনিও পিতার অযোগ্য হস্ত হইতে রাজকীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে লইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াই ছিলেন। ধীয়ান সিংহ এবং নৌ নিহল সিংহ কেহই পরস্পরকে বিশ্বাস করিতেন না। নৌ নিহল সিংহ মনে করিতেন যে ধীয়ান সিংহের ও তাহার পরিবারের ক্ষমতা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহা রাজার ক্ষমতাকেই সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই ডোগ্রা পরিবারের শক্তি খর্ব ও নিয়ন্ত্রিত করা একান্তই প্রয়োজন। নৌ নিহল সিংহের মনের ভাব ধীয়ান সিংহের অবিদিত ছিল না কিন্তু চেৎ সিংহের আকস্মিক অভ্যুত্থানে উভয়েই শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং একটা আপোষ-রফা হইতে বিলম্ব হইল না। স্থির হইল যে চেৎ সিংহকে হত্যা করিয়া তাহার পক্ষীয় প্রধানদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। খড়ক্ সিংহ নামে মাত্র মহারাজা থাকিবেন কিন্তু তাহার প্রতিনিধিরূপে নৌ নিহল সিংহই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য চালাইবেন। উজীরী ধীয়ান সিংহেরই থাকিবে।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর রাত্রিশেষে খড়ক সিংহের শয়ন প্রকোষ্ঠে তাহার

সম্মুখেই ছেং সিংহকে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস অনুষ্ঠান শিখ-রাষ্ট্রের পতনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। রাজনৈতিক প্রশ্নের ও মতভেদের এমন সহজ মীমাংসা একবার প্রযুক্ত হইলে সহজে আর ইহাকে পরিত্যাগ করা যায় না এবং শিখ ইতিহাসের শেষ অধ্যায় এই কথাটি নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণ করিয়া দেয়। যে যাহাই হউক, ইহার পর নৌ নিহল সিংহই রাজকীয় ক্ষমতা কায়েমী করিলেন। খড়ক সিংহের রহিল শুধু সিংহাসনে বসিবার অধিকার। কিকিদধিক এক বৎসর কাল এই ব্যবস্থাই চলিল। এই সময়ের মধ্যে কুমার নৌ নিহল সিংহের কার্য্যকলাপে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি রাজার ন্যায্য অধিকারের উপর অন্য কাহারও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হস্তক্ষেপ কখনই বরদাস্ত করিবেন না এবং সুযোগ সুবিধা হইলে অতীতের অব্যবস্থাগুলিও দৃঢ়হস্তে অপসারিত করিবেন। সুতরাং অনেকেই আতঙ্কে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পঞ্জাবের আবহাওয়া যখন এই প্রকার সন্দেহসঙ্কুল, রাজ্যের প্রধানদের মধ্যে অনেকেই যখন একটা অজানিত বিপদের আশঙ্কায় ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন সময় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর খড়ক সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু বিধির অমোঘ বিধানে নৌ নিহল সিংহ নামতঃ ও কার্য্যতঃ শিখ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তাহার এই নবলব্ধ মর্য্যাদা উপভোগ করিতে পারিলেন না। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে স্বকীয় কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে ফিরিয়া আসিবার সময় তোরণ-দ্বারের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

নৌ নিহল সিংহের আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখনকার পঞ্জাবের মানসিক আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল ও অস্বস্তিকর এবং রাজ্যের প্রধানদের মধ্যে অনেকেই কখন কি হয় ভাবিয়া নিতান্ত ভয়ে ভয়ে দিন যাপন করিতে ছিলেন। ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার চক্রান্ত ও সলাপরামর্শও চলিতেছিল। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে নৌ নিহল সিংহের আকস্মিক মৃত্যুকে কেহই সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নৌ নিহল সিংহের জীবনের সঙ্গে রাজ্যের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিরাপত্তা এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুর অন্তরালে যে একটা অতি ঘৃণিত ষড়যন্ত্র ছিল,—সমসাময়িকেরা ইহাকে এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলেন, অনুসন্ধান ও বিচার-বিতর্কের কোন অবকাশই রহিল না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Cunningham লিখিয়াছেন যে যদিও নিশ্চিতরূপে কিছুই বলিবার উপায় নাই, তথাপিও এই ব্যাপারের দায়ীত্ব হইতে ধীয়ান সিংহ এবং তাহার ভ্রাতাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে Cunningham Gardner-এর অভিমতের উল্লেখ করিয়াছেন।

Alexander Gardner ছিলেন একজন আমেরিকান এবং ঐসময়ে তিনি লাহোরে তোপ্রাদিগের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিক চমকপ্রদ। Gardner বলেন যে তোরণের পতনে নৌ নিহাল সিংহ অতি সামান্যভাবেই আহত হইয়াছিলেন, ফলে তাহার দেহ হইতে অতি সামান্য রক্তপাতই হইয়াছিল। কিন্তু পরের দিন যখন কুমারের মৃত্যুর পর মহারাজ রণজিৎ সিংহকে খবর দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে তাহার বিছানা ও শিরোপাধান তখন এবং অমাট রক্তে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যে পাঁচজন পাল্কীবাহক কুমারকে ঔজান অবস্থায় অকুস্থল হইতে বহন করিয়া লইয়া যায় তাহাদের মধ্যে একজনের নিকটেই নাকি Gardner এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই পাল্কীবাহকদিগের মধ্যে দুইজনকে গোপনে হত্যা করা হয়, দুইজন হিন্দুস্থানে পলাইয়া যায় এবং পঞ্চম ব্যক্তির ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এই পাল্কীবাহকেরা সকলেই নাকি তাহার অধীনে কর্মে নিযুক্ত ছিল। ইহার অর্থ হইল এই যে Gardner-এর মতে তোরণ পতনের ফলে নৌ নিহাল সিংহ অতি সামান্যভাবেই আহত হইয়াছিলেন এবং তাহার জীবননাশের কোন আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু কুমারকে প্রাসাদে স্থানান্তরিত করার পর ধীয়ান সিংহের আদেশে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেহই আর কুমারের নিকট যাইতে পারেন নাই। Gardner লিখিয়াছেন যে এমন কি নৌ নিহাল সিংহের মাতা এবং রাজপরিবারের অতি নিকট জাতি সিন্ধনওয়ালীয়া সর্দারয়াও কুমারকে দেখিবার অনুমতি পান নাই। Gardner প্রকারান্তরে বলিতে চাহেন যে ধীয়ান সিংহের এই আচরণের অর্থ সুস্পষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে কুমার তোরণ পতনের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান নাই, ধীয়ান সিংহ প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

পরবর্তী লেখকেরা কিন্তু Gardner-এর সাক্ষ্যের বিশেষ কোনও মূল্য দেন নাই। কেহ কেহ তাহাকে একজন অতি হীনমনা ভাগ্যান্বেষী এবং স্থানীয় বিবেকহীন নিছক মিথ্যাবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ডাক্তার Honigbberger অকুস্থলের নিকটেই ছিলেন এবং এই আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধীয়ান সিংহের অনুরোধে তিনি যাইয়া কুমারকে পরীক্ষা করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সরাসরি অভিমত দেন যে ডাক্তার কবিরাজ কুমারের আর কোন কাজেই আসিবে না। রাজপরিবারের চিকিৎসক ফকীর ছকদীনও কুমারকে পরীক্ষা করেন এবং কুমারের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করেন। সুতরাং পাল্কী বাহকের এই আজগুবী কাহিনী যে Gardner-এর কল্পনা প্রসূত, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই ব্যাপারে ধীয়ান সিংহের নির্দোষিতা সম্বন্ধে Honigbberger যাহা

বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই দুর্ঘটনায় নৌ নিহল সিংহের সঙ্গে ধীয়ান সিংহের স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তম সিংহও প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ধীয়ান সিংহ যে আমিয়া গুলিয়াই উত্তম সিংহকে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস করা সুকঠিন। ইহাও নিশ্চিত যে কখন তোরণটি ভাঙিয়া পড়িবে এবং কতটা দূরে দাঁড়াইলে নিরাপদ থাকা যাইবে, এসম্বন্ধে ধীয়ান সিংহের কোন ধারণাই ছিল না, কারণ এই দুর্ঘটনায় তিনি নিজেও আহত হইয়াছিলেন এবং ডাক্তার Honigbbergerই তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ধীয়ান সিংহের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির না করিয়াই এরূপ একটা গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নৌ নিহল সিংহের মৃত্যুর পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার জন্য ধীয়ান সিংহ যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। Honigh-berger ইহাও বলিয়াছেন যে কুমারের মৃত্যুশয্যার সামান্য কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও যাইতে না দেওয়া এবং কুমারের মৃত্যু-সংবাদ তিনদিন পর্যন্ত গোপন রাখা, রাজ্যের তদানীন্তন অনিশ্চিত ও সঙ্কটজনক অবস্থার জন্যই ধীয়ান সিংহকে করিতে হইয়াছিল। নৌ নিহল সিংহের পর এমন কেহই ছিলেন না যাঁহার সিংহাসন অধিকারের দাবী সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হইতে পারে।

এত কথা লিখিলেও Honigbbergerকি সমসাময়িক মানসিক আবহাওয়ার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই ঘটনার অন্তরালে যে একটা চক্রান্ত ছিল এবং ইহা যে একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে একথা তিনিও বলিয়াছেন। খড়ক সিংহ এবং চেৎ সিংহের অনুবর্তী দলকেই তিনি এই ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন। নৌ নিহল সিংহ নাকি ইহাদের কৈফিয়ৎ তলব করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কারণ খড়ক সিংহের আমলে ইহারা তাহাকে প্রভাবিত করিয়া তাহার অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। অনেকেই নাকি জানিতেন যে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলেই নৌ নিহল সিংহ ইহাদের মধ্যে ৭ জনের বাড়ীঘর আটক করিয়া এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করিতেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একদিকে হজুরীবাগ, অপর দিকে বাদশাহী মসজিদ, মধ্যে এই তোরণ-দ্বার, এরূপ একটা প্রকাশ্য স্থানে এই জাতীয় একটা ব্যাপার ঘটাইয়া উঠা যে কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। উৎকট মাদমত্ততায় মত্তমত্ত গাঁথনিতে প্রস্তুত এইরূপ একটি তোরণকে যে ইচ্ছামত যখন তখন ভূমিসাৎ করা যায় না ইহা বুঝিতে কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ধীরে ধীরে এই তোরণের গাঁথনিকে গোপনে শিথিল করিয়া আনাও যে এরূপ একটি প্রকাশ্য স্থানে মোটেই সম্ভবপর নহে, ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এবং সর্বোপরি প্রশ্ন হইল সঠিক সময়ে এই শিথিলিকৃত তোরণকে ভূপতিত করা।

ব্যাপারটা যে একপ্রকার অসম্ভব ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সকল আপত্তি সমসাময়িক লেখকদের মনে মোটে উদয়ই হয় নাই। যেহেতু নৌ নিহল সিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তি রাজ্যের প্রধানদিগের মধ্যে অনেককেই আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং যেহেতু সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সুতরাং কেহ না কেহ নিশ্চয়ই কৌশল করিয়া এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে এরূপ একটা ধারণা সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়া উঠিল। ইতিহাসের স্কন্ধে একটি ভূত চাপিয়া বসিল। একশত বৎসরের উপর হইয়া গেল, নড়িবার নামও করে না।

ভারত সরকারের মহাফেজখানায় এই সময়ের শিখ-রাষ্ট্র সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একখানা চিঠি আমার নজরে আসে। ইহার ভিতরে চেৎ সিংহ নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে দেখিলাম। চেৎ সিংহ ছিলেন একজন শিখ সেনাধ্যক্ষ এবং তিনি অকুস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ইংরাজ মহলে একটা কথা রটিয়াছিল যে নৌ নিহল সিংহ হস্তিপৃষ্ঠে ফটক পার হইবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ইহার প্রতিবাদ করিয়া চেৎ সিংহ লিখিতেছেন: "কুমার হাতির উপর ছিলেন না। রৌদ্রের এবং পিতার চিতার উত্তাপ হইতে উত্তাপ পাইবার আশায় এবং মুক্তবায়ু সেবনের অভিপ্রায়ে তিনি এক পার্শ্বে রাজা ধীয়ান সিংহ ও অপর পার্শ্বে উত্তম সিংহ এবং পিছনে কতিপয় ভৃত্য লইয়া নিকটবর্তী তোরণ দ্বারের ছায়ার দিকে পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন। যেমন তিনি তোরণ দ্বারে প্রবেশ করিলেন অমনি উপরের গুরুভার অংশটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। আর এক পা অগ্রসর হইয়া গেলেই তিনি নিরাপদে পার হইয়া যাইতেন এবং এক পা পিছনে থাকিলেও তিনি খুব সম্ভব গুরুতররূপে আহত হইতেন না। রাজা (ধীয়ান সিংহ) সামান্যভাবেই আহত হইয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তম সিংহকে মৃত অবস্থায় ভগ্নস্তূপ হইতে বাহির করা হয়। তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কুমারের বাম হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার মাথা পিষিয়া গিয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে হজুরীবাগের ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ তোরণ দ্বারই ছিল হজুরীবাগের প্রবেশ পথ। উপরে কেহই ছিল না এবং কোর্টের অন্যান্য অংশের ন্যায় তোরণ দ্বারটিও অত্যন্ত মজবুত ও সুগঠিত ছিল।" পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার সহিত প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে আর বিশেষ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে নৌ নিহল সিংহ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকের নিকট সমসাময়িক বিবরণের একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে। কিন্তু তাহাও যে সকল সময়ে নির্ভরযোগ্য নহে তাহার প্রমাণ আমরা পাইলাম। সমসাময়িক আবহাওয়ার প্রভাব যে তৎকালীন লেখকেরা সহজে এড়াইতে পারেন না এবং তখনকার মানসিক পরিবেশে একটা মিথ্যা ধারণা দানা বাঁধিয়া উঠিলে

তাহা যে নির্ব্বিচারে অনেকেই গ্রহণ করিয়া বসেন তাহাও আমরা দেখিলাম। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব যে কত গুরুতর এবং তাহাকে যে কিরূপ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হয় এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

তিব্বত

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্ব্বে সাম্যবাদী চীনের বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে। তিব্বতে চীনের সার্ব্বভৌম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। তিব্বতে চীনের আধিপত্য (suzerainty) তিব্বত সরকার মানিয়া লইয়াছিল এবং এই আধিপত্যের সীমারেখা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তিব্বত সরকারের একদল প্রতিনিধি পিকিং যাত্রার পথে নয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক, চীন সরকার আলোচনার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। এই বিষয়ে ভারত সরকারের সহিত চীন সরকারের সম্প্রতি যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চীন এখন তিব্বতে আধিপত্য (suzerainty) পাইলে সন্তুষ্ট হইবে না, তিব্বতে চীনের অপ্রতিহত সার্ব্বভৌম অধিকার (sovereignty) প্রতিষ্ঠা করিয়া তিব্বতকে চীনের একটি প্রদেশে পরিণত করাই চীন সরকারের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে তিব্বত সরকার দেশরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া জাতিসঙ্ঘের (United Nations) নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) চীনের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে এবং জানাইয়াছে যে তিব্বত আর চীনের আধিপত্য (suzerainty) স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই সকল ঘটনার ফলে একটি কঠিন আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইবে, কিংবা ইহা অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধের আগমন-পথ প্রস্তুত করিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

তিব্বতে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে ভারতবর্ষ নানা কারণে তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ভারতবর্ষ তিব্বতের নিকট প্রতিবেশী। বিশাল হিমালয় পর্ব্বতমালা এই দুইটি দেশকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভারতের সীমা প্রায় দুই সহস্র মাইল ব্যাপিয়া তিব্বতের সীমা ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য গিরিপথ দুইটি দেশকে সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে তিব্বতের সহিত ভারতের সম্বন্ধ মৈত্রীর ও

সহযোগিতায়। যে দীপঙ্কর-অতীশ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতি তিব্বতীয়া আজিও ভুলিয়া যায় নাই। লাসার ১৬ মাইল পূর্বে যে গিরিগুহায় তিনি বাস করিতেন তাহা এখনও তিব্বতীয়া তীর্থস্থান রূপে গণ্য করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর তিব্বতের সহিত ভারতের সম্বন্ধ নূতন রূপ গ্রহণ করে এবং তিব্বত সরকার ভারতের কতকগুলি রাজনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। তিব্বত রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া চীনের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভারতের এই সকল অধিকার বজায় থাকিবে কিনা সন্দেহ। তাহা ছাড়া তিব্বতে সাম্যবাদী দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত সরকার নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইবে। তিব্বতে বিপ্লবের স্রোত প্রবাহিত হইলে নেপাল, ভূটান ও সিকিম আলোড়িত হইবে; আসাম হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের সুদীর্ঘ পার্বত্য অঞ্চলও দীর্ঘকাল শুরু থাকিবে না।

ইতিহাসের দিক হইতে চীনের সহিত তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন সময়ে তিব্বত চীনের আধিপত্য (suzerainty) স্বীকার করিয়াছে, চীন নানাভাবে তিব্বতের শাসনযন্ত্র নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) কখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তিব্বত কখনও চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ রূপে চীন সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হয় নাই। একমাত্র পূর্ব তিব্বতের কিয়দংশ সময় সময় চীন সরকার কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যবস্থা তিব্বতীয়া কখনও বিধিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই। সুতরাং তিব্বতকে চীনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশরূপে গণ্য করিবার যে দাবী চীন সরকার সম্প্রতি উপস্থিত করিয়াছে তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে তিব্বতের সহিত ব্রিটিশ ভারতের মৈত্রী স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অর্জ বোগ্‌ল্‌ (George Bogle) নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে তিব্বতে গমন করেন এবং সিগাৎসে (Shigatse) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাসি লামার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সামুয়েল টার্ণার (Samuel Turner) পুনরায় সিগাৎসেতে উপস্থিত হন। কিন্তু বোগ্‌ল্‌ ও টার্ণার লাসায় যাইতে পারেন নাই, তিব্বত সরকারের সহিত কোনরূপ চুক্তিপত্র সম্পাদনের সুযোগও তাঁহারা পান নাই।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে টমাস ম্যানিং (Thomas Manning) নামক জনৈক বেসরকারী ইংরেজ ছদ্মবেশে লাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯-৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় বৌদ্ধশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতের বেশে দুইবার তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের ইংরেজ সরকার তিব্বতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিঙের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মিঃ জন এডগার (John Edgar) সরকারী হুকুমে এই বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। কয়েক বৎসর পরে স্যার রিচার্ড টেম্পল্ (Sir Richard Temple) সিকিমের মধ্যে দিয়া সিকিম-তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেন। ১৮৮১-৮৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ কোলম্যান মেকলে (Colman Macaulay) নামক জনৈক সরকারী কর্মচারীকে তিব্বতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু নানা কারণে—বিশেষতঃ তিব্বত সরকারের আপত্তিতে—এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সিকিমে তিব্বতীদের সহিত ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তিব্বতীরা সিকিমের অভ্যন্তরে কয়েক মাইল প্রবেশ করায় তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য সেনাপতি গ্রেহামের (Geueral Graham) অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। সেনাপতি গ্রেহাম তিব্বতীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত চুম্বী উপত্যকা (Chumby Valley) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখন তিব্বতে চীনের আধিপত্য (suzerainty) স্বীকৃত হইত। সুতরাং এই ঘটনার পর ইংরেজ সরকার চীন সরকারের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ কলিকাতায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সন্ধি হইয়াছিল ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে; বিষয়টি তিব্বত সংক্রান্ত হইলেও তিব্বত সরকারকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে দেওয়া হয় নাই। এই সন্ধি দ্বারা সিকিম এবং তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্দেশ করা হয় এবং চীন সিকিমে ইংলণ্ডের আধিপত্য (suzerainty) স্বীকার করে। তিন বৎসর পরে—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে—দার্জিলিঙে ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে আর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতেও তিব্বত সরকারকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। এই সন্ধিপত্র অনুসারে ইয়াটুঙ (Yatung) নামক স্থানে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ব্রিটিশ প্রজাদিগকে বিনাবাধায় বাণিজ্য করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। সন্ধির সর্ত ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য ইয়াটুঙে একজন ব্রিটিশ কর্মচারী (Agent) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই দুইটি সন্ধি দ্বারা ইংরেজের স্বার্থরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিব্বত সরকারের বিরোধিতায় এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই। এই সময়ে চীন সরকারের প্রভুত্ব তিব্বতীদের পক্ষে বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই চীন সরকারের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র মানিয়া লইতে তিব্বত সরকার প্রস্তুত ছিল না। চীন সরকারের পক্ষেও তিব্বতী কর্মচারিগণকে সন্ধির সর্ত অনুসারে

পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ফলে ইয়াটুঙে বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতি হইল না, শুল্ক সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রজারা যে সকল সুবিধা দাবি করিত তাহাও তিব্বতী কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করিত না। সিকিম-তিব্বত সীমারেখা চিহ্নিত করিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ নোলান (Nolan) ইয়াটুঙে উপস্থিত হইলে তিব্বতীগণ তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিল যে চীন সরকারের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের সর্তসমূহ তিব্বত সরকারের উপর প্রযোজ্য নহে।

তিব্বতীদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া লর্ড কার্জন স্থির করিলেন যে তিব্বতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে সাক্ষাৎভাবে তিব্বত সরকারের সহিত বোঝাপড়া করিতে হইবে। চীন সরকারের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রথমে এই ব্যবস্থায় সম্মত হয় নাই। অবশেষে লর্ড কার্জনের পীড়াপীড়িতে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে তিব্বত সরকারের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা চালাইবার অনুমতি দিল কিন্তু এই বিষয়ে তিব্বত সরকার মোটেই আগ্রহ প্রদর্শন করিল না; বরঞ্চ ইংরেজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া দলাই লামা রাশিয়ার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। মঙ্গোলিয়ায় রুশ অধিকার বিস্তারের ফলে তিব্বতের প্রতি রাশিয়ার দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিব্বত ও রাশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডোর্জিয়েফ (Dorjieff) নামক জনৈক মঙ্গোলীয় পণ্ডিত। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিব্বত সরকারের দূত রূপে রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। তখন সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। রাশিয়া তখনও প্রবল শক্তিরূপে পরিগণিত; রুষ-জাপান যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নাই, রাশিয়ার দৌর্বল্য তখনও পৃথিবীর সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তিব্বতে রুশ-প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা দেখিয়া লর্ড কার্জন উদ্বিগ্ন হইলেন। কিছুদিন পরে চীনের কোন কোন সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইল যে চীনের সহিত রাশিয়া এক গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে; এই সন্ধি অনুসারে চীন তিব্বতের উপর স্বীয় আধিপত্য (Suzerainty) রাশিয়াকে প্রদান করিবে, বিনিময়ে রাশিয়া চীনের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিবে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রুশ সরকার ব্রিটিশ সরকারকে জানাইল যে চীন বা তিব্বতের সহিত রাশিয়ার কোন চুক্তি হয় নাই এবং তিব্বতে দূত পাঠাইবার বা তথায় রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা রাশিয়ার নাই। ইহাতেও লর্ড কার্জনের আশঙ্কা দূর হইল না। বারংবার তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া ব্রিটিশ সরকার তিব্বতে দূত পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদন করিল; কিন্তু কথা রহিল যে দূত লাসায় যাইবে না, সিকিম-তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী কাম্পা দ্জঙ (Kampa Dzong) নামক স্থানে অপেক্ষা করিবে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের (Colonel Young-

husband) নেতৃত্বাধীনে এক সশস্ত্র অভিযান তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করিল। এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ তিনি স্বয়ং India and Tibbet নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক উহাতে বহু চিত্তাকর্ষক বিষয়ের সন্ধান পাইবেন। যাহা হউক, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ড কাম্প জঙ্গে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু চীন বা তিব্বত সরকারের কোন প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন না। তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে গিয়াণ্ট্‌সি (Gyantse) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিল। এবার তিব্বতীরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার পথ রোধ করিল। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং গিয়াণ্ট্‌সি অতিক্রম করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৬ আগষ্ট তারিখে লাসায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে দলাই লামা মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গাতে (Urga) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে—তিনি লাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দলাই লামার অনুপস্থিতিতে তিব্বত সরকার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে লাসায় কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের সহিত এক চুক্তিপত্র সম্পাদন করে। এই চুক্তিপত্রের কোন কোন সর্ত্ত পরে ব্রিটিশ সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তিব্বত সরকার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত্তগুলি মানিয়া লইল, তিনটি স্থানে [illegible]ইয়াটুঙ, গিয়াণ্ট্‌সি ও গায়টোক) বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইল, বাণিজ্যশুল্ক সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রজাদিগকে নানাবিধ সুবিধা দিল এবং ইয়ংহাজব্যাণ্ড অভিযানের খরচস্বরূপ নগদ ২৫ লক্ষ টাকা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। যাহাতে তিব্বতে রাশিয়া বা অপর কোন শক্তির প্রভাব বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে এজন্য চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে লিখিত রহিল যে তিব্বতের কোন অংশ অপর কোন শক্তির নিকট বিক্রয় করা বা বন্ধক দেওয়া যাইবে না, অপর কোন শক্তিকে তিব্বতের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বা তিব্বতে দূত প্রেরণ করিতে দেওয়া হইবে না, এবং অপর কোন শক্তি তিব্বতে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ নির্ম্মাণ বা খনির উপর মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না। চীন সরকারের সহযোগিতা ও সম্মতি ব্যতীত এই সকল গুরুতর সর্ত্ত গ্রহণ করিয়া তিব্বত সরকার প্রমাণ করিল যে কার্য্যতঃ তিব্বতের উপর চীনের কোন কর্তৃত্ব নাই।

এই চুক্তির পর কিছুকাল তিব্বতের সহিত ব্রিটিশ সরকারের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ও'কোনর (Captain O' Connor) সিগাৎসেতে গমন করিয়া তাসি লামার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তাসি লামা কলিকাতায় আগমন করেন এবং যুবরাজ (পরে সম্রাট্ পঞ্চম) জর্জ্জ কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার পুনরায় তিব্বতের ব্যাপারে

চীনের সহিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করায় তিব্বত সরকার অসন্তুষ্ট হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ব্রিটিশ সরকারের সহিত চীন সরকারের এক সন্ধি পিকিং-এ স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা চীন তিব্বতের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তিব্বতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নির্মাণ সম্বন্ধে চীনের অধিকার ইংলণ্ড স্বীকার করে। এইরূপে ইংলণ্ড কর্তৃক তিব্বতে চীনের আধিপত্য (suzerainty) পুনরায় স্বীকৃত হইল। ইহাতে তিব্বতীরা স্বভাবতঃই বিরক্ত হইল। ইংলণ্ড কোন দিক হইতেই লাভবান হইল না, কারণ তিব্বত সরকারকে কোন সন্ধির সর্ত পালন করিতে বাধ্য করিবার বাস্তব ক্ষমতা চীন সরকারের ছিল না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তিপত্র (Anglo-Russian Convention) সম্পাদিত হয়। এশিয়া মহাদেশে এই দুই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিলোপ করিয়া ইউরোপে তাহাদের সহযোগিতার পথ সুগম করা এই চুক্তি সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই চুক্তিতে তিব্বত সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত ছিল। ইংলণ্ড ও রাশিয়া উভয়েই স্বীকার করিল যে চীন সরকারের মধ্যবর্তিতা ব্যতীত তাহারা তিব্বত সরকারের সহিত কোনপ্রকার আলোচনা করিবে না, তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা লাসায় দূত প্রেরণ করিবে না, এবং তিব্বতে রেলপথ নির্মাণ বা খনির মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে কোনপ্রকার অধিকার দাবি করিবে না। এই চুক্তি সম্পাদন কালে ইংলণ্ড ও রাশিয়া চীন বা তিব্বত সরকারের সহিত পরামর্শ না করায় উভয় সরকারই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ইংলণ্ড চীনের সহিত আবার নূতন সন্ধি করিল। তিব্বতে ব্রিটিশ প্রজাদের বাণিজ্যের সুবিধা করাই এই সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল। তিব্বত সরকার ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, কারণ ইংলণ্ড বারবার তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চীন সরকারের কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়া তিব্বতে চীনের আধিপত্য (suzerainty) দৃঢ়মূল করিতেছিল। চীন সরকার ইংলণ্ডের নীতির সুযোগ লইয়া তিব্বতের আভ্যন্তরীণ শাসন স্বহস্তে গ্রহণের উপক্রম করিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একদল চীনা সৈন্য লাসা অধিকার করিল। বিপদ আসন্ন দেখিয়া দলাই লামা মন্ত্রিগণ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ সহ দার্জিলিঙে উপস্থিত হইয়া ভারত সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীন বিপ্লব আরম্ভ হইল; মাঞ্চু রাজবংশের পতন হইল, সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ফলে তিব্বতে চীনের কর্তৃত্ব শিথিল হইল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দলাই লামা লাসায় ফিরিয়া গেলেন।

চীনের নূতন সরকার খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করিতেই তিব্বত আবার বিপন্ন হইল। চীনের রাষ্ট্রপতি য়ুয়ান শী কাই (Yuan Shih Kai) ঘোষণা করিলেন যে তিব্বত চীন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ মাত্র, অর্থাৎ চীন সরকার অন্যান্য প্রদেশের মতই তিব্বত শাসন করিবে, তিব্বতের কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্ট অধিকার

থাকিবে না। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে ইংলণ্ড বুঝিতে পারিয়াছিল যে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ব্রিটিশ প্রভাবের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য। তাই ইংলণ্ড চীন সরকারের দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সিমলায় ব্রিটিশ, চীন এবং তিব্বত সরকারের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এবার আলোচনা ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, তিব্বতের ব্যাপারে তিব্বত সরকারের কথা বলিবার অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইল। যাহা হউক, দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল সিমলাহ এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সনদ তিব্বতে চীনের আধিপত্য (Suzerainty) স্বীকৃত হইল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে তিব্বত সরকারের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারত-তিব্বত বাণিজ্য সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। তিব্বতের বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা অপরিবর্ত্তিত রহিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চীন সরকারের প্রতিনিধি এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেও চীন সরকার ইহা গ্রহণ করিল না। সুতরাং সন্ধির সর্ত্তগুলি কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও তিব্বতের পক্ষে বলবৎ রহিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চীন সরকার এই সন্ধি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তিব্বত সরকার তাহাতে সম্মত হয় নাই।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে তিব্বতে চীনের আধিপত্য (Suzerainty) সম্বন্ধে যে স্বীকৃতি ছিল তাহা আইনতঃ বলবৎ নহে, কারণ চীন সরকার ঐ সন্ধি গ্রহণ করে নাই। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বৎসরকাল চীন তিব্বতে আধিপত্য-সূচক কোন অধিকার প্রয়োগ করে নাই। দ্বিতীয় মহাসমরে চীন যোগ দিয়াছিল, তিব্বত নিরপেক্ষ ছিল। ইহাতে তিব্বতের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন চীন সরকার তিব্বতের উপর যে অধিকার দাবি করিতেছে তাহার কোন আইনগত বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জাতির অধিকার নির্ণয়ে আইন বা ইতিহাসের কোন স্থান নাই; অধিকার নির্ভর করে বাহুবলের উপর। তিব্বতীদের বাহুবলের অভাব, সুতরাং তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন*

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে কয়েক মাস আগে। ইতিমধ্যে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডেরও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর একক সাধনা ও ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে আজ মোগল আমলের প্রায় সমগ্র ইতিহাস আমাদের সম্মুখে এমন-ভাবে প্রতিভাত হয়েছে যা ভারতবর্ষের ইতিহাসের আর কোনও অংশ হয়নি। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের উপর এই চারখণ্ড ইতিহাস যে আলোকপাত করেছে সে সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস অতিশয় এলোমেলো। মোগল আমলে যে রাজনৈতিক ঐক্য উপস্থিত হয়েছিল ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের আক্রমণের আগেই তা ভেঙ্গে যেতে আরম্ভ করে। নাদিরের আক্রমণের পরে সেই অবনতি এত দ্রুত অগ্রসর হয় যে আকবর ও আওরঙ্গজীবের মোগল সাম্রাজ্য কতকগুলি বিরোধী পৃথক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক বলেছেন যে একটা বস্তাবন্দী পাথরের নুড়িগুলো নাড়াচাড়া করলে যেমন সব সময়ে ঠোকাঠুকি করে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী অনেকটা সেই ধরণের হয়ে দাঁড়ায়। উপাদান সংগ্রহ এত কঠিন যে এই পতনের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হত। ফারসী, মারাঠী, ইংরেজী, ফরাসী, হিন্দী, এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা নানাবিধ গ্রন্থ, দলিল-পত্র, কথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে তার মূলসূত্র বার করা ঐতিহাসিক গবেষণার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিকৃতির জন্য ঐতিহাসিকের বর্ণনাকৌশল পদে পদে বাধা পেয়ে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করবে বলে মনে হয়েছিল। এক রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অবসানের ইতিহাসের শোচনীয় অধ্যায়গুলি রচনা কাহাকেও অনুপ্রেরণা দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয়নি। এ অতীত মহিমময় নয়। কিন্তু নিঃস্বার্থ অনুসন্ধিৎসা, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করার উৎসাহ এবং শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির আনন্দই বোধ হয় অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক G. M. Trevelyan বলেছেন যে অতীতের অতি নীরস খুঁটিনাটিতেও তিনি আনন্দ পান, কারণ এই খুঁটিনাটিগুলো তবুই তাঁর

* Fall of the Mughal Empire in four volumes—Vol I 1932; Vol II 1934, Vol III; 1938, Vol IV 1950—Sir Jadunath Sarkar.

নিকট কাব্যরসময় হয় যতই তারা পিছিয়ে অতীতের মধ্যে ডুবে যায়। এ প্রশ্ন অনেকবার জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি কেন স্যার যদুনাথ সরকার বৃটিশ আমলের ইতিহাস লেখেন নি। যাঁরা এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তাঁদের বোধহয় ধারণা এই যে অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ঘটনাবলী এবং সহজলব্ধ উপাদান তাঁর লেখনী আরও সজীব করে তুলতো। কিন্তু তাহলে তিনি ভারতেতিহাসের এমন এক অংশে আলোকপাত করতেন না যা অন্যের পক্ষে করা একেবারে অসম্ভব হত।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও দিল্লীর দুর্গের সম্মুখে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়। মোহাম্মদ শাহকে দেখাতে চেয়েছিল যে তার পারিষদবর্গ যা বলুক না কেন মারাঠাদের সব দাবী মেনে নেওয়া ভিন্ন তার গত্যন্তর নাই। বোধ হয় বাজীরাওর এই সদর্প অভিযানই নাদির শাহকে জানিয়ে দিয়েছিল যে মোগল সম্রাট কত দুর্ব্বল এবং একভাবে নাদিরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহ দিয়েছিল। দিল্লী অধিকার করে, দিল্লীর ২০,০০০ নাগরিককে হত্যা করে প্রায় ১৫ কোটি মুদ্রা, ৬৫ কোটি মূল্যের ধনরত্ন, ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে নাদির পারস্য দেশে ফিরে যায়। মোগল সম্রাটকে সিন্ধুর পশ্চিম পারের মোগল সাম্রাজ্যের অংশ ছেড়ে দিতে নাদির বাধ্য করেছিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মালব সুবার উপর পেশোয়া বালাজী বাজীরাওর ক্ষমতা মোগল সম্রাট মেনে নিয়েছিল। অযোধ্যা সফদর জঙ্গের আমল থেকে প্রায় স্বাধীন হয়েছিল। নিজাম দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা নিয়ে স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করছিল। কাজেই মোগল সাম্রাজ্যের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে কতটুকু দাঁড়িয়েছিল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। দিল্লীতে তুরাণী দলের অধিনায়ক উজির কামারউদ্দীন ও ইরাণী দলের অধিনায়ক সফদর জঙ্গ দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত। মোগল সম্রাট মহম্মদশাহ ছিল অতিশয় আরামপ্রিয় ও দুর্ব্বল প্রকৃতির। এ অবস্থায় দ্রুত অবনতির গতিরোধ করা অসম্ভব হয়েছিল।

বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয় ১৭৪২ সালে, আলীবর্দ্দী খাঁ বিশেষ চেষ্টা করেও এ হাঙ্গামার সম্পূর্ণ গতিরোধ করতে পারল না। তার একজন উচ্চ কর্ম্মচারী মীর হবিব মারাঠাদের হাতে ধরা পড়ে ও তাদের দলে চলে যায়। মীর হবিবের দক্ষতা, তার অভিজ্ঞতা, তার উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনা বাংলায় এই বর্গীর হাঙ্গামা এতটা সাংঘাতিক করে তুলেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের এ সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা পড়লে মনে হয় মানুষ বোধ হয় স্বভাবতঃই বিশ্বাস-ঘাতক। বর্গীর হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে আলীবর্দ্দীর বেতনভুক আফগান সেনানায়কগণ বিদ্রোহ করার জন্য যেন উন্মুখ ছিল। আলীবর্দ্দীর নিকট আত্মীয় মীরজাফরের ষড়যন্ত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৫৭ সালে মীরজাফর আতাউল্লা নামক অন্য এক সেনানায়কের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল যে নবাবকে মেরে ফেলে সে বাংলার নবাব হবে আর আতাউল্লা বিহারের গদীতে বসবে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আলীবর্দ্দী

১৭৫১ সালে বাংলার চৌথ বাবদ ১২ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয় ও উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায়ের ভার মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দেয়। উড়িষ্যা পরে মারাঠাদের হাতে চলে যায়। নিমকহারামির চরম দৃষ্টান্ত আলীবর্দী নিজেই দেখিয়েছিল যখন সে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার নবাব হয়। মীর হবিব, পাঠান সেনানায়ক মুস্তাফা খাঁ ও সমসের খাঁ, মীরজাফর ও আতাউল্লা তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল। পলাশীর যুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই তার সূচনা করেছিল আলীবর্দী নিজেই। এই সব স্বার্থপর সেনানায়ক ও রাজকর্মচারীরা দুই এক পুরুষ ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে এসেছিল। স্বার্থ ছিল অন্য কোনও প্রেরণা তারা কখনও পায়নি।

এদিকে পাঠানরা গঙ্গাযমুনার অন্তর্বর্তী দোয়াবের উত্তরাংশে, রোহিলখণ্ডে ও ফরাক্কাবাদে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহ নিহত হওয়ার পর আহম্মদ শাহ দুররানী আফগানিস্থানের স্বাধীন রাজা হয়ে বসে। আজকাল আমরা পঞ্চম বাহিনীর বর্ণনা শুনতে অভ্যস্ত। আহম্মদ শাহ নিয়মিত ভাবে দিল্লী সাম্রাজ্য আক্রমণ আরম্ভ করলে ভারতের এই আফগান পঞ্চম বাহিনী তার খুবই কাজে লেগেছিল—বিশেষ ভাবে ১৭৫৬-৫৭ সালে ও ১৭৫৯-৬১ সালে। দুররানী প্রথম আক্রমণ করে মাহুপুরের যুদ্ধে হেরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু আহম্মদ শাহ দুররানী জানত মোগল সম্রাট কত হীনবল, মোগল আমীররা কত অপদার্থ। ১৭৫০ সালে তার দ্বিতীয় আক্রমণ আর ১৭৫২ সালে তার তৃতীয় আক্রমণ হয়। মোগল সম্রাট পাঞ্জাব দুররানীকে ছেড়ে দিয়ে বোধ হয় মনে করলে যে তার আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

১৭৫৪ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত উত্তর ভারতের ইতিহাসের ঘটনাবলীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করেছিল আহম্মদ শাহ দুররানী। আহম্মদশাহ চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করে ১৭৫৬-৫৭ সালে, তখন দ্বিতীয় আলমগীর নামে মাত্র মোগল বাদশা। মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল মীর বক্সী রোহিলা নজীব-উদ্-দৌলা আর দুররানী উজির ইমাদ-উল্-মুল্ক। নজীব ছিল বিশ্বাসঘাতক আর ইমাদের কাপুরুষতার কোনও তুলনা নাই। মোগল সম্রাটের শোচনীয় অবস্থা ঐতিহাসিকের লেখনীতে মূর্তিমন্ত হয়েছে। ১৭ জানুয়ারী আহম্মদ শাহের অগ্রগামী ঘোড়সওয়াররা যখন যমুনার অপর পারে উপস্থিত হয় তখন দিল্লীর দুর্গের মধ্যে সৈন্যসংখ্যা মোট ৩০০০ এবং সাজসরঞ্জাম বহনের জন্য ছয়টি মাত্র গরুর গাড়ী ছিল। ইমাদ রাজঘাটের বালুচটে কয়েকটা কামান বসিয়েছিল, কিন্তু কোনও গোলন্দাজ সৈন্য ছিল না। মোগল মীর বক্সী নজীব রাতের অন্ধকারে ওপারে গিয়ে আহম্মদ শাহের সঙ্গে যোগ দেয়। অনেকেই ইমাদকে বলেছিল যে মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ও কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অন্ততঃ একবার এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। কিন্তু ইমাদ-উল্-মুল্কের

কাছে রাজপুতদের মত আত্মসম্মান আশা করা কারও বোধ হয় উচিত হয়নি। ইমাদ যমুনার পারে সৈন্য সমাবেশ করে শত্রু সৈন্য সমাবেশের দিকে তাকিয়ে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তার কর্তব্য শেষ করেছিল। পরদিন আত্মসমর্পণের পালা। তারপর দিল্লী থেকে মথুরা পর্যন্ত যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল তার যে বিশদ বিবরণ ঐতিহাসিক দিয়েছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। শুধু মথুরা-বৃন্দাবনের যে চিত্র দিয়েছেন তার একটু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। মথুরার একজন হৃতসর্বস্ব মুসলমান অধিবাসী কয়েকদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে পলায়নের সময় যে দৃশ্য দেখেছিল তার বর্ণনার উল্লেখ ঐতিহাসিক করেছেন। সে বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকটি ছোট ঝুটীরে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিল, দেহ থেকে মুণ্ড ছিল আলাদা, প্রত্যেকটি ছিন্ন মুণ্ডে দড়ি দিয়ে ঘাড়ের সঙ্গে শক্ত মাথা বাঁধা ছিল আর মুখের সঙ্গে লাগান ছিল এই ছিন্ন গোমুণ্ড। যদি কোনও মুসলমান মনে করেন যে আহম্মদ শাহ দুররাণীর অভিযান মুসলমানদের বিজয় অভিযান তাহলে তাঁকে একবার বৈরাগীদের ছিন্নমুণ্ডের সঙ্গে বদ্ধমূল গোমুণ্ডের পাশে অনশনক্লিষ্ট, পলায়মান, হৃতসর্বস্ব মুসলমান অধিবাসীর মূর্তি কল্পনা করে দেখতে বলি। আফগানরা দিল্লী তিনমাস দখল করে ছিল। সে তিনমাস দিল্লীর যন্ত্রণার যে বর্ণনা আমরা এখানে পাই তাতে দিল্লীর রোদনধ্বনি যেন এখনও শুনতে পাওয়া যায়। সে আর্তনাদের মধ্যে হিন্দুমুসলমান ভেদাভেদ বোধের সম্ভাবনা।

মোগলদের আমলে রাজপুতরা মোগল রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করে, একাজ খুব গৌরবজনক ছিল কিনা সে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। রাজপুত সামুরাইদের যুদ্ধই ছিল জীবনের প্রধান আকর্ষণ। মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতির ফলে রাজপুত যোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রাজপুতানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয় এবং মোগল কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হওয়ার ফলে এই অন্তর্যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষমতা দিল্লী রাজশক্তির তখন ছিল না। এ সময়ে ঐতিহাসিকের ভাষায় রাজপুতানার অবস্থা কল্পনা করা যায় যদি চিড়িয়াখানার দরজা খুলে রক্ষীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। রাজপুতানার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে রাজপুত বীরত্ব শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বুন্দি, জয়পুর, যোধপুরে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফলে রাজপুতানা যখন ধ্বংসের মুখে তখন মারাঠারা এসে এই দলাদলির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।

মারাঠারা উত্তর ভারতে রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা বাজীরাও-এর সময় থেকেই আরম্ভ করে। বালাজী বাজীরাওর আমলে রাজপুতানার গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে একপক্ষকে জয়ী হতে সাহায্য করে প্রচুর অর্থের দাবি করে মারাঠারা তাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে। এ ভুল পরিশোধ করার ক্ষমতা রাজপুত রাজাদের ছিলনা। কিন্তু অর্থসংগ্রহের জন্য অল্প দরবেশে যথেষ্ট অপকার করলেও মারাঠা সাম্রাজ্যের কোনও সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিলনা। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করবার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে খরচ

পোষাত না। পেশোয়া তার সৈনাধ্যক্ষদের নিকট চিঠিতে এই "ক্ষয়রোগ সমান ক্ষয়রোগ" প্রায়ই উল্লেখ করতে বাধ্য হত। ১৭৫৪-৫৫ সালে পেশোয়া বালাজীর ছোটভাই রঘুনাথরাও দিল্লীতে মারাঠা প্রভাব বিস্তার করে। ইমাদ-উল্-মুল্‌কের আধিপত্য মারাঠা সহযোগিতার উপরই নির্ভর করত। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে ১৭৫৭ সালে যখন আহম্মদ শাহ দুররাণী তার নিজের ৩০,০০০ সৈন্য ও তার ভারতীয় মিত্র সৈন্য ২৫০০০ নিয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন মারাঠা সেনানায়ক আন্তাজী তার ২০০০ মারাঠা সৈন্য নিয়ে দিল্লী থেকে সরে পড়াই সুবুদ্ধির পরিচয় মনে করেছিল। যে সময় আহম্মদ শাহের সৈন্যরা রোহিলাদের সঙ্গে মিলে মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুলের মন্দির কলুষিত করছিল ও যমুনার জলকে রক্তে রাঙ্গা করে দিয়েছিল সে সময় মারাঠারা জাঠদের সঙ্গে মিলে বাধা দেওয়ার কোনও চেষ্টা করেনি। অথচ জাঠরাজা সুরজমল তাঁর ছেলে জওহর সিংকে জাঠ সৈন্য দিয়ে পাঠিয়েছিল দুররাণী সেনানায়ক জাহান খাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য। চৌমুহার যুদ্ধে জাঠরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রজধাম রক্ষা করতে পারেনি। এর আগে মারাঠারা তিন বৎসর ধরে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব শোষণ করেছিল; কিন্তু মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবনের পবিত্র দেবমন্দিরসমূহ রক্ষা করার জন্য মারাঠারা যত্ন প্রাণ দিয়েছিল ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয়না। ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন মারাঠাদের "হিন্দু বাদশাহীর" সংজ্ঞার মধ্যে রক্ষা করার দায়িত্ব বোধ হয় অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। দিল্লী অধিকার করার পর আহম্মদ শাহ প্রায় তিনমাস এখানে ছিল। সে সময় রাজপুতানায় মারাঠা সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৬,০০০। এত অল্প সৈন্য নিয়ে দুররাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া তাদের সম্ভবপর ছিলনা। কিন্তু মথুরা বৃন্দাবনের দেবমন্দির সমূহ ধ্বংস করার জন্য হিন্দুর শত্রু বলে আহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুতির কোনও সংবাদ আমরা পাইনা। যদি মারাঠাদের হিন্দু বাদশাহী এ সময়ে একটা ঐতিহাসিক সত্যই হত তাহলে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে এর জন্য যথোপযুক্ত আলোড়ন কি পরিলক্ষিত হত না? তাদের অক্ষমতার জন্য লজ্জা ও ঘৃণা বোধের কোনও লক্ষণ আমরা দেখিনা। আহম্মদ শাহ দিল্লী থেকে চলে-যাওয়ার কিছু দিন পরেই রঘুনাথ রাও আবার দিল্লীতে আসে। কয়েক মাস পরে অলওয়র-দোয়াবের মুসলমান শাসনকর্ত্তা আদিনা বেগের আমন্ত্রণে মারাঠাদের পাঞ্জাব অভিযান সুরু হয়। লাহোর থেকে আহম্মদ শাহের পুত্র তৈমুরকে তাড়িয়ে দিয়ে মারাঠারা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর অগ্রসর হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। হয়ত বা তারা আটক পর্য্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু এর ফলেই আহম্মদ শাহের সঙ্গে তাদের একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। মারাঠা সামরিক শক্তি এ সীমান্ত রক্ষা করার পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট ছিলনা।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। আহম্মদ শাহের

যাছাই সৈন্য ছিল ৬০,০০০ আর সদাশিব রাও ভাউএর সৈন্য ছিল ৪০,০০০। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মারাঠাদের বল সৈন্য সংখ্যার জন্যে যুদ্ধে যে সৈন্যবিন্যাস হয়েছিল তাতে প্রয়োজনমত পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত সৈন্য দিয়ে কোনও অংশকে সাহায্য করা সম্ভব হয় নি। পানিপথের যুদ্ধে আহম্মদ শাহের সৈন্য দেড়গুণ বেশী থাকায় অল্প যুদ্ধে তাঁর জয় সম্ভব হয়েছিল। বোধহয় অন্য কারণ অনুধাবনের তত প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেন বারবার এমন হয়েছিল? ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দুররাণীর দিল্লী আক্রমণের সময় মারাঠাদের যথেষ্ট সৈন্য উত্তর ভারতে ছিলনা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী এই চূড়ান্ত যোঝাপড়ার সময় কেন মারাঠাদের সৈন্য সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে এত কম ছিল? মারাঠাদের ঔদ্ধত্য ছিল অপরিসীম। সে জন্য জাঠ ও রাজপুতদের সঙ্গে মারাঠাদের মিলন অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সুরযমল তখন উত্তরভারতে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হিন্দু রাজা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ সুরযমলকে জব্দ করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত সুরযমল কোনও অর্থ বা উপঢৌকন আহম্মদ শাহের কাছে পাঠায়নি। পানিপথের পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ পলাতক আশ্রয়প্রার্থী মারাঠাদের ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সুরযমল সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। পানিপথের যুদ্ধে যে মারাঠারা সুরযমলের কোনওরূপ সাহায্য পায়নি সে জন্য মারাঠাদের অবিবেচকতা ও রাজনীতিজ্ঞানের অভাবই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। পাঞ্জাবে মারাঠারা গিয়েছিল, কিন্তু শিখদের দলে টানতে পারেনি যদিও শিখরা আহম্মদ শাহেরও শত্রু ছিল। রাজপুতরা বোধ হয় মারাঠাদের পানিপথের পরাজয়ে হর্ষোৎফুল্ল হয়েছিল। যেখানে সিখ, সুন্নী, মোগল, পাঠান উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র মুসলমান সামরিক শক্তি আহম্মদ শাহের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছিল সে সময় ফাঁকা "হিন্দু পাদশাহীর" বুলি আওড়ান ভিন্ন হিন্দু শক্তি সংগঠনের কোনও রাজনৈতিক চেষ্টাই হয়নি। আর পেশোয়া বালাজী মারাঠা সামরিক শক্তি বিক্ষিপ্ত করে এমনভাবে অপচয় করেছিল যার ফলে মারাঠারা কোথাও সুবিধা করতে পারেনি। পানিপথের যুদ্ধের প্রায় একবৎসর আগে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হায়দারাবাদের নিজামকে উদ্গীরের যুদ্ধে মারাঠারা এমনভাবে পরাজিত করেছিল যে, নিজামের রাজশক্তির অবসানের সূচনা হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। উল্লসিত মারাঠা প্রশস্তিকার পেশোয়াকে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিল যে আলেকজাণ্ডারের জন্মনক্ষত্রে পেশোয়ার জন্ম হয়েছিল। যে দিকেই তার দৃষ্ট দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় সে দিকেই তার শত্রুরা ধ্বংস হয়ে অণুতে মিশে যায়। কিন্তু সেই সময় খবর আসে যে উত্তর ভারতে বরারিঘাটের যুদ্ধে আহম্মদ শাহ আবদালী উত্তর ভারতের মারাঠা সৈন্যদলের অধিনায়ক দত্তজী সিন্ধিয়াকে পরাজিত ও নিহত করেছে। নিজাম এই খবর পেয়ে বিশেষ উল্লসিত হয় এবং উদ্গীর বিজয়ী সৈন্যদলের এক অংশ নিজামকে পাহারা দেওয়ার জন্য

দক্ষিণ ভারতেই রাখতে ব্যস্ত হওয়ায় আলীর বিরোধী দলকে সাহায্য করায় জন্য মহীশূরেও এ সময় একদল মারাঠা সৈন্য নিযুক্ত ছিল। এভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মারাঠা সামরিক শক্তি কোথাও জয়লাভ করতে পারেনি।)

/ উত্তর ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠা শক্তির যে বিপর্যয় হল তার ফলে আবার উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে মারাঠাদের এক পুরুষ কেটে গেল। দশ বৎসর পরেই মারাঠারা অবশ্য আবার উত্তর ভারতে এসেছিল, কিন্তু ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত তাদের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্ধিয়ার চেষ্টায় আবার মারাঠা আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ আসে, কিন্তু সে সময় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতটা বদলে গিয়েছিল যে মারাঠাদের শেষ পর্যন্ত সুবিধা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। বাংলা, বিহার ও অযোধ্যায় ইংরেজ প্রভুত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। পাঞ্জাব তখন শিখদের দখলে। মাঝে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে মারাঠা আধিপত্য কুড়ি বৎসর টিকে ছিল।

মারাঠাদের উপর মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ফলে যে গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছিল মারাঠারা তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি, কিন্তু শিখরা করেছিল। সুরেমলের নেতৃত্বে জাঠরা ছিল উত্তর ভারতের তখন সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হিন্দু শক্তি। কিন্তু ১৭৬৩ সালে সুরেমল নিহত হলে জাঠদের মধ্যে রাজশক্তির অপব্যবহার ও ক্ষমতার জন্য বাড়াবাড়ি এমনভাবে চলতে থাকে যে তাদের সুসংবদ্ধভাবে কোনও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ক্ষমতা চলে যায়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিখরা যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে জাঠরা কেন তা পারেনি। শিখদের একত্ববোধ জাঠদের মধ্যে ছিলনা। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর কাশ্মীর থেকে সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত আবদালীর আধিপত্য প্রকাশ্যে বাধা দেওয়ার মত ভারতবর্ষে কোনও শক্তি ছিলনা। ১৭৬১ থেকে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে একাধিপত্য ছিল আহম্মদ শাহের ক্রীড় নজীব-উদ্-দৌলার। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম বিহার অঞ্চলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ব্যর্থমনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত বৃটিশদের পেন্সনভোগী ভাবে এলাহাবাদে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিখদের সঙ্গে আহম্মদ শাহের অনেক ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছিল কিন্তু আহম্মদ শাহ এ ধারণা বোধহয় কখনও করতে পারেনি যে শিখরাই তার পাঞ্জাবের আধিপত্য স্পর্ধার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে পাঞ্জাব তার কাছে থেকে কেড়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। তাদের বাড়াবাড়ি দেখে আবদালী ১৭৬২ সালে আবার পাঞ্জাবে এসে কুপ-ভার্ত্তালার যুদ্ধে অন্ততঃ দশ হাজার শিখকে মেরে ফ্লুনিয়ে দিয়েছিল যে আহম্মদ শাহের সামরিক শক্তিকে অপমান করার ফল কি। কিন্তু আওরঙ্গজীব যেমন মারাঠা দমন করতে পারে নি, আহম্মদ শাহও তেমনি দুর্দ্ধর্ষ শিখদের শেষ পর্যন্ত দাবিয়ে রাখতে পারল না। সশস্ত্র অদমনীয় এই শিখ জাতির বিরুদ্ধে ভারতের কোন

মুসলমান শক্তি তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। পূর্ব্বে পাঞ্জাবের শিখরা নজীব -উদ্-দৌলার উপরও এমন ভাবে চাপ দিয়েছিল যে নজীব শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারলেও বুঝতে পেরেছিল যে তার উত্তরাধিকারী বেশীদিন এদের আটকাতে পারবে না। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আহম্মদ শাহ বারবার পাঞ্জাবে এসেছে, কিন্তু আক্রমণের প্রকোপ কমতে কমতে শেষ পর্য্যন্ত আক্রমণ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। সিন্ধুনদের পশ্চিমে তার আধিপত্য টিকে থাকল কিন্তু সিন্ধুর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের উপর তার অধিকার শিখদের হাতে ছেড়ে দিতে হল। মারাঠাদের অক্ষমতার ফলে ভারতের যে ক্ষতি হতে পারত শিখরা কতকটা সে ক্ষতি পূরণ করেছিল। শুধু তাই নয়, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম মারাঠাদের সঙ্গে দিল্লী ফিরে এসেছিল। কিন্তু মারাঠারা পেশোয়া নারায়ণরাওয়ের মৃত্যুর পর উত্তর ভারত থেকে চলে যায়। প্রথমে তাদের গৃহযুদ্ধ ও পরে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের জন্য তারা উত্তর ভারতে অনেকদিন আসতে পারে নি। সে সময় মোগল রাজশক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করার যে বৃথা চেষ্টা হয়েছিল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না।

ওয়ারেন হেষ্টিংস মেজর ব্রাউনকে দিল্লী পাঠিয়েছিল এই অভিসন্ধি নিয়ে যে সম্ভব হলে মোগল সম্রাটকে অযোধ্যার নবাবের মত সাক্ষীগোপাল করে একজন মুসলমান আমীরকে রাজপ্রতিনিধি খাড়া করে তারই আড়ালে মোগল সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু ইংরেজের দখলে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্ধিয়া মোগল সম্রাটের ওয়াকিল-ই-মুতলাক হওয়ার পর থেকে ১৮০৩ সাল লাসওয়ারীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত দিল্লীতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তার হতে যে বিলম্ব হয়েছিল তার জন্য কৃতিত্ব মহাদজী সিন্ধিয়ার। তুকার যুদ্ধের পর ১৪ মাস (১৭৮৭-১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ) মহাদজী সিন্ধিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়। তখন তার দিল্লীর উপর আধিপত্য সাময়িকভাবে চলে যায়। নজীবের পৌত্র রোহিলা গোলাম কাদের ও মোগল সেনানায়ক ইসমাইল বেগ তখন মোগল সম্রাটের বিধিলিপি নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে। শেষের দিকে গোলাম কাদের দ্বিতীয় শাহ আলমকে সিংহাসনচ্যুত করে। তারপরে দিল্লী রাজপ্রাসাদে যে তাণ্ডব সুরু হয় তার তুলনা ইসলামের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের পাতায় আর মেলেনা। গোলাম কাদের নিজের সম্বন্ধে নাকি বলেছিল যে সে খোদার চাবুক—কাহার-ই-খুদা। সে নিজে শাহ আলমের বুকের উপর বসে ছোরা দিয়ে এক চোখের তারা উপড়িয়ে ফেলে আর এক চোখের তারা উপড়িয়ে নেয় তার এক সহযোগী কান্দাহারী খাঁ। গোলাম কাদের সম্রাটের চিত্রকরকে ডেকে এই ছবি আঁকতে বলে। দিল্লীর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মোগল বেগমদের ও শাহজাদীদের যে অসম্ভ্রম ও লাঞ্ছনা

হয়েছিল তার বর্ণনা ঐতিহাসিক খুবই সংযত ভাষায় দিয়েছেন। তা থেকেই দিল্লী সাম্রাজ্যের সেই শোচনীয় শেষ অধ্যায়ের চিত্র সম্পূর্ণভাবে কল্পনা করা যায়। কোনও মারাঠা, জাঠ বা শিখ এই শোচনীয় শেষ অধ্যায়ের জন্য দায়ী নয়। দক্ষিণ ভারতের কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল গোলাম কাদের, কিন্তু তার এই কয়মাস আধিপত্যের সময় সে দিল্লীর জুম্মা মসজিদের একটি গম্বুজ থেকে সোনার পাতও সরিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য মহাদজী অপমানিত, অত্যাচারে জর্জরিত, অন্ধ মোগল সম্রাটের আকাঙ্খিত প্রতিহিংসা গোলাম কাদেরের বিরুদ্ধে নিতে পেরেছিল, কিন্তু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের এই পৈশাচিক ঘটনাবলীই মোগল সম্রাটের শেষ সম্বল তার সম্ভ্রমও ধূলিধূসরিত করেছিল। উৎসাহী ধর্মান্ধ মুসলমান রাজনৈতিক প্রচারক যাই বলুক না কেন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস তার সত্যিকারের কোনও খোরাক জোটায়না। তবে প্রচার কার্যের ধর্মই সত্যঘটনাবলী বিকৃত করা। ইতিহাসের সাক্ষ্য সে মানুষে এ আশা রাখা বোধ হয় অন্যায়।

শেষ খণ্ডে ঐতিহাসিক মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস দিয়েছেন এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। মহাদজী সিন্ধিয়া ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মারা যায়। 'তার ইউরোপীয় ধরণে সুসজ্জিত বিজয়ী সৈন্যদল উত্তরাধিকারী সূত্রে দৌলতরাও অবশ্য পেয়েছিল। কিন্তু মহাদজীর গভীর রাজনীতিজ্ঞান ও কর্মকুশলতার স্থানে দৌলতরাওর অক্ষমতা ও অব্যবস্থিত চিত্ততা সব নষ্ট করে দিল। নানা ফড়নবীশের অন্ধ ক্ষমতা লালসা তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছিল। সে উত্তর ভারতে সিন্ধিয়া ও হোলকারের দলাদলি ও শেষে গৃহযুদ্ধ ইচ্ছা করে জিইয়ে রেখে দিয়েছিল। মহাদজী সিন্ধিয়া যখন ১৭৮৭-৮৮ সালে উত্তর ভারতে বিপন্ন, তখন বারবার কাতর অনুরোধ করেও সে পুণা থেকে কোনও সাহায্য পায়নি। মারাঠা লিপিকার লিখেছিল যে চাতক পক্ষী যেমন বৃষ্টির জন্য করুণ নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে মহাদজী তেমনি অপলক দৃষ্টিতে দক্ষিণ থেকে সৈন্য আসছে এই আশায় দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজের চেষ্টাতেই তার ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল। মহাদজীর মৃত্যুর পর নানা ফড়নবীশ তার ক্ষমতালোলুপতার জন্য মারাঠা শক্তিকে আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। তারপরে গৃহ যুদ্ধের পালা—সেওড়া, নেউরি, সাতওয়াস, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, বরমতি ও পুণার যুদ্ধে দৌলতরাও সিন্ধিয়া, যশোবন্তরাও হোলকার ও পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও মারাঠা রাষ্ট্রশক্তিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এই গৃহযুদ্ধের ফলে প্রথমে মালবে বিশৃঙ্খল অবস্থা ও পরে মহারাষ্ট্র দেশেও যে ধ্বংস সুরু হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার বিশেষ কারণ নাই। পরাধীনতা এই গৃহযুদ্ধেরই শেষ ফল।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইতিহাসের একটি নিকৃষ্টতম চরিত্র। যশোবন্তরাও

চোলকাঁয়ের প্রতিহিংসায় ভরে রাজীরাও বৃটিশ আধিপত্য মেনে নিল। তারপরে মারাঠাদের ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে আলীগড় ও দিল্লী, লাসওয়ারী ও আসাইর যুদ্ধে মারাঠা সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনায় নেতৃত্বের বিফলতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। নিষ্ক্রোধ দৌলতরাও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনেও উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিলম্ব করেছিলেন। তার ফলে লর্ড ওয়েলেসলী সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ পায়। তারপর যখন বৃটিশ সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ প্রস্তুত দৌলতরাও হঠাৎ আক্রমণ আরম্ভ করে—পতঙ্গ যেমন প্রদীপের চতুর্দিকে অনেকক্ষণ ধরে ভন ভন করে হঠাৎ অগ্নিশিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস পড়ে আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেও সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনানায়কদের পাইকারী লাগাতার পাঠকদেও খানিকটা বিহ্বল করে দেয়। তাদের অধীনস্থ সৈন্য যে অভিভূত হয়ে পড়েছিল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিবরণী আমরা সাধারণতঃ বৃটিশ দলের থেকেই সংগ্রহ করি। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, ঐতিহাসিক এখন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরই পরিদর্শন করতে পারে। সমসাময়িক ফরাসি ও মারাঠী চিঠিপত্র থেকে তিনি মারাঠা শিবিরের বিশ্বাসঘাতকতা, ঔদাসিন্য, অস্থিরচিত্ততা ও বিফলতার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আসাইর যুদ্ধে ওয়েলিংটন তার তেজোদীপ্ত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিরাট মারাঠা সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেছিল, ইংরেজ পক্ষের এ বর্ণনা সত্যের অপলাপ, মারাঠাদের সৈন্য সংখ্যা কাগজে কলমে যাই থাকুক না কেন, সামনাসামনি যুদ্ধ অল্প কয়েকটি পল্টনই করেছিল। লাসওয়ারীর যুদ্ধের বর্ণনায় বৃটিশ তরফের কাগজপত্রে জাঠ ও আলোয়ার সৈন্যরা যে মারাঠাদের পরাজিত করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল সে কথার উল্লেখ নাই। যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমনি সামরিক শক্তির পরিচয়ে মারাঠা নেতৃত্ব এসময়ে সম্পূর্ণ দেউলিয়া। মারাঠা জাতির মোগল রাজশক্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার মত যোগ্যতা শেষ পর্যন্ত কিভাবে হারিয়েছিল এই ইতিহাসে আমরা তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের এই চারখণ্ড ইতিহাস অতীতের ব্যর্থতায় মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। "ঐতিহ্যহীন কীর্তিহীন পরাজয়" মনে যে গ্লানি এনে দেয় তার রেশ থেকেই যায়। এ ইতিহাস মোগল পারিষদবর্গের দলাদলির ইতিহাস নয়, মোগল রাজপ্রাসাদে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়, মোগল, মারাঠা ও জাঠদের ব্যর্থতার বর্ণনা ও কারণ বিশ্লেষণে এ ইতিহাস সমৃদ্ধশালী। অতীতের জন্য মনে যেমনি গ্লানি উপস্থিত হয় সেরূপ আবার অতীত ঘটনাবলীর স্বরূপ আমাদের বর্তমান প্রণিধান করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে,- আর দলাদলি, ঘোঁয়াঘেঁষির ধান্দা যারা অতীত থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তারা যদি একেবারে সত্যদ্রষ্টা না হয় তাহলে এই ইতিহাসের ঘটচ্ছায়ে তাদের বর্তমানের উৎকট্য প্রশমিত হবে।

ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা : প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৭

সম্পাদক :
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীসরোজকুমার সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচীপত্র

বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা

শ্রীযদুনাথ সরকার ১৩৫

ইতিহাস-দর্শন

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু ১৪০

কবি কল্‌হণ এবং তৎকৃত রাজতরঙ্গিণী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ১৫২

বর্তমান যুগের একজন ফরাসী ঐতিহাসিক—মার্ক ব্লক

শ্রীশিবপদ সেন ১৬০

ঐতিহাসিক কিসার

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী ১৬৯

সুবা বাংলায় পর্তুগীজ বাসিন্দা

শ্রীউপনসুষার রায়চৌধুরী ১৮৫

কয়েকটি সংবাদ

বঙ্গীয় পরিষদ • ইতিহাস কংগ্রেস • আচার্য যদুনাথ সম্বর্ধনা ১৯২

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—দেড় টাকা, বার্ষিক পাঁচ টাকা

প্রকাশক :
শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীব্রজেন্দ্রবিনোদ সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ইতিহাস

প্রথম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৫৭ [তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভারতের ইতিহাসে গবেষণা করিবার উচ্চ আকাঙ্খা আমার মনে প্রথম জেগে উঠে, বি. এ. পরীক্ষা দিবার পরই, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। আর আজ সে দিন হইতে ষাট বৎসর পরে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার কি প্রগতি হয়েছে তাহা বিচার করিবার অবসর পেয়েছি। এই ষাট বৎসরে বাঙ্গলা দেশে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইয়া যাই। আমাদের দেশের প্রবীণ লেখক ও নবীন গবেষক ছাত্র ইতিহাস চর্চার প্রণালীতে এবং রচিত ইতিহাসের উৎকর্ষে আশ্চর্য উন্নতি সাধন করেছেন, এবং সে উন্নতি এ পর্যন্ত ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এইসব কর্মীরা বছর বছর উচ্চ হইতে উচ্চতর, কঠিন হইতে কঠিনতর স্তরে উঠেছেন।

দু একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই সত্যটি পরিষ্কার বুঝান যাবে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের আদি যুগের কর্মী কৃষ্ণবিহারী সেন অথবা রামদাস সেনের লেখার পাশে আজকার দিনের বেণীমাধব বড়ুয়া অথবা প্রবোধচন্দ্র বাগচীর রচনা রাখা যাউক। অথবা ব্রিটিশযুগের ইতিহাসে রজনী গুপ্ত এবং অক্ষয় মৈত্রের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের পাশে আমাদের সমসাময়িক ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য নবীন গবেষকের শ্রমফল বসাইয়া বিচার করা যাউক। প্রাচীন হিন্দুযুগের গবেষণায় সেই সেকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত বৃহদ্দেবতা ও ললিতবিস্তারের সঙ্গে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পরে অধ্যাপক ম্যাকডনেল সম্পাদিত বৃহদ্দেবতা এবং লিউমান সম্পাদিত ললিতবিস্তার তুলনা করা যাউক।

অথচ ইংরাজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগের ভারতীয় গবেষকগণ প্রত্যেকে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং যথাসাধ্য শ্রমও করেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শ্রমফল জগতের পণ্ডিতসভায় খাঁটি জিনিষ বলিয়া স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, পরবর্তী কর্মীদের রচনা তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে।

এই পার্থক্যের কারণ দুটি। প্রথমতঃ বর্তমানের কর্মীরা এক ভিন্ন প্রণালী মেনে চলেন, এবং দ্বিতীয়তঃ এখন আমাদের হাতে যে ঐতিহাসিক উপাদান এসে জমা হয়েছে তাহা খাফি খাঁ বা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যুগ থেকে অনেক বেশী, ফলে তাঁহারা ও আমরা যেন দুটি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন যুগের লোক। এখন আর সিয়ার-উল-মুতাখরীনের হাজী মুস্তাফাকৃত ইংরাজী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আলীবর্দী ও সিরাজ, মিরজাফর ও নবাব কাসিম আলীর ইতিহাস লেখা চলে না।

গবেষণায় এই নবীন প্রণালীর দুইটি ধারা—প্রথমটি এই যে, গবেষককে একেবারে আদিতম ঐতিহাসিক উপাদান অর্থাৎ দলিলে পৌঁছিতে হবে। সর্বপ্রথম সাক্ষীর এজাহার, যতদূর সম্ভব, বাহির করিতে হইবে এবং তাহা আদি ও অ-বিকৃত আকারে, অর্থাৎ সাক্ষীর নিজের কথাগুলি পড়িতে হইবে, তাহার অনুবাদ বা পরবর্তী কালের অন্য লেখকের গ্রন্থে দেওয়া সংক্ষিপ্তসার পড়িলে চরম সত্যে পৌঁছা যায় না। আমাদের মধ্যে প্রথম যুগে বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ হয়, বিধুশেখর যে সংস্কৃত হইতে ফরাসী অনুবাদ এবং সংকলন প্রকাশ করেন অথবা কাউএল ও রিজ্‌ ডেভিডস্‌ পালি গ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ ছাপাইয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া। সে প্রণালী এখন অচল হয়েছে। আমাদের দেশের গবেষকগণ আদি পালি এবং নেপাল ও মধ্য-এসিয়ায় পাওয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য না পড়িয়া এক কথাও লিখিতে পারেন না।

তেমনি মুঘল ইতিহাসের ক্ষেত্রেও। খাফি খাঁ তাঁহার ইতিহাস হায়দরাবাদে বসিয়া ১৭৩৪ সালে সমাপ্ত করেন। শাহজহান (রাজত্ব শেষ ১৬৫৮ সালে) এবং আওরংজীব (মৃত্যু ১৭০৭ সালে) এই দুই বাদশা সম্বন্ধে খাফি খাঁ প্রত্যক্ষদর্শী নহেন; অথচ যেহেতু খাফি খাঁর পারসী ইতিহাসের এই অংশটা এলিয়ট ও ডসন ইংরাজীতে অনুবাদ করে ছেপেছেন, অতএব আমাদের সেকালের কর্মীদের এই অনুবাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন পন্থা ছিল না। কিন্তু ইহাতে মৌলিক গবেষণা হইতে পারে না। ঐ দুই বাদশার হুকুমে লিখিত পার্সী ইতিহাসই আদি উপাদান। অবশ্য তাহার মধ্যে পোশামোদ ও অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা পদে পদে বিচার করিয়া, কষ্টি পাথরে ঘষিয়া তবে খাঁটি সত্য লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বাদশাদের সরকারী ইতিহাস, অর্থাৎ পার্সী বাদশানামা, আলমগীরনামা ইত্যাদি পর্যন্ত আদিতম উপাদান নহে; এগুলি পরে রচিত গ্রন্থ। তাদের ভিত্তি অপর এক শ্রেণীর পার্সী দলিল, যাহার নাম আখ্‌বারাৎ অর্থাৎ হাতে লেখা সংবাদপত্র, এবং ডেস্‌পাচ্‌ অর্থাৎ কর্মচারীদের পক্ষ হইতে পাঠান রিপোর্ট বা চিঠি। এগুলি বাদশাহী দপ্তরখানায় জমা রাখা হইত, এবং ইহা পড়িয়া ঐসব "নামা" বা সরকারী ইতিহাসের লেখকেরা তাঁহাদের গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করিতেন, যেমন আজকাল সব দেশে সরকারের পক্ষ হতে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করা হচ্ছে। আমি

আওরংজীবের রাজ্যকালের এবং অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া, মারাঠা আবদালী শিখ রাজপুতদের দিল্লীর তখৎ ঘিরিয়া সন্ধি-বিগ্রহের সহস্র সহস্র আখবারাৎ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইয়াছি।

এই হল ইতিহাস-কলিশী ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে অক্লান্ত যাত্রা। তার পর, নবীন প্রণালীর দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে এই যে, সবগুলি সাক্ষীকে একত্র করতে হবে। যত বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন স্থানে, আমার নির্বাচিত বিষয়ের উপাদানগুলি আছে তাহা সংগ্রহ করে পড়তে হয়, ভিন্ন ভিন্ন দলের সাক্ষীর জবানবন্দীর ঘাতপ্রতিঘাত সন্দেহের চোখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তবে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা যায়। যেমন, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমায় সবজজের সামনে কুমারের পক্ষে এক হাজার এবং রাণীর পক্ষে ৯৯৯ জন সাক্ষী—অথবা ঐরূপ—ডাকা হয়। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একতরফা বিচারের রায় মাত্র তাহা স্থায়ীভাবে গৃহীত হতে পারে না।

এইক্ষণে সব দেশ থেকে সব ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক মালমসলা সংগ্রহ করবার সুযোগ আজকাল যেমন হয়েছে তাহার দশভাগের এক ভাগও ষাট বৎসর আগে ছিল না। এর কারণ এখন একরকম খুব সস্তা ফটোগ্রাফ হয়েছে যাহাতে বিলাতের দুষ্প্রাপ্য বই বা হস্তলিপির অবিকল ছবি আমরা এদেশে বসে আনাতে পারি, এগুলিতে হাতে নকল করার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ও বিরাট ব্যয় নাই। আর জগতে যত বিখ্যাত গ্রন্থাগার আছে তাহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিপি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতির অতি বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ তালিকা ছাপা হয়েছে। এই সব *Catalogue raisonné* গুলি পর্যন্ত আশ্চর্য শিক্ষাপ্রদ।

বিগত ষাট বছরে আমাদের মধ্যে মৌলিক গবেষণায় এত উন্নতি হয়েছে, তাহা যে ইউরোপীয়দের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও সংঘর্ষের ফলে, একথা অস্বীকার করা যায় না। ভারত স্বাধীন হওয়ায় ফলে এই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণার উৎকর্ষ যাহাতে দিনদিন নিকৃষ্ট এবং অবশেষে বিনষ্ট হইয়া না যায়, সেদিকে আমাদের শিক্ষক ও চিন্তারাজ্যের নেতাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, গবেষণার জীবনমন্ত্র হচ্ছে ক্রমোন্নতি, eternal progression; এই রাজ্যে কোথায়ও পৌঁছিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিবার, ঘুমাইবার সাধ্য নাই; থামিলেই অবনতি, এবং পশ্চাদ্‌গমনেই মৃত্যু। সেই জন্য আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে স্থায়ী এবং প্রাণবন্ত করিতে হইলে দুটি জিনিষ চাই—গুরুপরম্পরা ও গ্রন্থভাণ্ডার। অর্থাৎ যতটুকু জ্ঞান আজ পর্যন্ত লাভ করিয়াছি তাহা চালাইবার, বাড়াইবার জন্য আমাদের পুত্রপৌত্রদের মধ্য হইতে ক্রমাগত নেতা সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানের প্রদীপ একবার নিবিলে আবার জ্বালান কঠিন।

এইসব গুরু ও তাঁহাদের শিষ্যগণ মাতৃভাষা ও বিশ্বভাষা (অর্থাৎ ইংরাজী)

ছাড়া আবশ্যকমত আর কোন কোন ভাষা শিখিতে যাবা। মারাঠী ও পার্শী ভাষা না জানিলে মহারাষ্ট্রের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে গবেষণা মৌলিক হইতে পারে না, সত্যকলপ্রসূ হইতে পারে না। এক শিবাজীর জীবনী রচনা করিতে গিয়া আমাকে ভাল করিয়া পার্শী ও মারাঠী ভাষা, এবং কাজ চলার মত পোর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষা শিখিতে হয়, তাছাড়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও রাজস্থানী ভিন্ন ভাষা ত আছেই।

দ্বিতীয় সমস্যা, উপকরণের পুঁজি, অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর এবং পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী এদেশে আমাদের হাতের কাছে রাখিতে, গড়িতে হইবে। এইসব গবেষণার লাইব্রেরীতে হস্তলিপি ও দলিলের ত কথাই নাই, ছাপান প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পণ্ডিতসমিতির পত্রিকার ধারাবাহিক সেট্, প্রামাণিক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, যেমন *Encyclopadia of Islam* ৪ ভলুমে সম্পূর্ণ, যাহা এখন আড়াই হাজার টাকায়ও পাওয়া যায় না, এলিয়ট ও ডসন ৮ ভলুম, যাহার দাম এখন এক হাজারে পৌঁছিয়াছে অথচ ২।৩ বৎসর পরেও এক সেট্ বাজারে দেখা দেয় না—এবং বিস্তৃত ম্যাপ সংগ্রহ, ও জগতের সব বিখ্যাত লাইব্রেরীগুলির হস্তলিপির ও মুদ্রার ক্যাটালগ, এ সমস্ত জুটাইয়া পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে। গবেষণার কাজে এরূপ পূর্ণাঙ্গ reference libraryর যে কত মূল্য তাহা অনেকে জানেন না। সেই কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না সেই জানে।

পুণায় মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় দুবৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রধানতঃ হিন্দুযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যে গবেষণা হইবে। সুতরাং তাঁহারা অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ও পত্রিকা সংগ্রহ বত্রিশ হাজার টাকায় কিনিয়া কলিকাতা হইতে পুণায় লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ এই ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমেরিকার সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয় জগৎবিখ্যাত জর্মান ঐতিহাসিক কন্ রাঙ্কের সমস্ত লাইব্রেরী—পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, তাঁর নিজ হাতে লেখা নোট্ তর্জমা ও সংক্ষিপ্তসার, এমন কি খণ্ড খণ্ড কাগজ পর্যন্ত কিনিয়া বার্লিন হইতে মার্কিন দেশে লইয়া গিয়া, তাহা সাজাইয়া তালিকা বাহির করিতেছে, গবেষকগণ ঐ শহরে ছুটিয়া যাইবে। আর ভারতের কি দশা, তাহা আমিই জানি, যখন আমার নিজস্ব লাইব্রেরীর সাহায্য লইবার জন্য ব্যাকুল অসহায় গবেষকগণ আমাকে চিঠি লেখে। আমার লাইব্রেরীর কোন কোন বিভাগ ভারতবর্ষে অতুলনীয় হইলেও এটা একজন মধ্যবিত্ত লোকের গড়ে তোলা, একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি। আমরা চাই কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বসাধারণের জন্য এরূপ সংগ্রহ রাখা।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ একবার কাশীতে যান। সেখানকার বঙ্গসাহিত্য সভার অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি একটি মর্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—"আমরা কি চিরদিনই ইউরোপের কাছে ঋণী থাকব? চিরকালই কি তাদের কাছে ভিক্ষা চাইব? আমাদের সৃষ্টিকরা কিছুই কি বিশ্বজগৎকে দিতে পারব না? আমাদের দেশে অনেক উচ্চশিক্ষিত এলোপাথিক ডাক্তার আছেন, যাদের মধ্যে প্রত্যেকে লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন, অথচ তাঁহারা কেহই একটি নূতন ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই, ক্যাপা কুকুরে কাটার অব্যর্থ ঔষধ, টিপথেরিয়ার ঔষধ, ইত্যাদি সব সাহেবেরা গবেষণা করে বাহির করেছেন, জগৎকে দিয়াছেন। আমরা কোন ব্যারামেরই বিশ্বমানবের গৃহীত ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আবার, ভারতে এত ছোট ছোট উপভাষা আছে, তাহার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সাহেব মিশনরীরা চর্চা করে প্রকাশ করিতেছেন; অসংখ্য ছোট অসভ্য জাতি আছে, তাহাদের ধর্ম, রীতি-নীতি জনশ্রুতি ও ছড়া, এসবই সাহেবেরা লিপিবদ্ধ করছেন। বঙ্গের বাহিরে অসংখ্য শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কাজগুলি করবার প্রচুর সুবিধা আছে, অথচ তাঁহাদের কেহই এদিকে দৃষ্টি দেন না। ভারতের এই দৈন্য কিসে ঘুচবে?"

গবেষণার প্রণালী ও উপকরণ সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম, তাহা আমাদের সমস্যার অন্তরের কথা নহে। চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ ভক্তির নানা ভাবের ব্যাখ্যা করিবার পর মহাপ্রভু বলিতেছেন, "এহ বাহ্য"—এটা বাহিরের কথা, ভক্তিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নহে। সেইরূপ যদি আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে সজীব সবল রাখিতে হয় তবে আমাদের কর্মীদের চাই চিত্তশুদ্ধি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক গবেষণার সত্য-সন্ধানী নিষ্কাম সাধককে দেশ-কাল-সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইবে, স্বদেশী লোকের সস্তা বাহবা পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে হইবে। হোগলকুড়ীয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই রচনার জন্য ডাক্তার উপাধি দিবেন, অথবা জুতু-খানসামা সেকেণ্ড লেনের সাহিত্যসভা আমার এই গ্রন্থ পুরস্কৃত করবেন—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত গবেষকের আদর্শ হইতে পারে না। বাহিরের বিশ্বসভায়—যাহাকে republic of letters বলা হয় সেই সার্বজনীন পণ্ডিতসমাজে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গবেষণা স্বীকৃত হয় নাই ততক্ষণ আমি নিজ শ্রমফলে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না,—এই কঠোর ব্রত বুক পেতে নিতে হবে। এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের মধ্যে কম কর্মীই নিজ সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্র ভুলিলে আমরা নিশ্চয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।

ইহাই আমার শেষ বাণী।*

---

* আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের অশীতিতম পূর্তি উপলক্ষে 'বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষৎ' কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তরে আচার্যের অভিভাষণ।

ইতিহাস-দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতীন্দ্রনাথ বসু

হেগেলের শেষ টেনে মধ্য উনিশ শতকে এমারসন বলেছিলেন, "আমাদের তথাকথিত ইতিহাস কেমন একটা অর্থহীন গোঁজা উপকথা ভাবলে আমার লজ্জা হয়।" স্বার্থ ও দম্ভের এই নিরর্থক সন তারিখ ঠিকুজি, কী বা এর মানে যদি সমস্ত কালের ওপরে যে বিশ্বাত্মা তার পরশ না থাকে! হেগেলের মত টয়নবীও ইতিহাসে লক্ষ্য করেছেন আত্মার অভিযান বা ঐশী ইচ্ছার পরিপূরণ। কিন্তু এ ইচ্ছা স্থান কালের অতীত। যুগ ও দেশকে ছাড়িয়ে ইতিহাসকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলেই তবে তার যথার্থ পরিচয় মেলে। সকল সত্যতাই কালোত্তর এবং বিভিন্ন যুগের বিচিত্র ঘটনাবলি দর্শনের দিক থেকে সমসাময়িক। এ না-হলে ইতিহাসে অসম্বন্ধ শব্দ ও প্রলাপ বই আর কিছু থাকে না।

ইতিহাস বিচিত্র রূপসজ্জায় সাজিয়ে পরিবেষণ করে চলেছে এক মূল সত্তাকে। সে সত্তা বিশুদ্ধ চৈতন্য বা বিশ্বমানস। ব্যক্তি তার প্রতিচ্ছায়া—ব্যক্তিমানসে তার প্রতিধ্বনি। তাই মানুষের গূঢ়-দৃষ্টি বা দর্শনের মধ্যে লুকিয়ে আছে যাবতীয় ইতিহাস বা বস্তু-বিবর্তন। চিন্তার ঐক্য বা বোধের সমতা সময়ের ব্যবধান পার করে দেয়। ভাবের উদার একতার ভেতর কাল হারিয়ে ফেলে তার সংকীর্ণতা।

এই দৃষ্টিভংগীতে নেই হেগেলের চিরচঞ্চল গতিধর্ম। কালের মধ্য দিয়েই নির্বিকল্প প্রজ্ঞা বা বিশ্বাত্মার প্রকাশ। সে কালোত্তর কিন্তু কালস্রোতে সঞ্চরমান। এমারসন ও টয়নবী যেমন হেগেলের চঞ্চলতাকে বাদ দিয়ে নিয়েছেন তাঁর বিশ্বাত্মাকে, ক্রোচে তেমনি তাঁর স্থাণু নির্বিকল্প সত্তাকে বাদ দিয়ে নিয়েছেন তাঁর চলিষ্ণু প্রজ্ঞাকে। ইতিহাস আত্মার মুক্তি-অভিযান। আত্মা স্থির নয়। বস্তুত আত্মা ও মুক্তি একই জিনিষ—তার কাহিনী লেখা হয় ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের কোন দর্শন নেই, ইতিহাসই দর্শন—অর্থাৎ মানুষের গতিশীল মনন। তার প্রতি পরিচ্ছেদ এক একটা যুগমানসের (zeitgeist) অনুলেখ। এ যুগমানসকে কেবল তথাকথিত দার্শনিকদের চিন্তাবিন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হয় সে-কালের যত কিছু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপচারের মাধ্যমে। মানবাত্মার অবিচ্ছেদ মুক্তি-অভিযানের কথাই ত' ইতিহাস।

ইতিমধ্যে আত্মার আবরণ দেহ তার দাবী নিয়ে ইউরোপের আকাশমাটি আচ্ছন্ন করে বিপ্লবের ঝড় তুলেছে। ক্রিপ্রগামী বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প নভোচারী মননকে নামিয়ে এনেছে কঠিন ভূমিতলে। সৃষ্টি হোল হেগেলীয় ও হেগেলোত্তর প্রজ্ঞানবাদের প্রতিক্রিয়া। উর্ধ্বে ভাবলোকে নয়, বহুন্ধরার বুকে মানুষের অন্তর

ভোগস্পৃহা ও বৈধকুধার মধ্যে বিজ্ঞানবাদী সন্ধান করলেন ইতিহাসের সূত্র, সমাজ-বিবর্তনের ব্যাখ্যান।

৩। বিজ্ঞানবাদী

সমাজ ও ইতিহাসের ধারাকে প্রাকৃতিক বিবর্তনের সংগে এক বৈজ্ঞানিক সূত্রে গেঁথে দেবার চেষ্টা চলে আসছে দেড়শ' বছর ধরে। তা বলে অবশ্যি ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মত করে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, কোনদিন হবেও না। বিজ্ঞানের কাজ হোল ঘটনা বা বস্তুপুঞ্জকে স্বভাব অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা, সমস্ত বিষয় বস্তুগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাদের ভেতরকার সাধারণ তত্ত্ব, নীতি বা নিয়ম খুঁজে বের করা, যে তত্ত্ব নীতি বা নিয়ম সর্বৈব প্রযুক্ত্য, যা থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় যে ঘটনা-সমাবেশের নির্দিষ্ট পরিণতি হতে বাধ্য। জীব-জগত বা পদার্থজগতের ঘটনার মত ইতিহাসের ঘটনাকে শ্রেণী বিভাগ করা যায় না, তাদের পর্যবেক্ষণ করা বা তাদের নিয়ে পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়, এবং ইতিহাসের অনাগত অধ্যায় নিয়ে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী করাও অসম্ভব। কারণ অতীত ঘটনার সংগে আমাদের সাক্ষাত পরিচয় হয় না, সে আসে দ্রষ্টার দৃষ্টিরঞ্জিত হয়ে। তাকে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, কারণ প্রত্যেক মানুষের যেমন থাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেকটী ঘটনায় তেমন থাকে কিছু-না-কিছু স্বকীয়তা। আর প্রাকৃতিক ঘটনাকে যেমন সহজে পরীক্ষাগারে বসে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, মানুষের সমাজ নিয়ে সে রকম পরীক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাই বলেছেন, "অনেক মিথ্যা সাক্ষ্যকে এবং অনেক সত্যকে বাদ দিলে তবে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে চালানো যেতে পারে।"

প্রতিবাদে বিপক্ষদল বলতে পারেন যে প্রাকৃতিক জগতেও শ্রেণী বিভাগ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ সব সময়ে সম্ভব হয় না। আবহাওয়ার তত্ত্ব অথবা ভেষজতত্ত্ব বিজ্ঞান বলে গণ্য হয়। কিন্তু অতিবৃষ্টি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উক্তি এবং ওষুধের কার্যকারিতা সর্বদা পরিপূর্ণ বা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং যে কোন জ্ঞান সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকেই বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাহলে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলতে কোন বাধা থাকে না। ঐতিহাসিককে তার তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সযত্নে বেছে নিতে হয়, তাদের সত্যতা ও গুরুত্ব যাচাই করে নিতে হয়, তারপর নিরপেক্ষভাবে দিতে হয় তাদের ব্যাখ্যান এবং তাদের সন্নিবদ্ধ করে দিতে হয় বিবর্তনের অবিচ্ছিন্ন ধারার সংগে। ভূবিজ্ঞানীর মত তাঁকে অতীতের উপাদান সংগ্রহ করে এক ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের চিত্র অংকন করতে হয়। এ হিসেবে ইতিহাস বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা বলে গণ্য হতে পারে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে যখন সমাজবেত্তা ও প্রকৃতিবেত্তায় সত্যসাধনা পাশাপাশি অগ্রসর হয়েছে তখন বিজ্ঞানের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তার আসরে এঁরা মিলতে চেষ্টা করলেন। অবশ্য তার বহু আগে কোন কোন ইতিকার ঘটনার সুসংগত পূর্বাপর্যে বিশ্বাস করে বৈজ্ঞানিক রচনাশৈলীর প্রবর্তন করে গেছেন। প্রচুর পুরাণ ও উপকথার জঞ্জাল থেকে অবধারিত ঘটনাগুলি চয়ন করে তাদের একটা "যুক্তিক সঙ্গতিসাধন" সম্ভবিষ্ট করে দেখিয়েছেন অমর ইতিবেত্তা থুকিডিডিস। ইতিহাসের বাস্তব পাঠ পড়িয়ে দেওয়ার বাসনা তাঁর ছিল না তা নয়, কিন্তু তার জন্য সত্যকে বিকৃত করার প্রয়োজন হয়নি, ঘটনার "যথাযথ চিত্রণ" শিক্ষাদানের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। বহু বর্ষ পরে চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে ইবন্-খালদুন ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তন করেছেন। তাঁর আরব ইতিহাসের মুখবন্ধে অতীতের ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ স্বীকৃত,—আবেষ্টনীর বহুমুখী বাস্তব প্রভাব পূর্বাপর ঘটনাকে নির্ভরশীল ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান নেই। দেশ ও জাতির ভাগ্য অলক্ষ্য থেকে নির্ধারিত হয় না। পৃথিবীর বুকের ওপর বহুবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা মানবজাতির পথ রচনা হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকিয়ে বাকলে প্রমুখ পরবর্তী ইতিকারেরা ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে চেয়েছেন, ঘটনার বিশ্লেষণের উপরে উঠিয়ে ঘটনার অন্তরালবর্তী নিয়মের আবিষ্কারে নিয়োগ করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের ভেদরেখা তুলে দিতে।

ইতিহাসের বিজ্ঞানবাদী রূপরেখা পরিস্ফুট হোল হেগেলীয় প্রজ্ঞানবাদের প্রতিবাদে। মার্কস্ গ্রহণ করলেন হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, স্বীকার করলেন যে সংঘাত ও সমন্বয়ের পথে সাধিত হয় যা-কিছু পরিবর্তন। কিন্তু তিনি ভাব বা প্রজ্ঞার মৌলিকতা স্বীকার করলেন না—তাঁর কাছে মূল হোল জড় সত্তা। "হেগেল ভাবনাকে ভাব নাম দিয়ে এক স্বাধীন কর্তা ও বিশ্বনিয়ন্তা বানিয়ে বসেছেন এবং বাস্তব জগৎকে করেছেন ভাবের বহিঃপ্রকাশ। আমার মতে ভাব মানবমনে প্রতিফলিত ও চিন্তায় রূপায়িত জড় সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়।" হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ দাঁড়িয়ে আছে মাথার ওপর। তাকে উল্টে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলে তবে তার যৌক্তিক সারাংশ রহস্যের আবরণ থেকে টেনে বার করা যাবে।

সমাজের আবশ্যক বিত্ত উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে। এক এক যুগের উৎপাদন শক্তির সংগে তার অনুরূপ শ্রেণীসম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানুষ দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায় আর তাদের মধ্যে স্থাপিত হয় শোষণের সম্বন্ধ। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে বঞ্চিত করে তার

শ্রমফল ভোগ করে। এই উৎপাদন সম্বন্ধগুলিকে মিলিয়ে গঠিত হয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,—যার বনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠে আইন ও রাষ্ট্রের ইমারত এবং যা থেকে উদ্ভূত হয় সমাজমানস বা যুগধর্ম (zeitgeist)। বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ করে জীবনের রূপ, তার সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আত্মিক চেহারা। মানুষের চেতনা তার সামাজিক জীবনকে স্থির করে না, সামাজিক জীবনই তার চেতনায় ছক এঁকে দেয়। সুতরাং সমাজ-বিবর্তন বা রাষ্ট্র-বিপ্লবের কারণ সমকালীন দর্শন বা বিবেকবুদ্ধির মধ্যে খুঁজতে হবে না, খুঁজতে হবে সে-কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, উৎপাদন ও ধনবণ্টন প্রণালীতে,—যেমন আজকের সমাজ-বিপ্লব ও সমাজবাদের বীজ নিহিত আছে ধন-বৈষম্যের মধ্যে ও শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব প্রয়োজনের ভেতর।

মার্কস্-এর এই সূত্রগুলিকে বিস্তার করে এংগেল্স্, লেনিন ও বুখারিন বিজ্ঞানবাদী ইতিহাস-দর্শন রচনা করলেন।

অর্থ ও শ্রেণীভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে শুধু সে-কালের রাষ্ট্রই নয়, তার আনুসংগিক সমাজ ও সভ্যতা। পরিবারের জন্ম আর্থিক প্রয়োজন থেকে, নরনারীর যৌন-পার্থক্য-জনিত শ্রমবিভাগ থেকে। আদিম বিবাহ এক আর্থিক যোগাযোগের নিদর্শন। স্বত্ব অর্জনের সাথে সাথে পুরুষ নারীকে করল দাসী, ভোগের সামগ্রী। সাম্যবাদী সমাজ একসাথে তুলে দেবে ব্যক্তিসম্পত্তি ও নারীর দাসত্ব, সংগে সংগে দূর হবে গণিকাবৃত্তি ও পরিবার। নীতিধর্মের পেছনেও আছে আর্থিক তাগিদ। প্রত্যেক শ্রেণী ও ব্যবসা তার নিজ নীতিনীতি নিয়ে চলে। ধর্মই বা কী? পিতৃতন্ত্রের ছত্র-ছায়ায় বর্ধিত আর্থিক বিন্যাস থেকে উৎপন্ন হোল আত্মার ধারণা, প্রকৃতিরও প্রভীক। রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কের সংগে তাল রেখে চল্‌ল ধর্ম, লোকাচার ও লোকগাথা। নগররাষ্ট্র, গোষ্ঠি বা জীবিকার প্রতিভূ হয়ে এল এক এক দেবতা—মানুষের মত তাদের মধ্যেও লাগল রাজ্য নিয়ে লড়াই, মেয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি। মানুষেরই দেবায়িত উপকথায় ছেয়ে আছে পুরাণ-পাঁচালী। ধর্মের কল্পলোকের পাশাপাশি গড়ে ওঠে আচার-নিষ্ঠার বিধান, পুরোহিতের শাসনতন্ত্র, শোষক শ্রেণীর দুর্গ ও পরম নির্ভরস্থল। শোষিতের প্রতিবাদ বিদ্রোহিত হয় ধর্মদ্রোহের আকারে। যেমন ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে রিফর্মেশনের ধর্মদ্রোহ বস্তুত ফিউডাল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছোট অভিজাত ও উদীয়মান বণিকের বিদ্রোহ। চাষীমজুরদের ধর্মৈষণা এনাব্যাপ্‌টিজম্ নাম নিয়ে এই সংগ্রামকে আরো এগিয়ে সাম্যবাদের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। প্রটেস্ট্যাণ্টরা এনাব্যাপ্‌টিস্টদের উগ্রনীতি বরদাস্ত করেনি, তাদের পুড়িয়ে মেরেছিল নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থা ও শ্রেণীস্বার্থ কায়েম রাখবার জন্যে। আজকের ভগবন্তাও অর্থজগতের আধ্যাত্মিক সংস্করণ। ঈশ্বর পরম প্রভু আর ভক্ত তার দাসানুদাস। নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে সে

সার্থক। অপর পক্ষে ঈশ্বর অস্পষ্ট, বিদেহী, নির্ব্যক্তিক। অর্থ-ব্যবস্থায়ও শোষক শোষিতের মধ্যে প্রভু ও দাসের সম্পর্ক, আর সমাজবিজ্ঞের বিনিময়-বন্টন একেবারে ছন্নছাড়া অরাজক। ধনতন্ত্রের বাজারের মতই ঈশ্বর এক অন্ধ, বোধবুদ্ধির অতীত মহাশক্তি হয়ে সাধারণ লোকের ওপর চেপে বসে আছে।

দর্শনও শ্রেণীপরায়ণ, যদিও তার শ্রেণীপরায়ণতা অর্থনীতির মত প্রত্যক্ষ নয়। আশাবাদী দর্শন যেমন শ্রেণী বা রাষ্ট্রের প্রভুত্বনিষ্ঠা ঘোষণা করে, নৈরাশ্যবাদ তেমন সূচনা করে শ্রেণীবিশেষের নৈতিক দৈন্য ও পরাজয়। যেমন রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপাতের বিলাপন হোরাস দর্শন। এর বিশেষত্ব নিরাশা, মৃত্যুস্মৃতি, সমাজ-বিতৃষ্ণা, নিরংকুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সর্বধ্বংসী লক্ষ্যহীন সমালোচনা এবং সব কিছুতে আস্থাহীন পরম যুক্তির আরাধনা। এক ভোগক্লান্ত ম্রিয়মান পরগাছা শ্রেণী, জীবনে যাদের অরুচি ধরে গেছে, তাদের মনস্তত্ত্ব ছায়া ফেলেছে এই আত্মনাশা চিন্তায়।

শিল্পও অর্থের অনুগামী। আর্থিক কাঠামো অনুযায়ী দেশ ও কালভেদে বদলায় শিল্পের কলা ও শৈলী। জনতা গায় লোকগাথা, ভাটচারণ গায় প্রভুর বন্দনা। পটুয়া তার বিষয় ও আংগিক চয়ন করে শ্রেণী-পরিবেশ থেকে, তার আদরও হয় সমশ্রেণীর ক্ষেত্রে। শ্রেণীজাত আবেগ-অনুভূতিকে সমাজে বিধৃত করাই শিল্পীর ধর্ম।

বিজ্ঞানের জন্মই আর্থিক-প্রয়োজন থেকে, প্রকৃতির সংগে লড়াই করতে গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করেছে প্রকৃতির শক্তি, তাকে কব্জায় করে কাজে লাগিয়েছে। জাতি ও শ্রেণীর লড়াই থেকে আবিষ্কারের কাজ এগিয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগের পিছনে মানুষ সন্ধান করেছে মৌলিক সূত্র। বিজ্ঞানের গবেষণা ব্যবহারিক প্রয়োগ বা বাস্তব উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার পথ নির্ধারিত হয় শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীচিন্তা দ্বারা।

এই শ্রেণীসর্বস্ব সমাজ, পরিবার, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়েই যুগমানস বা কালধর্মের (zeitgeist) রচনা। রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের অন্তরালে ক্রিয়া করছে উৎপাদনব্যবস্থা ও শ্রেণী-সংঘর্ষের অমোঘ বিধান।

সমাজের আর্থিক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের পদক্ষেপ হয় দ্বান্দ্বিক নিয়মে। প্রতিটা সমাজধারা তার বিপরীত ধারার জন্ম দেয়, ফলে তার প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই তার বিপক্ষ শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। উভয়ের বিরোধের ফলে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার ভাঙন ধরে যায় এবং নূতন ব্যবস্থা,—এক সমৃদ্ধ উচ্চতর উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থা সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতি যুগে দুই পক্ষের ধ্বজা বহন করে অগ্রসর হয় দুই বিরোধী শ্রেণী,—তাদের সংঘাতের মাধ্যমে বর্তমান ও আগন্তুক ব্যবস্থার শক্তি পরীক্ষা হয়। অনাগত কালের, আগামী অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করে তার পতাকাবাহী শোষিতের দল। এমনি ভাবে, দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের কলুষেধায় ইতিহাসের বুকের ওপর দাসযুগ, সামন্তযুগ, ধনিকযুগ পর পর

মিছিল করে গেছে। দাসত্ব ভেঙে দিয়েছে দাসশ্রমের ওপর স্থাপিত অর্থব্যবস্থা এবং প্রচলিত প্রাচীন রাষ্ট্র। ধনিক পণ্যজীবীরা ভূমিপতি সামন্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, ভেঙে দিয়েছে ফিউডাল ব্যবস্থা ও রাজতন্ত্র। ধনিকতন্ত্র ও তার কুক্ষিগত গণতন্ত্রকে আবার ভাঙবে শ্রেণীসচেতন বিত্তহীনের দল। পরস্কৃত, অবসরী অভিজাত চিরকালের মত শেষ হয়ে যাবে। আসবে সমাজতন্ত্র, শোষণহীন, শ্রেণীহীন, সমাজ,—জেল, পুলিশ, আইন, আদালত, ফৌজ ইত্যাদি যাবতীয় বিভীষিকা নিয়ে শোষণযন্ত্র রাষ্ট্র ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রতি যুগের গর্ভে, প্রতি অর্থব্যবস্থার অভ্যন্তরে গোপনে লালিত হচ্ছে তার হন্তা,—যুগ ও যুগহন্তার সমন্বয়ে উপস্থিত হয় যুগান্তর, এক উচ্চতর সমাধান। এই সমাধানের পথ সরল ও মসৃণ নয়। দীর্ঘকালের ধীর প্রস্তুতি দ্বারা এর পথ রচনা হয়, তারপর এক চরম সন্ধিক্ষণে আর ধীরগতির অবকাশ থাকে না, তখন ইতিহাস প্রচণ্ড লম্ফনে দুরায়ত্ত ব্যবধান পার হয়ে যায়। যেমন উত্তপ্ত জল তাপ সঞ্চয় করে বিশেষ এক মাত্রায় বাষ্পপুঞ্জে রূপান্তর লাভ করে, কিম্বা যেমন লোহার খোলের ভিতর বাষ্পের চাপ বাড়াতে থাকলে শেষে এক সময়ে খোল ফেটে চুরমার হয়ে যায়। এরই নাম বিপ্লব।

উৎপাদন ব্যবস্থার বৈষম্য ও শ্রেণীসংগ্রামের পটভূমি থেকে উদ্ভূত হয় বিরোধী দল ও নেতা। তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার পিছনে থাকে যুগের পুঞ্জীভূত দাবী, নূতন সমাজবিকাশের আগ্রহ। দলের সংগঠন, নেতার ব্যক্তিত্ব পরিবেশের দুর্নিবার প্রেরণায় অজেয় হয়ে ওঠে। দল ও ব্যক্তির হাতে যুগের ভাগ্য রচনা হয়; কিন্তু যুগের আর্থিক দাবী সৃষ্টি করে দল ও নেতা।

হেগেলের ভাবিক যুক্তিবাদ এবং মার্ক্সের ভাবিক জড়বাদ, উভয় দর্শনেই ইতিহাসের গতিপথ অবধারিত। সমাজের ক্রমবিকাশ জড় ও জৈব বস্তুর পরিবর্তনের মতই অব্যর্থ নিয়মের বশীভূত। মার্ক্সের মতে প্রকৃতিবিজ্ঞান যেমন পদার্থের অবস্থা ও পরিবেশ বিচার করে তার ভবিষ্যত অবগত হতে পারে, সমাজবিজ্ঞানও তেমন মানুষের আর্থিক সংগঠন বিশ্লেষণ করে তার অগ্রগতির পথ নির্ণয় করতে পারে। জলের তাপ ও বায়ুর চাপ লক্ষ্য করে পদার্থবিজ্ঞানী বলতে পারেন কখন জল বাষ্পে পরিণত হবে, বাষ্পের চাপ লক্ষ্য করে বলতে পারেন কখন তার আবরণ ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। সমাজবিজ্ঞানীও শোষণমাত্রা ও শ্রেণীসম্বন্ধ লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন কোন সময়ে শোষিতের সংগ্রাম বিপ্লবের রূপ ধারণ করবে, কোন সময়ে কি প্রকারে প্রাচীন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত হবে। মানুষ তার ইচ্ছা ও চেষ্টার বলে ভবিতব্যকে রচনা করছে বটে কিন্তু তার ইচ্ছা ও চেষ্টা উপঘাত হচ্ছে তার শ্রেণীস্বার্থ ও আর্থিক ব্যবস্থা থেকে। মানুষের সংকল্প ও প্রয়াস আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন মনে হলেও নির্ভর করে

তার শিক্ষাদীক্ষা, নৈতিক আবহাওয়া ও আইনকানুনের ওপর, যা আবার প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদিও মানুষ তার বহুবিধ চিন্তা চেষ্টা ও ইচ্ছার বলে অর্থ ও সমাজ-পরিবেশকে বদলাতে পারে, এই চিন্তা ও উদ্যোগ আবার নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থ ও শ্রেণীসম্বন্ধ দ্বারা। মানুষের মনোবল ও বহুবিধ প্রেরণা যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা আর্থিক প্রেরণার বশবর্তী। যে সমস্ত ভাবনার পিছনে উদীয়মান্ উৎপাদনশক্তির স্বাক্ষর থাকে সে সমস্ত ভাবনাই হয় বিশ্ববিজয়ী, যুগের বার্তাবহ। যে সমস্ত ঘটনা উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের ছাপ নিয়ে আসে তারাই স্থান লাভ করে ইতিহাসের পাতায়। কারণ মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি আর্থিক,—জীবন ধারণের। এই জৈব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে সে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। অন্বসমন্বয়ের অটুট নিয়মে উৎপাদন-ব্যবস্থায় চলে ভাঙাগড়া। সংগে সংগে নিয়ন্ত্রিত হয় চিন্তা ভাবনা, শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য।

এমনি অটুট আর্থিক বিধানের ফলে ফিউড্যালতন্ত্রকে ধনতন্ত্রের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ফিউড্যাল প্রথা যখন সমাজের সমৃদ্ধি ও ভোগস্পৃহার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো, তখন তার উৎপাদন ব্যবস্থায় উপ্ত হোল ভাঙনের বীজ। সমাজের বিত্তবিস্তার ও যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের পক্ষে ধনতন্ত্র হোল অনুকূল। ধনতন্ত্রের মিয়াদ শেষ হোল যখন অত্যধিক শোষণের ফলে সমাজের বৃহত্তর অংশ দরিদ্র হয়ে পড়ল, সমাজের আর্থিক প্রসারশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, ভোগৈষণার দুর্নিবার প্রেরণায়, আর্থিক অগ্রগতির অব্যর্থ নিয়মে আসতেই হবে এমন এক ব্যবস্থা যাতে শোষণ থাকবে না, মানুষ তার শ্রমফল ভোগ করবে, সমবেত প্রয়াসে সমাজের ঐশ্বর্য ক্রমেই বাড়িয়ে তুলবে।

সুতরাং আর্থিক প্রবৃত্তি ও আর্থিক নিয়মের দ্বারা ইতিহাসের গতিপথ ও ঘটনার পূর্বাপর সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়ে আছে। ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান নেই, স্বাধীন ইচ্ছার অবসর নেই।

ঐতিহাসিকের বিচার্য এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কতদূর যুক্তিসংগত ও প্রমাণসহ। নিশ্চিত জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। যে নিয়মের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ও ফল অভ্রান্ত তাকেই বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ওপর, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর। যাবতীয় পূর্ববর্তী ঘটনা নিশ্চিতভাবে আয়ত্ত করতে পারলে তবে পরবর্তী ঘটনা নিঃসংশয়ে জানা যেতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মে পূর্বাপর ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণনা করা যেতে পারে। যতক্ষণ জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা অনিশ্চিত থাকে ততক্ষণ নিয়মের প্রভাব সম্ভব নয়। যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে মার্কসীয় দর্শনে অর্থপ্রসূত ও অবধারিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তাদের কারণসূত্র এখনো কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কলিংগবিজয়ী অশোক কোন উৎপাদন শক্তির নির্দেশে

বাইচক্রের পরিবোধ করে ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন? কেনই বা ফরাসী বিপ্লবের সন্তান কার্নো প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম চালনা করলেন, আর দ্বিতীয় সন্তান নেপোলিয়ন গণতন্ত্রকে সংহার করে একতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনলেন? রুষ বিপ্লবের পর কেন হোল তার বীপরিত, কর্বিলভ করলেন সমাজতন্ত্রের শত্রুতা আর লেনিন এসে বাঁচালেন তাকে? আবার একই সময়ে কেন জার্মানীতে লাইব্‌নীখ্‌ট্‌-এর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পরাজয় হোল? কেনই বা শাসন-সংস্কার ঘোষণার পূর্বাহ্নে বোমার আঘাতে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রাণ হারালেন আর রুষদেশে ধীর অগ্রগতির মোড় ঘুরে শুরু হোল পশ্চাদ্‌গতি? কেনই বা সমতুল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিফলন ফ্রান্সে হয় বিপ্লবের আকারে আর ইংলণ্ডে হয় পার্লামেণ্টের সংশোধনে ও আইন প্রণয়নে? এই সমস্ত কেন'র রহস্য ভেদ করবার মত কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম আজও আবিষ্কৃত হয় নি। ঐতিহাসিক রহস্যের অন্তরালে যে সত্যের ইংগিত পাওয়া যায় সে হোল এই যে ব্যক্তি ও বহুর সত্তা সর্বত্র অর্থজাত বা শ্রেণীদর্শন নয়, অর্থকামনা ও শ্রেণীস্বার্থকে ছাড়িয়ে জীবধর্মের বিস্তৃতি।

ইতিহাসে ব্যক্তি-সংকল্পের স্থান কতটুকু এই কূট প্রশ্নের সমাধান মার্ক্‌সীয় দর্শনে নেই। মার্ক্‌স্‌-এর মতে ব্যক্তি অর্থপরিবেশ দ্বারা চালিত যন্ত্রের মত নয়, সে ইচ্ছাশীল, সক্রিয়। কিন্তু তার ইচ্ছা ও ক্রিয়া পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত। এ থেকে যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। তাহলেও কি বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তে ইচ্ছাশীল ও সক্রিয় নয়?

বিজ্ঞানবাদী মতে সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব ধনতন্ত্রের অবসানের সংগে সংগে শেষ হয়ে যাবে। কারণ তারপর আর শ্রেণীভেদ থাকবে না, সমাজ একযোগে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, প্রকৃতিকে বশ করে অর্জন করবে নিরংকুশ স্বাধীনতা। কোথায় থাকবে তখন দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের বৈজ্ঞানিক নিয়ম? এখানেই মার্ক্‌সের যথার্থ পরিচয়। বিজ্ঞানীর রূঢ় দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে বিপ্লবীর স্বপ্ন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সংগে স্বপ্নদর্শনের খাদ না মিশলে বিপ্লবী হওয়া যায় না।

কাজেই জড়ধর্মকে মৌলিক বলে প্রচার করলেও মার্ক্‌সের গোটা দর্শনের পিছনে আছে একটা প্রচ্ছন্ন নৈতিক নিষ্ঠা। অর্থ যদি সমাজ বা গোষ্ঠির আদি ও অকৃত্রিম প্রেরণা হয় তা হলে যে বিত্তহীনের দল ধনিকদের অপসারণ করে কৃষিশিল্প ও রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করবে, তারা কোন প্রেরণায়, কিসের নির্দেশে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্র ও বিত্ত তুলে দেবে সমাজের হাতে? বস্তুত আজ রুষদেশেও দেখা যাচ্ছে মার্ক্‌সীয় অবধারণার ব্যতিক্রম। ধনতন্ত্র নাশ হয়েছে, সামাজিক প্রয়াসে বিত্ত উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু তার কূট কৌশল এবং যন্ত্রশিল্পের পরিচালনা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞের হাতে আবদ্ধ হয়ে আছে। এদিকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও রাষ্ট্র-প্রতিযোগিতার ফলে সমর— ও রাষ্ট্রনায়কদের হাতে এসেছে প্রচুর ক্ষমতা, ক্ষমতাবৈষম্যের সংগে তাল রেখে

চলেছে ধনবৈষম্য। এই শিল্পী, ব্যাঙ্কার ও রাষ্ট্রনেতার দল যদি আর্থিক প্রেরণা দ্বারা চালিত হয় তবে তারা কি সাম্যবাদী সমাজে আত্মবিলোপ করবে, না নূতন শ্রেণীস্বার্থের আকার ধারণ করবে? মানুষের সহজাত নৈতিক বোধ ও মানবতাকে বাদ দিয়ে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

৪। সমন্বয়বাদী

ইতিহাস ধারাবাহিক বিবর্তন, বিপুল তার বৈচিত্র্য ও বর্ণসম্ভার। সরল নির্ধারিত খাতে সে চলে না। জটিল আঁকাবাঁকা তার পথ। বহুবিধ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নানাদিক থেকে অসংখ্য প্রভাব সঞ্চয় করে সে অগ্রসর হয়। মার্কস্-এর ইতিহাস-ব্যাখ্যায় একমাত্র আর্থিক প্রভাবই আদি ও মুখ্য, আর সব প্রভাব গৌণ। আরো কোন কোন মনীষী মার্কস্-এর মত এক একটী মূল শক্তিকে অবলম্বন করে তাঁদের ইতিহাস-দর্শন খাড়া করেছেন।

যেমন ম্যাক্স্ ওবর ও বেঞ্জামিন কিড্-এর মতে ধর্মবোধ হচ্ছে সমাজের মৌলিক প্রেরণা। টয়েনবী ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখেছেন ঈশ্বর-অভিগামী আত্মার পদক্ষেপ। রাষ্ট্র যখন বিশ্বাত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তখন ধর্ম এগিয়ে এসেছে সে দায়ীত্ব বহন করতে ইতিহাসে এমন নজিরের অভাব নেই। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর চার্চ হাতে তুলে নিয়েছিল রোমের ঐতিহ্য। প্রাচ্যে সিন ও হান সাম্রাজ্যের দুর্দিনে বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম তেমনি বাঁচিয়ে রেখেছিল চীনের কৃষ্টি। ভারতবর্ষে এরকম দৃষ্টান্ত আরো প্রচুর। মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানের প্রাণ ছিল একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি সন্তদের ধর্ম-জাগরণ। সন্ন্যাস-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, বিশ শতকের বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রভৃতি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের পিছনে ধর্মপ্রেরণা শক্তি যুগিয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলেই হচ্ছে ধর্মের দাবী। মসজিদকে কেন্দ্র করে এখনো মুসলিম জাতিগুলির জাতীয়তা সংহতি লাভ করে।

গোবিনো ও রিচার্ড ডাগ্লাস জাতিবৈশিষ্ট্যকে করেছেন সকল পরিবর্তনের মূলাধার। প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিতে গোষ্ঠিচেতনা ও জাত্যভিমান রাষ্ট্রদর্শন ও কূটনীতিকে কম প্রভাবিত করেনি। গ্রীক ও বর্বর, আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয়ের বৈরিতা আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিরোধকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হিব্রুরা নিজেদের ঈশ্বর-মনোনীত জাতি বলে বিশ্বাস করত, ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্যে তাদের সৃষ্টি, অন্যদের তারা মানুষ বলে গণ্য করত না। আবার বিশ শতকে হোল এদেরই বিরুদ্ধে ইউরোপীয় 'আর্য'দের অভিযান। শ্বেতপ্রীতি, পীতভীতি,- এমন কত জাতীয় সংকীর্ণতা আজও সুসভ্য ইউরোপ আমেরিকা কাটিয়ে উঠতে পারল না। পূর্ব ইউরোপে চেক, স্লোভাক, স্লাভ, রুমেনীয়, রুথেনীয়, বালগার, সার্ব, ক্রোয়াট, ম্যাগিয়ার, প্রভৃতি ছোট ছোট উপজাতি দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব চালিয়ে এসেছে। এদের চিরন্তন দলাদলির

ফলে পূর্ব ইউরোপ ও বল্‌কান অঞ্চল আজও বৈজ্ঞানিক পড়ে আছে,—শিল্পবাণিজ্য প্রসার লাভ করে নি, সেদিন পর্যন্ত এখানে মধ্যযুগের ভূমিব্যবস্থা বহাল ছিল। জাতিবাদের মন্ত্র দিয়ে হিটলার জার্মানদের মাতিয়ে তুললেন,—টিউটন জাতিতত্ত্বের সূত্র ধরে লেখা হোল জার্মান জাতির ইতিহাস, আর সেই ইতিহাস-সূত্র জার্মান জাতিকে আত্মহত্যার পথ দেখিয়ে দিল।

স্পেংলার জাতিগরিমার ওপর আরোপ করেছেন একটি নির্ধারিত নিয়তি। এক অব্যর্থ অদৃষ্টের বলে জাতির আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটে। মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু যেমন অবধারিত, জাতি ও সভ্যতাও তেমনি নিশ্চিত পরিণামের অধীন। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ জরাগ্রস্ত, তার অবসান আসন্ন, কারণ ইউরোপের জাতি-গুলির জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মিশর, সুমের, গ্রীস, পারস্য, আরব ও তুর্কীর গৌরবের মত ধুলায় মিশে যাবে ইউরোপের কীর্তি,—তার সমাধির ওপর অংকুরিত হবে নূতন জাতির সৃষ্টি-প্রতিভা।

বাক্‌লে লিখেছেন ভূকেন্দ্রিক ইতিহাস। তাঁর মতে ভৌগলিক আবেষ্টনী দিয়ে নির্ধারিত হয় সমাজগোষ্ঠীর স্বভাব ও সভ্যতা। হেগেলও প্রাকৃতিক প্রভাবকে স্বীকার করেছেন—দেখিয়েছেন কেমন করে ভৌগলিক সংস্থান জীবনযাত্রার ওপর ছায়াপাত করে। উষ্ণ প্রান্তর-ভূমিতে বিকশিত হয় পশুনির্ভর অর্থ-নীতি, পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ ও জাতি-স্বাতন্ত্র্যবোধ। নদীমাতৃক দেশে গড়ে ওঠে কৃষি, শিল্প, স্থাবর সম্পত্তি এবং ভূমিপতি ও ভূমিদাসের সম্পর্ক। সমুদ্রতীরের মানুষ হয় বাণিজ্য-প্রধান ও ব্যক্তি-অধিকার প্রিয়। এমনি বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশে জন্মলাভ করে। নীলনদের তীরে ও টিগ্রিস-ইউফ্রেটিস্‌এর উপত্যকায় সমরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হয়েছিল সমগোত্রীয় সভ্যতা। আবার দক্ষিণ ভারতের এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলে তামিল ও ফিনীসির সভ্যতার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এদের সংগে আরব মরুভূমির সভ্যতার বেশী মিল নেই। বরং প্রান্তরবাসী তাতারদের জীবন-যাত্রা ও মতিগতির সংগে বেদুইনদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

যৌনবাসনাও ইতিহাসকে কম প্রভাবিত করে নি। ফ্রয়েডের মতে আসংগলিপ্সাই মানুষের মৌলিক বৃত্তি। নারীর রূপ নিয়ে কত কথা ও গাথা রচিত হয়েছে, কত রেষারেষি, রক্তারক্তি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পাস্‌কাল বলেছিলেন ক্লিওপেট্রার নাক যদি আর এক ইঞ্চি ছোট বড় হোত তা হলে সমস্ত ইতিহাসের রূপ বদলে যেত। কত নূরজাহান, মমতাজ, কৃষ্ণকুমারী, মেরী, মাঁৎনঁ, পাশাদের রাষ্ট্রনায়কদের মনোহরণ করেছে, কত দেশের ভাগ্য কতবার লুটিয়েছে এই রূপসীদের পায়ের তলায়, ইতিহাসকে তার হিসাব না নিলে চলে না।

কার্লাইলের মত ব্যক্তিপূজারীরা মহাপুরুষ বা জননায়কদেরই ইতিহাসের নিয়ামক

বলে ধারণা করেছেন। অবশ্য শক্তিমান পুরুষেরা পরিবেশ থেকেই শক্তি আহরণ করে যুগের দাবীকে পূর্ণ করে তোলেন। কিন্তু পরিবেশের শক্তি নায়কের মধ্যে স্বতই সঞ্চারিত হয় না—নায়কের ব্যক্তিত্বের ওপর নেতৃত্বের সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রায় সমান সুযোগসুবিধার উত্তরাধিকারী হয়েও তাঁর পিতৃব্যের সমকক্ষ হতে পারেন নি। যে অবস্থার মধ্যে লেনিন রুষ বিপ্লব সফল করে তুললেন, তেমন অবস্থা হাতে পেয়ে লাইবনীখ্‌ট জার্মানীতে বিপ্লব সমাধা করতে পারেন নি। কামালপাশা রাতারাতি তুর্কীর চেহারা বদ্‌লে দিয়েছিলেন, আমানুল্লা আফগানিস্তানের সংস্কার করতে গিয়ে সিংহাসন হারালেন। পূর্ব এসিয়ায় সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সামরিক সমাবেশ করেছিলেন, একই পরিস্থিতিতে একই লক্ষ্য নিয়ে হুসেনী, রসিদ আলি, ওয়াং কিংবা বা-ম' নিজ নিজ দেশে সেরূপ বিপ্লবী নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। ইতিহাসের অলিখিত নিয়তির মধ্যে ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

বস্তুত সমাজবিজ্ঞানের জটিল কাঠামো অর্থ, ধর্ম, জাতীয়তা, ভূপ্রকৃতি, যৌন-কামনা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র উপাদান দিয়ে গঠিত। ইতিহাস বা সমাজবিদ্যার এক একটী শাখা হিসাবে এদের আমরা পাঠ করি। পৃথকভাবে পাঠ করলে এক একটী শক্তির ক্রিয়া ও প্রাবল্য স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়। কিন্তু মানব-জাতির সামগ্রিক জীবনযাত্রায় এ প্রকার বিভাগ চলে না। প্রত্যেকটী প্রভাব অন্যান্য প্রভাবের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে এদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বহুল ভিন্নমুখী প্রভাবের সমন্বয় সাধন করে চলেছে সমাজের ধারা। অথবা এও বলা যায় যে সমাজগতি এক বহুরঙ্গী, বহুধর্মী যৌগিক প্রভাবের বশবর্তী। যে-কোন দেশে বা কালে সমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এক জটিল শক্তিবিন্যাস।

মানুষ বাস করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। ব্যক্তি, সমাজ ও প্রকৃতি এই ত্রয়ীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্ব ও মিলন অবলম্বন করে সমাজ বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়। ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাকে আত্ম-বিস্তারে তৎপর করে রাখে একাধিক বৃত্তি ও আবেগ—যথা যৌনক্ষুধা, বুভুক্ষা, ক্রোধ, বাৎসল্য, ঈর্ষা ইত্যাদি। সমাজের ভেতরও লক্ষ্য করা যায় এমন অনেক যৌথ প্রেরণা, যেমন শ্রেণীস্বার্থ, ধর্মভাব, ভাষা-প্রীতি, দেশপ্রেম ইত্যাদি। প্রকৃতির ভেতর আছে জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, নদীপর্বত ইত্যাদির বিচিত্র প্রভাব। ব্যক্তি ও প্রকৃতি তাদের বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করছে সমাজের ওপর, আবার সমাজ তার বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করছে ব্যক্তি ও প্রকৃতির ওপর। এই ভাবে রচনা হয় ব্যক্তি, সমাজ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ, পরস্পর আদানপ্রদান ও প্রভাব-বিনিময়ের ফলে সমাজে অবিরাম পরিবর্তন সাধিত হয়।

এই যে বিবিধ সমাজ-নিয়ামক শক্তি এর মধ্যে কিছু আত্মিক কিছু ভৌতিক, কিছু মানস কিছু জড়। জড় ও ভৌতিক শক্তিকে বিজ্ঞানের নিয়মে পরিমাপ করা যায়। মানস বা আত্মিক শক্তির গতিমুখ অনুমান করা যেতে পারে বটে, কিন্তু নিশ্চিত ফলাফল জানা যায় না। কাজেই প্রত্যেক জাতির স্বভাবে, বিশেষত্বে এবং ইতিহাসে থেকে যায় কিছু অমীমাংসিত রহস্য। আদিম তাতার জাতির স্বভাব ও ইতিহাস গঠিত হয়েছে অনুর্বর ভূমি, উষ্ণ আবহাওয়া, যৌথ গোষ্ঠী-জীবন, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ইত্যাদি জড় ও মানস প্রভাবের নির্দেশে। কিন্তু তা বলে কি এই সমস্ত প্রভাবকে ও তাতারদের জাতি-বৈশিষ্ট্যকে অ্যাঙ্কের মাপা-জোখা ছকে হিসাব করা যায়? মানুষের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক নিশ্চিতি ও সীমায়নের ভেতর আবদ্ধ হয় না—কারণ মানুষ যন্ত্র নয়, সে ইচ্ছাশীল, সক্রিয়।

সুতরাং বহুবাদী সমবয়ী দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় ইতিহাসের অপরূপ জটিল গতি-ভংগি। এই গতিভংগি এ অর্থে বৈজ্ঞানিক যে সমাজের বিবর্তন অকারণে আকস্মিক ভাবে আসে না, বা ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকেও আবির্ভূত হয় না। বিবর্তনের পিছনে আছে অগণিত বাস্তব প্রভাব। তাদের পাঠ করতে হয় সাক্ষ্য প্রমাণ অবলম্বনে, যুক্তিবিচারের দ্বারা। ইতিহাস এই অর্থে দর্শন যে ঐতিহাসিক তাঁর কালধর্মকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমরা যুগের দৃষ্টি দিয়ে অতীতকে দেখি, অতীতের মধ্যে সন্ধান করি যুগসমস্যার সমাধান; কাজেই এক এক যুগে দেখা দিয়েছে এক এক রকম ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও দর্শন। এ জন্যেই ক্রোচে বলেছেন ইতিহাস মাত্রই সমকালের কথা এবং ঐতিহাসিক মাত্রই দার্শনিক।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রূপ ছাড়া ইতিহাসের আরো একটা রূপ আছে,—ইতিহাস এক অর্থে কলাবিদ্যা। যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তঃলীলা ভাবোচ্ছ্বাস বিজ্ঞান ও দর্শনের তথ্যবিচারে ধরা পড়ে না, অথচ যা ওতপ্রোত হয়ে আছে সমাজ-জীবনে, ঐতিহাসিক তাঁদের কেমন করে বাদ দেবেন? ট্রেভেলিয়ানের কথায়—"যে মানুষের আবেগ ও উদ্দীপনা নেই, সে কখনো অন্যের আবেগ ও উদ্দীপনা বুঝতে বা তাদের মূল্য দিতে পারে না।" সুতরাং ঐতিহাসিককে শুধু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হলে চলে না, তাঁকে হতে হয় শিল্পীও। বাস্তববাদী হয়েও সে ভাবুক, সত্যদর্শী হয়েও সে রসবেত্তা, কারণ সে জীবনরসের রসিক।

কবি কল্‌হণ এবং তৎকৃত রাজতরঙ্গিণী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

আজকাল আমরা যে অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটি ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে ঠিক সেই অর্থে ইতিহাস লিখিবার প্রথা সুপ্রচলিত ছিল না। পৌরাণিক সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজবংশীয় প্রাচীন নরপালগণের নামের তালিকা এবং রাজ্যকালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে পুরাণগুলির অঙ্গে নানা ঐতিহাসিক কাহিনীও গ্রথিত দেখিতে পাই; কিন্তু দেবমাহাত্ম্য সূচনা, অবতারণা ও কল্পনা প্রভৃতির চাপে উহাদের আদিম ও অবিকৃত ঐতিহাসিক রূপ চিনিতে পারা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে বাণকৃত হর্ষচরিত, বাক্‌পতিরাজরচিত গৌড়বহ, বিল্‌হণপ্রণীত বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, হেমচন্দ্ররচিত কুমারপালচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক কাব্য রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোনটিই খাঁটি ইতিহাসের পর্য্যায়ে পড়ে না। সে হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি কল্‌হণ কর্তৃক রচিত রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত প্রাচীন কাশ্মীরের ইতিহাসকে সংস্কৃত সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এমন কি, এই গ্রন্থের অনুকরণে উহার তিনশতাব্দী পরে রচিত জৈনরাজকৃত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী, শ্রীবরচিত জৈনরাজতরঙ্গিণী এবং প্রাজ্যভট্ট ও শুকপ্রণীত রাজাবলীপতাকা সংজ্ঞক কাশ্মীরের পরবর্ত্তীকালীন ইতিহাসগ্রন্থগুলিও কল্‌হণের ইতিহাসের সহিত তুলিত হইতে পারে না।

একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কাশ্মীরের অন্তর্গত পরিহাসপুরের এক ব্রাহ্মণ বংশে কল্‌হণ জন্মগ্রহণ করেন। 'কল্‌হণ' নামটি সংস্কৃত কল্যাণ শব্দের অপভ্রংশ। কল্‌হণের পিতা চম্পক (অর্থাৎ 'চম্পক') কাশ্মীররাজ হর্ষের (১০৮৯-১১০১ খ্রীঃ) অন্যতম বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন। হর্ষের মৃত্যুর পর এই ব্রাহ্মণবংশ রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কাব্যগুলি রাজপ্রসাদপুষ্ট কবিগণের লেখনী হইতে রাজসভাতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু কবি কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী রাজসভার বাহিরে রচিত হওয়ায় সমসাময়িক ঘটনাবলীর বর্ণনাতে ঐতিহাসিককে পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখা যায়। বাল্যকালে কল্‌হণ অলঙ্কার শাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ এবং কালিদাস, বরাহমিহির, বাণ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তান্ত্রিক মতাবলম্বী পাশুপতদিগের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল না।

কাশ্মীর দেশের সমুদয় অংশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কল্‌হণের লোকচরিত্র এবং রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান অসাধারণ ছিল।

কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণীতে সুপ্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কাশ্মীর দেশের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কাব্যের আকারে প্রধানতঃ অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত আটটি তরঙ্গে বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গের শ্লোক সংখ্যা ৩৭৩। ইহার প্রথমদিকের ৪৩টি শ্লোককে গ্রন্থের প্রস্তাবনা বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম ২৪টি শ্লোক গ্রন্থবিষয়ে গ্রন্থকারের বক্তব্য এবং পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি কাশ্মীর দেশের বর্ণনাত্মক ভূমিকা। ৪-৫ শ্লোকে কল্‌হণ বলিয়াছেন, "রম্যবিষয়ের স্রষ্টা কবিরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত অপর কেহ অতীত কালকে মানুষের প্রত্যক্ষ করাইতে পারে না। যদি সাধারণের বোধগম্য ভাবসমূহকে কবি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা দেখিতে না পান, তবে তাঁহার দিব্যদৃষ্টির পরিচায়ক আর কি আছে?" এস্থলে ঐতিহাসিক হিসাবে কল্‌হণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, ঐতিহাসিক আপন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অতীত ঘটনাবলী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং কবিপ্রতিভা দ্বারা উহাকে প্রত্যক্ষবৎ পাঠকের গোচরে আনিবেন। কিন্তু এই সঙ্গেই ৭ম শ্লোকে কল্‌হণ বলিতেছেন, "যিনি অতীত ঘটনার বর্ণনা ব্যাপারে বিচারকের ন্যায় দ্বেষ ও অনুরাগশূন্য, কেবলমাত্র সেই ঐতিহাসিকই প্রশংসার্হ ও গুণবান্।" অর্থাৎ, নিরপেক্ষতাই ইতিহাসের মানদণ্ড। কল্‌হণের এই আদর্শ যে খাঁটি ঐতিহাসিকের আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরে ইতিহাসবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঐগুলি অতিবিস্তৃত থাকায় সুব্রত নামক অনেক মুনি উহাদের এক সংক্ষিপ্ত সার প্রস্তুত করেন। কালে সুব্রতের গ্রন্থখানি অনাদৃত হইবার ফলে প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থগুলি অনাদরে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কল্‌হণের মতে, সুব্রতের গ্রন্থ দুষ্টপাণ্ডিত্যে দুর্ব্বোধ্য থাকায় উহাতে বক্তব্যপ্রকাশে পটুতার অভাব ছিল। সম্ভবতঃ সুব্রতের গ্রন্থে কাব্যসুলভ সুদীর্ঘ বর্ণনাদির বাহুল্য ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরীয় পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র সুব্রতের অনুকরণে রাজাবলী সংজ্ঞক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। কল্‌হণ বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্রের অনবধানতার জন্য কোন অংশই নির্দ্দোষ হয় নাই। ক্ষেমেন্দ্রকৃত বৃহৎকথা-মঞ্জরীর রচনা লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, তাঁহার রাজাবলীতে কাশ্মীররাজগণের ইতিহাস অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছিল। কল্‌হণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব কবিগণের রচনায় যে সকল স্খলন দেখা গিয়াছিল, ঐ ত্রুটি সংশোধনের জন্যই তিনি রাজ-তরঙ্গিণী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ণনীয় বিষয়ের দৈর্ঘ্যের জন্য তাঁহার গ্রন্থে কাব্য-সুলভ বৈচিত্র্যের অভাব আছে; কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে এমন একটি বস্তু আছে, যাহার জন্য গ্রন্থখানি পণ্ডিতগণের

প্রীতিকর হইবে, ইহাই কবির আশা ছিল। কল্‌হণের এই আশা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি যে অন্যান্য ঐতিহাসিক কাব্যের অনুকরণে সুদীর্ঘ বর্ণনাদি রাজতরঙ্গিণীর অঙ্গে গ্রথিত করেন নাই, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কাশ্মীরের ইতিহাস রচনায় কল্‌হণ নীলমুনি, হেলারাজ, পদ্মমিহির, ছবিল্লাকর, সুব্রতমুনি, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবির রচিত ১২ খানি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রাচীন গ্রন্থগুলিই তাঁহার একমাত্র নির্ভর ছিল না। আধুনিক ঐতিহাসিকের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহযোগ্য অন্যান্য মূল্যবান্ উপাদানও তিনি সযত্নে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পরে প্রাচীন রাজগণের প্রতিষ্ঠিত অগ্রহার, দেবতা ও দেবালয়াদি সম্পর্কিত শাসন, রাজসভায় কবিগণের রচিত প্রশস্তিপট্টাদি এবং শাস্ত্র অর্থাৎ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি বলিয়াই আমার সমস্ত ভ্রান্তি দূর হইয়াছে।" কল্‌হণের পরীক্ষিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নীলমুনি কৃত নীলমতপুরাণের কিয়দংশ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের বাকী শ্লোকগুলিতে প্রথম গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭৩ জন সুপ্রাচীন কাশ্মীর নরপতির উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ৫২ জনের নাম সুব্রত, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। কল্‌হণ নীল মুনির-পুরাণ হইতে গোনন্দ প্রভৃতি চারিজন, হেলারাজ ও পদ্ম-মিহিরের গ্রন্থ হইতে অশোকের পূর্ব্ববর্তী দশ প্রভৃতি আটজন এবং ছবিল্লাকরের ইতিহাস হইতে অশোকাদি পাঁচজন নরপতির নাম উদ্ধার করিয়াছিলেন। বাকী ৩৩ জনের নামোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে আদিরাজ প্রথম গোনন্দকে মহাভারত-বর্ণিত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রূপে গণ্য করা হইয়াছে। বরাহমিহিরের মতানুসারে ৬৫৩ কলিযুগাব্দে বা ৬২৮ লৌকিক সংবৎসরে অর্থাৎ ২৪৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ স্থির করিয়া ঠিক ঐ সময়ে কাশ্মীররাজ প্রথম গোনন্দের সিংহাসনারোহণের কাল নিরূপিত হইয়াছে। কল্‌হণ এই রাজগণের ব্যক্তিগত রাজ্যকালের উল্লেখ করিতে পারেন নাই; বলিয়াছেন যে, সমষ্টিগতভাবে ঐ ৫২ জন রাজা ১২৬৬ বৎসর অর্থাৎ ২৪৪৬ হইতে ১১৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা অশোকের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পাটলিপুত্রের সুবিখ্যাত মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোক (২৭২-২৩২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ) ব্যতীত অপর কেহ নহেন। কিন্তু তাঁহার কালনিরূপণ, সাম্রাজ্যের বিস্তার, বংশপরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনা অবশ্যই ভ্রান্তিমূলক। এই অংশে হুষ্ক, জুষ্ক ও কণিষ্ক নামক অপর যে তিনজন নরপতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারাও অবশ্যই কুষাণবংশীয় সম্রাট্ হুবিষ্ক, বাসুদেব (বা বাসিষ্ক) এবং কণিষ্কের সহিত অভিন্ন। কিন্তু তাঁহাদের কালনিরূপণও ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। কল্‌হণ প্রাচীন পৌরাণিক কিংবদন্তীর উপর

নির্ভর করিয়া রাজতরঙ্গিণীর প্রথমাংশে যাহা লিখিয়াছেন, উহার ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। ঐ ৫২ জন নরপতির পর প্রথম তরঙ্গে আরও ২১ জন রাজার নাম ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত রাজ্যকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। সমষ্টিতে তাঁহারা ১০৫২ বৎসর অর্থাৎ ১১৮০ হইতে ১৭৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অংশে উল্লিখিত মিহিরকুলকে সুপ্রসিদ্ধ হূণরাজ মিহিরকুল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হূণবংশীয় মিহিরকুল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজ্যও কেবলমাত্র কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ ছিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান রহিয়াছে; কিন্তু এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত কম।

ইতিহাস হিসাবে রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের মূল্যও অধিক নহে; দ্বিতীয় তরঙ্গের শ্লোক সংখ্যা ১১১, রাজার সংখ্যা ৬ এবং তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি ১৯২ বৎসর অর্থাৎ ১৭৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই তরঙ্গে সন্ধিমতি নামক অনেক মৃত এবং অল্পমাত্রাবশিষ্ট ব্যক্তির পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সিংহাসনারোহণের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহা রূপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে। তৃতীয় তরঙ্গের শ্লোক সংখ্যা ৫৩০, রাজার সংখ্যা ১০ এবং তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি ৫৮৯ বৎসর ১০ মাস ১ দিন অর্থাৎ ১৩—৬০২ খ্রীষ্টাব্দ। এই তরঙ্গে বর্ণিত ঘটনাবলীর অস্বাভাবিকতার সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে যশোদিত্য বা তৃতীয় তুঙ্গীন নামক অনেক নরপতির রাজত্বকাল ধরা হইয়াছে ৩০০ বৎসর। এই অংশে তোরমাণ নামক যে রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহাকে হূণরাজ মিহিরকুলের পিতা তোরমাণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হূণজাতীয় রাজা তোরমাণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তিন তরঙ্গে অভিপ্রাকৃত ঘটনার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, এই প্রাচীন যুগের বর্ণনায় পৌরাণিক কিংবদন্তীই কল্‌হণের একমাত্র সম্বল ছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কল্‌হণকর্ত্তৃক পরীক্ষিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থের নাম প্রকৃতই নীলমতপুরাণ। পৌরাণিক কাহিনীকে আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিবার শক্তি কল্‌হণের ছিল না। এই বিংশশতাব্দীর অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অন্ধবিশ্বাসজনিত কুসংস্কার সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে কার্কোট বংশীয় রাজগণের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৭২০, রাজার সংখ্যা ১৭ এবং তাঁহাদের রাজ্যকালের সমষ্টি ২৫৪ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন অর্থাৎ ৬০২ হইতে ৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই তরঙ্গের কাহিনীবিন্যাসে দেখা যায়, কল্‌হণ ইহার অনেকখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী-মূলক গ্রন্থাদিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজশাসন ও প্রশস্তি প্রভৃতি হইতে উপলব্ধ

জ্ঞানদ্বারা উহার কিয়দংশ সংশোধন করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কল্‌হণ প্রদত্ত কার্কোটরাজগণের ইতিহাসের কাঠামোটি দোষদুষ্ট নহে। রাজগণের পারম্পরিক সম্পর্ক এবং পারম্পর্য ঐতিহাসিক বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু কার্কোটরাজগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যে রাজ্যকাল উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল মোটামুটি ভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কার্কোটবংশীয় শেষ তিনজন নরপতির রাজত্বকালের বর্ণনায় কল্‌হণ নির্দ্দিষ্ট বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অজিতাপীড় ৩৮৮৯ লৌকিক সংবৎসরে (৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে) ও অনঙ্গাপীড় ৩৯২৬ লৌকিকাব্দে (৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) সিংহাসন লাভ করেন এবং উৎপলাপীড় ৩৯৩১ লৌকিকাব্দে (৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) স্বর্গলাভ করিলে উৎপলবংশীয় অবন্তিবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তারিখগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু কার্কোটবংশীয় আদিরাজগণের কালনির্ণয়ে কল্‌হণের প্রায় ২৫ বৎসরের ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। কল্‌হণের মতে কার্কোটরাজ চন্দ্রাপীড় ৩৭৬৩-৭২ লৌকিকাব্দ বা ৬৮৭-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। কিন্তু চীনদেশের খাঙ্‌ রাজবংশের ইতিহাসে দেখা যায়, কাশ্মীররাজ চেন্‌-থো-লো-পি-লি অর্থাৎ চন্দ্রাপীড় ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবদিগের বিরুদ্ধে চীনসম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাট্‌ তাঁহার রাজোপাধি মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যায়, চন্দ্রাপীড় কল্‌হণ নির্দ্দিষ্ট ৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ স্থলে প্রকৃতপক্ষে উহার ২৫ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কল্‌হণের মতে চন্দ্রাপীড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য ৩৭৭৬-৮১৩ লৌকিকাব্দ বা ৬৯৯-৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। কিন্তু চীনদেশীয় ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মু-তো-পি অর্থাৎ মুক্তাপীড় ৭৩৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তিনতরঙ্গের কালনির্ণয় সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক; চতুর্থতরঙ্গের শেষাংশের কালনির্দ্ধারণ ঐতিহাসিক, কিন্তু উহার প্রথমাংশের কালনিরূপণ ত্রুটিবিমুক্ত নহে। চতুর্থ তরঙ্গের পর হইতে কল্‌হণের গ্রন্থকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থাৎ পঞ্চম হইতে অষ্টম তরঙ্গের রচনায় কল্‌হণকে অনশ্রুতিমূলক পৌরাণিক কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয় নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই অংশে ৮৫৬ হইতে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশের প্রথম নরপালের সম্পর্কেই সর্ব্বপ্রথম রাজতরঙ্গিণীতে সুনির্দ্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ দেখা যায়। এই তারিখ ৩৯৩৯ লৌকিকাব্দের অর্থাৎ ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। পঞ্চম তরঙ্গে ৪৮৩ শ্লোকে উৎপলবংশীয় ১২জন নরপতির রাজত্বকাল (৮৫৬-১৩৯ খ্রীঃ) বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠতরঙ্গের শ্লোকসংখ্যা ৩৬৮; ইহার বিষয়বস্তু

১৩৯ হইতে ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ জন শাসকের রাজত্বকাল। সপ্তমতরঙ্গে ১৭৩২ শ্লোকে প্রথম লোহর বংশীয় ৬ জন নরপতির রাজত্বকালের (১০০৩-১১০৩ খ্রীঃ) বর্ণনা পাওয়া যায়। অষ্টমতরঙ্গের শ্লোকসংখ্যা ৩৪০৬; ইহা ব্যতীত গ্রন্থশেষে ৪৪ শ্লোকের একটি পরিশিষ্টে সমগ্র রাজতরঙ্গিণীর সংক্ষিপ্তসার দেখা যায়। এই তরঙ্গে দ্বিতীয় লোহর বংশীয় ৬ জন নরপালের শাসনকালীন অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস (১১০১-৫০ খ্রীঃ) বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমতরঙ্গের বর্ণিত বিষয় সমস্তই কল্‌হণের জীবনকালের ঘটনা। ইহার অনেক ঘটনা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মুখে অবগত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর অষ্টম অর্থাৎ শেষ তরঙ্গটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাতটি তরঙ্গের সমান। ইহার কারণ এই যে, এই অংশের ঘটনাবলী সমস্তই গ্রন্থকারের নখদর্পণে ছিল। সপ্তম তরঙ্গের শেষাংশের ঘটনাও কল্‌হণ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মুখে অবগত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই তরঙ্গের শেষাংশে বর্ণিত রাজা হর্ষের শাসনকালের (১০৮৯—১১০১ খ্রীঃ) বিবরণ এবং উহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কিছুকালের কাহিনী কল্‌হণ তদীয় পিতা হর্ষরাজের মহামাত্য চম্পকের মুখে শুনিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের এই শেষদিকের প্রায় ৮০ বৎসরের ইতিহাস বর্ণনায় কল্‌হণের অন্তর্দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা, সংযম, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি ঐতিহাসিকোচিত বিবিধগুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যে জয়সিংহের রাজত্বকালে ১১৪১-৫০ খ্রীষ্টাব্দে কল্‌হণ রাজতরঙ্গিণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ঐ রাজা এবং তাঁহার পিতা কাশ্মীররাজ সুস্সলের দোষগুণের নিরপেক্ষ বর্ণনাতেও গ্রন্থকারকে বিমুখ দেখা যায় না। ইহাতে কল্‌হণের আশ্চর্য্য স্বাধীনচিত্ততা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশের ক্ষুদ্রবৃহৎ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি কবির লেখনীস্পর্শে যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বর্ণনায় এবং মন্তব্যাদিতে মাঝে মাঝে সত্যের এমন সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায় যে, উহাকে কল্‌হণের রচনাকৌশলের সার্থকতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কল্‌হণ তাঁহার রাজতরঙ্গিণীকে কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কাব্যখানি শান্তরসপ্রধান, কারণ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতাই ইহার শিক্ষা। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে কবিকে স্বভাবতঃই হিন্দু ধর্ম্মনীতির দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত দেখা যায়। জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্ট, পাপপুণ্যের ফলাফল এবং তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব বিষয়ে তিনি প্রচলিত হিন্দু সংস্কার অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগেও যখন আমরা অনেক সুশিক্ষিত লেখককে প্রাচীন সংস্কার ও ধর্ম্মনীতির প্রভাবাধীন দেখিতে পাই, তখন আটশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজতরঙ্গিণী রচয়িতার নিকট অধিক কিছু আশা করা কঠিন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে,

স্বদেশপ্রীতি কল্‌হণকে কদাপি সত্যপথচ্যুত করিতে পারে নাই। কাশ্মীরীয়-গণের দোষত্রুটি প্রদর্শনে কবি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। কাশ্মীরবাসীদের সাহসের অভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা, কাশ্মীরসেনার ভীরুতা, নরনারী চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের তিনি বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ্মীরের সাধারণ প্রজাগণের সম্পর্কে একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "আমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তথাপি প্রজারা যে কিসের জন্য অসন্তুষ্ট এবং কিসের জন্য প্রসন্ন হয়, তাহা আমার পক্ষেও আশ্চর্যের বিষয়। সাধারণ প্রজাগণ পশুতুল্য। তাহারা অল্পেই প্রতিকূল, আবার অল্পেই অনুকূল হইয়া থাকে। ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" কাশ্মীরীদিগের তুলনায় কল্‌হণ বিদেশীয়গণের সৈনাপত্য, বীরত্ব, সৎসাহস, প্রভুভক্তি প্রভৃতি গুণের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কায়স্থসংজ্ঞক প্রজার রক্তশোষক রাজকর্মচারী, স্বার্থপর ও রাজদ্রোহপ্রবণ ডামর-সংজ্ঞক ভূস্বামী, রাজদ্বারে প্রায়োপবেশনপরায়ণ পুরোহিতপর্ষদ্ এবং চাটুকার রাজপরিষদ্‌বৃন্দের প্রতি কবির অবিমিশ্র ঘৃণা দেখা যায়। রাজপরিষদদিগের সম্বন্ধে কল্‌হণ একস্থানে বলিয়াছেন, "ধূর্ত চাটুকার অপ্রয়োজনেও সহাস্যে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হয়। রাজাও প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে সেই দুষ্টমতিকে 'কিহে, কি ব্যাপার' বলিয়া সম্ভাষণ করেন। তখন সেই শঠ কিছুক্ষণ বলিবলি করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে এবং হঠাৎ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মান, প্রাণ ও গুণাবলীর উপর বজ্র নিক্ষেপ করে। রাজপ্রিয় চাটুকারসম্প্রদায় নিতান্ত অসহ্য; কত ভঙ্গী করিয়াই তাহারা পদচারণ করে; যেন কত গোপনীয়, এইভাবে প্রভুর কাণে কাণে কথা কহে; নয়ন অর্দ্ধমুদ্রিত ও কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া তাহারা জগৎকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রভুর অসন্তোষজনিত মুখবিকারকে তাহারা সাদর তিরস্কার এবং প্রভু-দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্তিকে অনুগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করে।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "যদি কেহ বলে, 'আমি গগনে চিত্র আঁকিতে পারি, মৃণালসূত্রে বস্ত্রবয়ন করিতে পারি, সুপ্রদৃষ্ট স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি, এবং তুষারখণ্ড দ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করিতে পারি', তাহা হইলে অল্পবুদ্ধি রাজারা নিজেদের বিবেচনাশক্তির অভাবে লজ্জাবশতঃ তাহার প্রতিবাদ না করিয়া সত্য বলিয়া মনে করেন এবং পরিণামে প্রতারিত হইয়া থাকেন।"

ঐতিহাসিক হিসাবে কল্‌হণের দৃষ্টি কাশ্মীরদেশের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে অনন্যভাবায় তিনি কাশ্মীরের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রাচীন শাহী রাজবংশের পতনের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একেবারে কূপমণ্ডূক বলা সম্ভব নহে। তবে পর্ব্বতমালাবেষ্টিত কাশ্মীরের বহি-র্বিচ্ছিন্নভাব তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে বলিয়াছি, কল্‌হণের মানবচরিত্র ও রাজনীতির জ্ঞান অসাধারণ ছিল। রাজা

ললিতাদিত্যের মুখে একস্থলে তিনি স্বীয় রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক মতবাদের ঘোষণা করিয়াছেন। এই "স্বদেশের অর্থাৎ কাশ্মীরের শাসনোপযোগী সারনীতি"তে বলা হইয়াছে, "এদেশে যাহারা ক্ষমতাশালী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে সদা অন্তর্বিদ্রোহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে চার্ব্বাক যেমন পরলোক হইতে ভীত ছিলেন না, সেইরূপ তাঁহাদিগকে বহিঃশত্রু হইতে ভীত হইতে হইবে না। যাহারা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে, বিনা অপরাধেই তাহাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে। কারণ একে তাহারা দুর্গমস্থান অধিকার করিয়া আছে, তদুপরি যদি ধনসঞ্চয় করিতে পারে, তবে তাহাদিগকে বশে রাখা যাইবে না। গ্রামবাসী প্রজারা যেন এক বৎসর ভোগের উপযুক্ত ধান্য এবং ক্ষেত্র কর্ষণের উপযুক্ত বলীবর্দ্দ—ইহার অধিক সঞ্চয় করিতে না পারে। কারণ প্রতিবৎসর ধান্য সঞ্চিত হইতে থাকিলে তাহারা উগ্রপ্রকৃতি ভীষণ শত্রু হইয়া রাজাদেশ অগ্রাহ্য করিবে। যখন গ্রামবাসীরা নাগরিকের ন্যায় পরিচ্ছদ, রমণী, পশমী কম্বল, আহার্য, অলঙ্কার এবং গৃহ প্রাপ্ত হয়, যখন রাজকর্ম্মচারীরা প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া কার্য না করে, যখন রাজগণ মত্ততাপ্রযুক্ত দুর্গাদির সংরক্ষণে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন, যখন সৈন্যদের বৃত্তি একই প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে থাকে, যখন রাজগণ নিজেরাই কায়স্থদিগের ন্যায় সমস্ত রাজকার্য স্বহস্তে সম্পাদনে ব্যগ্র হন, তখন বুঝিতে হইবে যে প্রজাপুঞ্জের ভাগ্যবিপর্যয় অনুসরণ করিতেছে।"

এই প্রসঙ্গে কল্‌হণের রাজনীতি জ্ঞান ও মানবচরিত্রবোধ বিষয়ক আরও দুই চারিটি সূক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা (১) যে ব্যক্তি পৌরুষদ্বারা প্রাপ্ত সম্পদ্‌কে তৎকালে ত্যাগ করিয়া অন্য দিন নীতিপ্রয়োগে উহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার অপেক্ষা সংসারে আর অধিক শোকের পাত্র কে আছে? (২) অনেকেই যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে অযোগ্যকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু অযোগ্যকে যোগ্য ব্যক্তির গুণে ভূষিত করা বুঝি দেবতারও অসাধ্য; (৩) অল্পশক্তি লোকের দেহে যেমন অমৃততুল্য পারদ সহজে জীর্ণ হয় না, তেমনই ক্ষুদ্রচেতার হৃদয়ে গুপ্তকথা স্থায়ী হয় না; (৪) যদি কোন যোগ্যব্যক্তি কখনও অপকার করে, তবে তখন তাহাকে ধ্বংস না করিয়া রক্ষা করিলে পরিণামে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়; (৫) যাহারা কেবল সুযোগ অনুসারে কালানুবর্ত্তন করে সেই সকল স্বার্থপর রাজকর্মচারীকে ধিক্! (৬) অপরীক্ষিত ভৃত্যকে বিশ্বাস করিলে মৃত্যুকালে অদৃষ্ট অস্ত্রের ন্যায় সে কার্যকালে প্রভুকে বিপন্ন করে; (৭) নীচ ব্যক্তিরা সামান্য অপকারীকে কবলে পাইলে কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, কিন্তু মূঢ়ের অত্যধিক অপকারীরও কিছুই করিতে পারে না; (৮) জগতে যাহার দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সেই নগণ্য শত্রুকে দ্বেষ করিয়া এবং তাহার জন্য অথবা ভয় প্রকাশ করিয়া লোকে তাহারই প্রভাব-

বর্ণিত করিয়া থাকে ; (৯) আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিগণের প্রভুপরায়ণতা বিপৎকালে বিপর্যস্ত হয় না ; ইত্যাদি।

পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকের ধারণা আছে যে, হিন্দু আমল ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুরাজগণ অনেকেই ধর্মপরায়ণ এবং প্রজাহিতৈষী ছিলেন। কল্হণকৃত রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হয়। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, ঐতিহাসিকের অকুণ্ঠ প্রশংসাপাত্র রাজার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন কাশ্মীরের প্রায় সমগ্র ইতিহাসই একটা দীর্ঘকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহার মধ্যে দুইচারি ব্যক্তির সাধুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান যুগের একজন ফরাসী ঐতিহাসিক—মার্ক ব্লক

শ্রীশিবপদ সেন

বর্ত্তমান যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভাষাগত অসুবিধার জন্যে বাংলাদেশের ইতিহাস অনুরাগী অনেকের নিকটেই ফরাসী ঐতিহাসিকগণ ও তাঁদের রচনা বিশেষ সুপরিচিত নয়। "ইতিহাস" পত্রিকার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের দেশের বাইরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সম্বন্ধে বাংলা ভাষার মাধ্যমে কিছুটা পরিচয় দেওয়া। সেইজন্যই আমাদের সময়কার একজন ফরাসী ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা বলবার এই প্রচেষ্টা।

বিংশ শতাব্দীর ফরাসী ঐতিহাসিকদের মধ্যে মার্ক ব্লক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। এটা খুব সামান্য কথা নয় যদি আমরা বিবেচনা করি ফরাসীদেশে ইতিহাস চর্চা কতখানি অগ্রসর হয়েছে ও বর্ত্তমান যুগে কতজন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, মার্ক ব্লকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস গবেষণায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন পদ্ধতি। তাঁর ঐতিহাসিক রচনা প্রচুর, বেশীর ভাগই মধ্যযুগের উপর। শেষ দিকে তিনি তাঁর গবেষণা আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত টেনে এনেছিলেন এবং কয়েকটি রচনার ভিতরে তিনি ঐতিহাসিকের কাজ ও ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট মতামত জানিয়েছেন।

মার্ক ব্লক ১৮৮৬ সালে লিয়ঁ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এক বৎসর পরেই তাঁর পিতা, লিয়ঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক গুস্তাভ ব্লক প্যারিসে "একোল নরমাল" এর অধ্যাপক হন, ও ১৯০৪ সালে "সরবনে" রোমের ইতিহাসের অধ্যাপক পদ লাভ করেন। গুস্তাভ ব্লক "সরবনে" ১৯১৯ পর্য্যন্ত অধ্যাপক হিসাবে ছিলেন। বর্ত্তমানে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক ইতিহাসের অধ্যাপকের মত মার্ক ব্লকও তাঁর কাছ থেকেই ইতিহাসচর্চ্চার প্রথম অনুপ্রেরণা পান। তাই মার্ক ব্লক তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই "Rois et Serfs" (রাজা ও দাস) তাঁর পিতা ও শিক্ষকের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯০৪ সালে মার্ক ব্লক "একোল নরমাল"-এ ভর্ত্তি হন, ও ১৯০৮ সালে ইতিহাস ও ভূগোল বিভাগে সমস্ত ফ্রান্সে প্রতিযোগিতামূলক "আগ্রেগাসিঁ" পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। নিজের দেশের বাইরে ইতিহাস শিক্ষার পদ্ধতি জানবার জন্যে মার্ক ব্লক এক বৎসর জার্ম্মাণীতে কাটান, বেশীর ভাগ সময় লাইপজীগ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৯ সালে তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন, ও ইতিহাসে গবেষণার জন্য তিন বৎসরের একটি বৃত্তি লাভ করেন (Fondation Thiers)। এই তিন বৎসরের কাজে তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় দেখান, ও মধ্যযুগে ফ্রান্সের সামাজিক জীবনের উপর বহু তথ্য সংগ্রহ করেন।

গবেষণা বৃত্তির তিন বৎসরের মেয়াদ শেষ হলে ১৯১২ সালে মার্ক ব্লকের অধ্যাপক জীবন সুরু হয়। প্রথম দুই বৎসর মোঁপেলিয়ে ও আমিয়ঁার "লীসে"তে শিক্ষাদান করেন। তারপর চার বৎসর প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন ও যুদ্ধ শেষে আবার নিজের সাধনার ক্ষেত্রে ফিরে আসেন। ১৯১৯ সালে তিনি ষ্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ও পর বৎসর সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। তাঁর প্রথম রচনাতেই (Rois et Serfs) মধ্যযুগের সামাজিক জীবন আলোচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন পদ্ধতির নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ষ্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই মার্ক ব্লকের অধ্যাপক জীবনের বেশীরভাগ কাটে, ১৯১৯ থেকে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত। প্রথম জীবনে তিনি প্যারিসের বিভিন্ন লাইব্রেরী ও দপ্তরখানা থেকে মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর মাল মসলা জোগাড় করেছিলেন। ষ্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতেও তিনি তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য অনেক উপকরণ পান। ষ্ট্রাস্‌বুর্গে থাকাকালীনই তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে প্রকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে সেখানকার সহকর্ম্মী লুসিয়ঁ ফেভর্‌-এর সহযোগীতায় তিনি "Annales d'histoire economique et sociale" নামক পত্রিকা স্থাপন করেন। তাঁদের দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে শীঘ্রই এই পত্রিকাটি পৃথিবীর ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে একটি উচ্চ স্থান লাভ করে। ১৯৩৩ সালে লুসিয়ঁা ফেভর্‌ প্যারিসে "কলেজ দ্য ফ্রান্স"-

এ অধ্যাপক পদ লাভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩৬ সালে মার্ক ব্লকও "সরবনে" অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাই "Annales" পত্রিকার ভিতর দিয়ে নূতন ধরণের ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে দুজনের সহযোগিতা চালাবার কোনও অসুবিধা হয় নাই। সরবনে এসে ব্লকের গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসার লাভ করে। এর আগে পর্য্যন্ত তা' শুধু মধ্যযুগেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরবনে এসে তিনি তাঁর গবেষণা আধুনিক যুগের সূত্রপাত পর্য্যন্ত টেনে এনেছিলেন। সরবনে ব্লক মাত্র তিন বৎসর অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হতেই তিনি আবার দেশরক্ষায় নিজেকে নিয়োগ করেন। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ভিসী গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হওয়াতে তাঁর পক্ষে আর সরবনে কাজ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সালে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ ও মোঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঐতিহাসিক সাধনা আবার আরম্ভ করবার চেষ্টা করেন। ১৯৪২ সালে জার্ম্মাণ শাসনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে যে গুপ্ত বিদ্রোহীদল গড়ে ওঠে তাতে তিনি যোগ দেন ও ১৯৪৪ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

মার্ক ব্লক অতি অল্প বয়সে মারা যান, মাত্র ৫৮ বৎসরে। ৩৫ বৎসর তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা করেন ও তার মধ্যেও ৭ বৎসর দুই মহাযুদ্ধ তাঁর নিজের সাধনার ক্ষেত্র থেকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যায়। প্রকৃত গবেষণার কাজ তাই মাত্র ২৮ বৎসরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি যে রচনার প্রাচুর্য্য, চিন্তার নূতন ধারা ও অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়েছেন তা অসাধারণ। তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনার নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম জীবনে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ফ্রান্সে মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থায় দাস শ্রেণীর স্থান। তাঁর প্রথম রচনা "Rois et Serfs" (১৯২০)। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর তিনি এই দাসশ্রেণীর উৎপত্তি, তাদের অবস্থা, এবং ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে এই শ্রেণীর উদ্ভব ও গঠন প্রণালীর বিভিন্নতার তুলনামূলক বিবরণ দিয়ে কয়েকটি রচনা প্রকাশিত করেন—যথা, (১) Etude sur la formation de la classe servile (Revue Historique, 1928); (২) Un probleme d'histoire compare (Revue Historique de droits francais et etranger, 1926); (৩) Liberte et servitude personelles au moyen age (Anario de Historia del Derecho espanol, 1933)। ব্লকের গবেষণার ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে আসে। তার প্রথম ফল পাওয়া যায় ১৯৩০-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ,—"La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIIIe siecle" (Annales d'histoire economique et sociale)। ১৯৩১ এ প্রকাশিত হয় "Caracteres originaux de l'histoire rurale francaise", যা কয়েক বৎসরের মধ্যেই "ক্লাসিক"

রচনার মধ্যে স্থান পায়। আগেকার রচনার তুলনায় এই বইতে তাঁর গবেষণার আরও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসীদেশের গ্রাম্য সমাজের ইতিহাস একেবারে প্রথম থেকে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত একখানি পূর্ণ চিত্রে আঁকবার চেষ্টা করেছেন এই রচনায়। কিছুদিন পরে Cambridge Economic History, Vol. I.-এ তাঁর আর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—"The Rise of Dependent Cultivation and Seignorial Institutions"। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অবশ্য শুধু মধ্যযুগের উপর, কিন্তু অন্যদিকে সেই যুগের সামাজিক জীবনের চিত্র আরও বৃহত্তর পটে এঁকেছিলেন, সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে নিয়ে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক জীবনের গঠন প্রণালী ও ভাবধারার একটা তুলনামূলক বিবরণ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর আর একটি বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে,—"La Societe feodale"। এই বইতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আরও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় যে তুলনামূলক পদ্ধতির নিদর্শন তিনি প্রথম রচনা থেকেই দিয়েছেন তারই প্রকৃষ্ট প্রয়োগ দেখা যায় এখানে। তাঁর পরিকল্পনার ছিল এই প্রসঙ্গে মধ্য যুগের অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও সমতুল্য একখানা বই লেখা, কিন্তু সে কাজ আর তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নাই। শুধু তার কয়েকটি অংশ প্রকাশিত হয় তাঁর "Annales" পত্রিকায়, মধ্যযুগের মুদ্রাসমস্যা ও পণ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন পদ্ধতির আবিষ্কারের উপরে। মার্ক ব্লক ছিলেন প্রধানতঃ ফরাসী দেশের ঐতিহাসিক, কিন্তু গবেষণায় তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে জার্ম্মাণীর ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মায়। মধ্যযুগের জার্ম্মাণীর ইতিহাসের বিষয়ে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গে থাকাকালীন বহু তথ্য সংগ্রহ করেন, যদিও জার্ম্মাণীর উপর তাঁর প্রকাশিত রচনার সংখ্যা খুবই কম। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯২৮-২৯ সালে প্রকাশিত "L' Empire et l' idee d' Empire sous les Hohenstaufen"। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত "Revue Historique" পত্রিকায় জার্ম্মাণীর মধ্যযুগের ইতিহাসের উপরে বিভিন্ন ভাষায় লেখা বইয়ের ধারাবাহিক ভাবে সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা থেকে পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায় তিনি জার্ম্মাণীর ইতিহাস সম্বন্ধে কত গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন।

মার্ক ব্লকের "Annales" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। সেগুলির সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই এখানে বলা যেতে পারে যে তা' পত্রিকাটি স্থাপন করবার প্রধান উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছিল—ঐতিহাসিক গবেষণায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন পদ্ধতির প্রচলন। ঐতিহাসিক রচনার দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির সম্বন্ধে আলাদাভাবেও কয়েকটি বইতে তাঁর মতামত প্রচার করেছেন। তাদের মধ্যে শুধু তিনটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে অসলোতে আন্তর্জাতিক

ঐতিহাসিক সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ,—"Pour nue histoire comparee des societes europeennes"। ১৯৩৭ সালে Centre polytechnicien d'etudes economiques-এ একটি সারগর্ভ অভিভাষণ দেন,—"Que demander a l' histoire ?" এ বিষয়ে তাঁর মতামতের সব চাইতে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় তাঁর শেষের রচনায়, "Metier d' historien", ১৯৪১-এ লেখা। মার্ক ব্লকের রচনার মধ্যে আরও দুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের পর তিনি মোঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অধ্যাপকের কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর এই সময়কার, ১৯৪১-৪২, লেকচারগুলি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৫ সালে, তাঁর বন্ধু ও ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রধান সহকর্মী লুসিয়ঁ ফেভর পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। বইখানার নাম "Les iuvasious Barbares" ও এর বিষয়বস্তু হচ্ছে বর্বর জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যে দুটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রথার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তারই বিস্তৃত আলোচনা। তাঁর শেষ জীবনের আর একটি রচনা হচ্ছে "L'Etrange Defaite"। ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক কারণগুলি আলোচনা করবার জন্য ১৯৪০-এ বইখানি লেখেন। যদিও এটা তাঁর পূর্বেকার ঐতিহাসিক রচনার থেকে একেবারে বিভিন্ন ধরণের তথাপি ফরাসী ইতিহাস অনুরাগী পাঠকদের কাছে এর মূল্য অনেক। মার্ক ব্লকের রচনার মোটামুটি একটা তালিকা দেবার পর ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন গবেষণা পদ্ধতির বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক কাজে মার্ক ব্লকের বৈশিষ্ট্য তাঁর ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা। তাঁর মতে ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাজবদ্ধ মানবের বিষয়ে অনুসন্ধান করা। এই সমাজবদ্ধ মানবকে তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপের সমষ্টি নিয়েই দেখা কর্ত্তব্য, সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রূপে নয়, যথা ধর্ম্মনীতি হিসাবে, রাজনীতি হিসাবে অথবা অর্থনীতি হিসাবে। ঐতিহাসিকের প্রয়োজন বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী, যার দ্বারা ইতিহাস রচনার বিভিন্নপ্রকার উপকরণের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি গিয়ে পড়বে জীবন্ত বাস্তবের উপর।

ইতিহাসের কাজ কালের গতিধারা বেয়ে চলমান এক একটি সমাজকে পর্যবেক্ষণ করা ও সময়ের ভেদাভেদে তার গঠনপ্রণালীর বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা। এই বিভিন্ন কাঠামোর ভালমন্দ বিচার করা বা গুণাগুণের তুলনা করা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য নয়। তার কর্ত্তব্য শুধু কি কি কারণে বিভিন্নতা এসেছিল তাই অনুসন্ধান করা ও তাই নিয়ে আলোচনা করা। এই হিসাবে বলা যেতে পারে যে ইতিহাস বিজ্ঞানের সেই শাখা যার কাজ সমাজের গতিধারার বৈচিত্র্যগুলির বিষয়ে গবেষণা করা। একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে ইতিহাসের কারবার

শুধু অতীতকে নিয়ে, কিন্তু মার্ক ব্লক এই চলতি ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন। চিরপ্রবাহমান কালের গতি থেকে বর্তমানকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ঐতিহাসিক ও অতীতের মধ্যে একটি মস্ত ব্যবধান স্থাপন করা তিনি একেবারেই সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ঐতিহাসিকের পক্ষে তার গবেষণার ধারা শুধু অতীতেই সীমাবদ্ধ না রেখে বর্তমান পর্যন্ত টেনে আনা উচিত। কারণ যেমন বর্তমানকে ভাল ভাবে বুঝতে হলে প্রয়োজন অতীতের বিষয়ে অনুসন্ধান করা, তেমনি অতীতকে ভালভাবে বুঝতে হলে প্রয়োজন সেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর যা আসে বর্তমান সমাজের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করে।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল গতিধারার পূর্ণ চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন ও কালের ভেদাভেদে সামাজিক গঠনপ্রণালী ও চিন্তাধারার বিভিন্নতা কি কি কারণে হয়েছে সে বিষয়েও অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তাঁদের কাজের একটি ত্রুটি মার্ক ব্লকের কাছে বিশেষ নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে অতীতের কোনও এক স্তরের একটি সমাজের জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক চিন্তাধারার মানদণ্ডে তার দোষগুণ বিচার করা হয়েছে। এ যুগে আমাদের কাছে যা স্বাভাবিক, যুক্তিপূর্ণ ও সুবিধাজনক বলে মনে হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই অতীত সমাজকে দেখা হয়েছে। এর প্রধান কারণ যে ঐতিহাসিক অতীত সমাজের বিষয়ে আলোচনা করেছেন নিজেকে সম্পূর্ণ বাইরে রেখে। ব্লকের মতে ঐতিহাসিকের কর্তব্য যে যুগের চিত্র তিনি রচনা করতে চান তার ভিতরে নিজেকে স্থাপন করা। ভিতর থেকেই তখনকার জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখাই তাঁর কাজ। নিজেকে ভিতরে রেখে অতীতের সমাজচিত্র আঁকবার চেষ্টা করলে ঐতিহাসিকের কাছে আর মোটেই বিস্ময়জনক মনে হবে না যে কেন তখনকার দিনের লোকেরা কোনও নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজী হয়নি যদিও আধুনিক কালের চিন্তাধারায় আমরা সেই পদ্ধতিকে একমাত্র স্বাভাবিক, যুক্তিপূর্ণ ও সুবিধাজনক বলে মনে করি।

যে সকল ঐতিহাসিক অতীত সামাজিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই আর একটি ত্রুটি দেখা যায়। যখন তাঁরা আলোচনা করেন অতীতের কোনও একটি যুগের সমাজের বিষয় যার ভিত্তি দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীবনপ্রণালী ও ভাবধারার উপর, তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে এই দুটির মধ্যে শুধু একটি থেকে নূতন জীবনপ্রণালী ও ভাবধারা উদ্ভূত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ইউরোপের মধ্যযুগের সামাজিক জীবন নিয়ে যে তর্ক বিতর্ক ঐতিহাসিকদের মধ্যে উঠেছে। মধ্যযুগের প্রথম ভাগের যে সমাজ তার ভিত্তি দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীবনপ্রণালী ও চিন্তাধারার উপর—একটি যেমান,

আর একটি জার্মান। সময়ের পরিবর্তনে যে নূতন জীবন প্রণালী ও চিন্তাধারা গড়ে উঠলো তার উৎস কোন কোন ঐতিহাসিক দেখাতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ রোমান ও কোন কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ জার্মান। আর এই নিয়ে দুই দলের মধ্যে ঘোর বাকবিতণ্ডা হয়েছে যা মার্ক ব্লকের মতে একেবারেই অনর্থক। ব্লকের মত হচ্ছে যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলবার সময় প্রত্যেক সমাজেরই একটা নিজস্ব সৃজন শক্তি থাকে, যার দ্বারা সে বিভিন্ন জীবন প্রণালী ও ভাবধারার সমন্বয় করে নূতন একটি ঐক্য স্থাপন করতে পারে যা সেই যুগের উপযোগী। মধ্য যুগের ফিউডাল পদ্ধতির উৎপত্তি খুঁজতে শুধু রোমান কি শুধু জার্মান উৎসের দিকে যাওয়া মানে একটি সজীব সমাজের নিজস্ব সৃজন শক্তিকে উপেক্ষা করা। এ বিষয়ে মার্ক.ব্লক একটি সুন্দর আরব প্রবাদের উল্লেখ করেছেন তাঁর "ফিউডাল সমাজ" এর উপর লেখা বইতে—"মানুষ তার পূর্বপুরুষের চাইতে তার নিজের সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলা দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিত"।

ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে মার্ক ব্লকের অভিমত যে সকল প্রকার বিজ্ঞান যার আলোচ্য বিষয় মানুষ তাদের সমন্বিত সাহায্য ঐতিহাসিকের নেওয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিক যখন মানুষকে তার সকল রকম বৈচিত্রময় রূপের সমষ্টি নিয়ে দেখতে চান তখন তাঁকে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্য নিতে হবে, যথা প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানভাণ্ডারের সমন্বিত সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাই ব্লককে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা "Annales" স্থাপন করতে। সেই পত্রিকার প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে তিনি চেষ্টা করেছিলেন মানব-গবেষণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ভেঙ্গে ফেলে ইতিহাসকে একটা নতুন পূর্ণতা দিতে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য মার্ক ব্লক দুটি পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন,—একটি হচ্ছে ক্রমশঃ অতীতের দিকে অগ্রসর হওয়া, আর একটি হচ্ছে একই সময়কার বিভিন্ন সমাজের গঠন-প্রণালী ও ভাবধারার তুলনা করা। এই দুটি পদ্ধতিই তিনি তাঁর নিজের রচনার ভিতরে যথেষ্ট ভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রথম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে ঐতিহাসিক বর্তমান থেকে আরম্ভ করবেন ও ক্রমশঃ অতীতের দিকে এক এক স্তর পেছিয়ে যাবেন, তাহলে সমাজের পরিবর্তনগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে ও তার কারণগুলিও সহজ ভাবে নির্দেশ করা যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে ঐতিহাসিক একই সময়কার ভিন্ন ভিন্ন সমাজের গঠন প্রণালী ও ভাবধারা পাশাপাশি রেখে দেখবেন তাদের মধ্যে একই রকম জিনিষ কি কি আছে। পৃথক পৃথক সমাজের মধ্যে যে যে বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে তিন রকমে—হয়ত' সাদৃশ্যগুলি এসেছে পৃথক পৃথক সমাজের অবস্থার সমতা ও গতিধারার একতার জন্য; হয়ত' এসেছে একই রকম বাহ্যিক প্রভাবের জন্য; কিংবা

হয়ত' এসেছে একটি সমাজ আর একটি সমাজকে অনুকরণ করবার জন্য। বিভিন্ন সমাজের ভিতরে সাদৃশ্যের চাইতেও পার্থক্যগুলিই ঐতিহাসিকের পক্ষে আরও মূল্যবান,—একই প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন দেশে কি ভাবে ও কি কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই তুলনামূলক পদ্ধতি মার্ক ব্লক অনুসরণ করেছেন তাঁর প্রায় সব রচনাতেই, বিশেষ করে "ফিউডাল সমাজ" নামে বইতে। কোন কোন সময় আবার দুটি পদ্ধতিই একই সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্ত্তমান যুগেও এমন দেশ আছে যেখানকার সামাজিক অবস্থা অন্য এক দেশের কোনও এক অতীত যুগের সামাজিক অবস্থার সাথে তুলনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্ক ব্লক দেখিয়েছেন যে বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভেও স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে ফিউডাল যুগের পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে।

বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য তুলনা করা, এই পদ্ধতির দুটি বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ এর সাহায্যে সামাজিক জীবনধারার পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ এই তুলনামূলক পদ্ধতি ইতিহাসের ধারার একটি নিয়ম প্রতিপন্ন করে যে একই রকম কারণে প্রত্যেক সমাজে একই রকম পরিবর্ত্তন আসে। স্থান ও কালের অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে যে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে একই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর উদাহরণস্বরূপ মার্ক ব্লক দেখিয়েছেন ইউরোপ ও জাপানের ফিউডাল পদ্ধতির সাদৃশ্য। তুলনামূলক গবেষণার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকটি বড় বড় সামাজিক ব্যবস্থার চিত্র খুঁজে বের করা যেতে পারে ও কি কি কারণে এক একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাও পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। এক হিসাবে এই ভাবে ইতিহাসের ধারার যে অবশ্যম্ভাবী নিয়ম একটা আছে তার কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়। মার্ক ব্লক এই নিয়মে বিশ্বাস করেন, যদিও তিনি একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই ঐতিহাসিক নিয়ম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের মত নয়, যে কখনও এর ব্যতিক্রম হবে না। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই যে আমাদের অতীতের ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা সীমাবদ্ধ ও তার মধ্যে অনেক জিনিষই সংশয়পূর্ণ আছে। সেইজন্য অতীত ইতিহাস শিক্ষা করে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি যে এই কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে সব সময়ে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সামাজিক জীবন, তার গঠন প্রণালী ও চিন্তাধারা এত জটিল যে তাকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা ও তার পিছনে যে যে প্রভাব কাজ করেছে সবগুলি নির্দ্দেশ করা প্রায় অসম্ভব। তাই অতীতের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে যে অবশ্যম্ভাবী নিয়ম কাজ করেছে বলে আমরা প্রমান করতে চাই, তারই উপরে ভিত্তি করে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ ভাবে বলতে পারি না যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে কি পরিস্থিতি হতে পারে।

ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ে মার্ক ব্লকের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে কি কি প্রভাব তাঁর মনের উপর কাজ করেছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। মার্ক ব্লকের ছাত্রজীবন যে সময়ে কাটে, তখন ফ্রান্সে মানব-বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা অনেক উন্নতি লাভ করেছে ও তাদের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ও পদ্ধতির প্রচলন হয়। মানব-বিজ্ঞান চর্চ্চায় এই বাঁধা নিয়মপদ্ধতি স্বভাবতঃই ব্লকের মনে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম প্রভাব আসে ভাষাতত্ত্ব থেকে। Meillet-এর প্রতিভা ফ্রান্সে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাকে এক উঁচু পর্য্যায়ে তুলে দিয়েছিল। মার্ক ব্লক মানব-বিজ্ঞানের এই শাখা থেকে তুলনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন ও ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় প্রভাব আসে ভূগোল বিজ্ঞান থেকে। Vidul de Lablache ফ্রান্সে এই বিজ্ঞানকে একটি নূতন সঞ্জীবরূপ দান করেন যার ফলে ভূগোল বিজ্ঞান তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে মস্ত একটা আকর্ষণের জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। তখনও পর্য্যন্ত ইতিহাস ছিল অনেকটা abstract দর্শনের পর্য্যায়ে যার সাথে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ খুব কম। আর ভূগোল বিজ্ঞান যে নূতন রূপ নিয়ে দাঁড়াল তার ভিত্তি হল মাটি ও মানুষ। তাতেই প্রভাব মার্ক ব্লককে অনুপ্রাণিত করে ইতিহাসকে নূতন বাস্তবরূপে দেখতে ও সেই জন্যই তিনি গ্রাম্য সামাজিক জীবনের ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হন। তৃতীয় প্রভাব আসে Durkheim-এর সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা থেকে। মার্ক ব্লক নিজেই বলেছেন যে তিনি Durkheim-এর "Annee Sociologique" থেকে কতখানি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এই সমাজ বিজ্ঞান থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন মানবসমষ্টি অথবা সমাজের ধারণা। তিনি যে ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ও তাঁর আলোচ্য বিষয়ের পাশে সমসাময়িক অন্যান্য সমাজকে দাঁড় করিয়েছেন সাক্ষী হিসাবে, তার ভিতরে Durkheim-এর প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। মার্ক ব্লকের কাছে সামাজিক ইতিহাস রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। ইতিহাসে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। 'সরবন' বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর হত। তবে materialism-পন্থী ঐতিহাসিকদের মত তিনি কখনই স্বীকার করেন নাই যে ইতিহাসের ধারার উপর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের ধারার উপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব মার্ক ব্লকের কাছে আরও অনেক কম। তাঁর ছাত্রজীবনের সময় ফ্রান্সে ইতিহাসশিক্ষার প্রণালীতে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও তাদের প্রভাবকেই অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। তাঁর মতে এরূপ প্রণালী অত্যন্ত অযৌক্তিক ও নিন্দনীয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মূল্য খুব কম। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ভিতর থেকে কোনও ঐতিহাসিক নিয়ম

খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব, কারণ সেগুলি নির্ভর করে কোনও এক একটি লোকের কাজ ও চিন্তাধারার উপর, সমগ্র সমাজের চিন্তাপ্রণালী ও গতিধারার উপর নয়। ব্লকের দৃষ্টিতে ইতিহাসে একের মূল্য কম, সমষ্টির মূল্য বেশী। 'এক'কে তিনি যথাসম্ভব বাদ দিয়েছেন তাঁর ঐতিহাসিক রচনায়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর ফিউডাল সমাজের উপর বইখানায়। *

ঐতিহাসিক ফিসার

শ্রীঅমলেন্দু ত্রিপাঠী

বর্তমান শতাব্দীর প্রতকীর্তি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফিসার বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির মহত্তম দানে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর মন, জীবনে ঘটেছিল সার্থক অধ্যাপনা ও মূল্যবান্ গবেষণার দুর্লভ যোগাযোগ। ক্লাসিক সভ্যতার ইতিহাসে পারদর্শিতা লাভ করে তিনি গবেষণা সুরু করেন মধ্যযুগ সম্বন্ধে, ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ান প্রসঙ্গে তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে পরিণতি পায় 'ইউরোপের ইতিহাসে'। প্রিয় কবি দান্তের মত তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইউরোপীয় ইতিহাসের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে। আর এ জ্ঞান শুধু বক্তৃতা-মঞ্চ ও পাঠাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কর্মজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাঁর অভিজ্ঞতাকে করেছিল ব্যাপক ও বাস্তব, অন্তর্দৃষ্টিকে গভীর ও মূলগামী, বিশ্লেষণ শক্তিকে তীক্ষ্ণ, সমন্বয়-শক্তিকে সৃষ্টিধর্মী। ট্রেভেলিয়ানের মত তিনিও চেষ্টা করেছিলেন ইতিহাস রচনার পদ্ধতিকে নীরস জার্মান-পাণ্ডিত্যের নাগপাশ হ'তে মুক্ত করতে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বতঃসিদ্ধ অথচ সঙ্কীর্ণ ধ্যানধারণা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি, সমসাময়িক ইতিহাসের গতি সম্যক উপলব্ধি করার মতো নিরপেক্ষতা হয়তো তাঁর ছিল না, তথাপি স্বীকার করতেই হবে তিনি সাধারণ ঐতিহাসিক ছিলেন না। একটি মুমূর্ষু অথচ মহান্ জীবনদর্শন—একটি ক্ষীয়মান অথচ মানবিক ঐতিহ্যের প্রতিভাবান্ ধারক ছিলেন নিউ কলেজের বিখ্যাত ওয়ার্ডেন—এই চ. এ. এল. ফিসার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একদিকে যেমন ইতিহাসের ধারা ও লক্ষ্য নিয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি গবেষণা ও রচনার পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা চলেছিল। প্রথমক্ষেত্রে মার্ক্স ও ওয়েবারের প্রভাব ক্রমশঃই

[* ফরাসী পত্রিকা "Revue Historique" এর ১৯৪৮ সালের এপ্রিল—জুনের সংখ্যায় প্রকাশিত Ch. E. Perrin'র প্রবন্ধ "L'oeuvre historique de Marc Bloch" থেকে সংক্ষেপিত ও অনূদিত।]

বৃত্তি পাচ্ছিল—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্কে ও লর্ড অ্যাক্টনের মত প্রায় সর্ব্বজন স্বীকৃত হয়ে উঠেছিল। র‍্যাঙ্কের বিখ্যাত উক্তি 'History as it really happened' জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত ইংরাজ অধ্যাপকমহলে বেদবাক্যের মর্য্যাদা পেয়েছিল। লর্ড অ্যাক্টন ঐতিহাসিকের কাছে কঠোর বৈজ্ঞানিক সংযম দাবী করেই ক্ষান্ত হলেন না, তদুপরি আশা করলেন অপক্ষপাত নৈতিক বিচার। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের লেখকদের কাছে সম্পাদক আবেদন জানালেন "যেন আমাদের ওয়াটার্লু ফরাসী, ইংরেজ, জার্মাণ এবং তাদের সমানভাবে তুল্য করে।"

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিকের নৈতিক কর্ত্তব্য কোনটাই স্বীকার করেন নি ফিশার। তাঁর মতে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক অতীত অজ্ঞেয়। র‍্যাঙ্কের নিরপেক্ষতার আদর্শের কষ্টিপাথরে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে একমাত্র তারিখের তালিকা। লেখকের ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ ইতিহাস সম্ভব নয়, কারণ ইতিহাস ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্বের মুকুরে অতীতের প্রতিবিম্ব। মতামতের ক্ষেত্রে সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক। তাছাড়া নৈতিক বিচারের গুরুদায়িত্বের ওপর অধিক জোর দেওয়া ঠিক নয়, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের কোন আবশ্যিক কর্ত্তব্য আছে কিনা বিতর্কের বিষয়।

আরেক ব্যাপারে ফিশার বৈশিষ্ট্য দেখালেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানালেন—তাঁর কোন নিজস্ব ইতিহাস-দর্শন নেই, পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করলেন তেমন দর্শন রচনা করা সম্ভবও নয়। ইউরোপের ইতিহাসের ভূমিকায় তিনি লিখলেন—"আমার চেয়েও জ্ঞানবান পণ্ডিতের ইতিহাসের মধ্যে একটা ধারা, একটা ছন্দ, একটা পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পরিকল্পনা লক্ষ্য করেছেন। আমার চোখে এই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য ধরা পড়েনি। আমি দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গানুগামী তরঙ্গের মত এক ক্রান্তি আরেক ক্রান্তিকে অনুসরণ করছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ বিধান—তিনি মানবভাগ্য বিবর্ত্তনের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অজ্ঞেয় শক্তির লীলা স্বীকার করবেন।" টয়নবির Study of History সমালোচনা প্রসঙ্গে একই কথার পুনরুক্তি শুনি, ইন ও ইয়াং-এর ছন্দ সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "Other ears will be less sensitive to the regularity of the Chinese beat." মানবপ্রগতি প্রকৃতির বিধান নয়, জীবনপ্রবাহে চিরদিন জোয়ার বয় না, কোনো পরিণতিই নয় অনিবার্য্য। ওয়ালের ভাষায়—"the human record is illogical, often cataclysmic."

এই মন্তব্য প্রধানতঃ মার্ক্স-প্রবর্ত্তিত ইতিহাস-দর্শনের বিরুদ্ধে। হেগেলের ইতিহাস-দর্শনকে বস্তুবাদের ছাঁচে ঢেলে ইতিহাসের অগ্রগতির একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারার সন্ধান দিয়েছিলেন মার্ক্স। সমাজের প্রগতি যে শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এবং শ্রেণী সংগ্রামের পশ্চাতে যে অর্থনৈতিক শক্তির আত্যন্তিক প্রেরণা,—একথা

ইংল্যাণ্ডের চিন্তাজগতে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ওয়ার্ণার সমবার্ট ও ম্যাক্স ওয়েবারের রচনার ভিতর দিয়ে এই নব্য ইতিহাস-দর্শন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ইতিহাস বহু ক্ষেত্রে এক নূতনতর ও বাস্তবতররূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। উদার-পন্থী ফিসার স্বভাবতঃই একে মেনে নিতে পারেন নি। বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বা প্রগতি-মূখী ভূমিকা অস্বীকার করেছে তাঁর পার্লামেণ্ট, পার্টি ও সংস্কার-বিশ্বাসী মন, বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অস্বীকার করেছে অর্থনৈতিক প্রেরণার অসঙ্গত বাহুল্য। "It would be too great a simplification of issues to regard the European story as nothing but a struggle of classes, a clash of economic interests. That would be to underrate the rich and varied staff of human nature, the distractions of statesmen and the waywardness of events." কিন্তু ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যায় উদারনীতিবিদের উল্লেখিত আপত্তি আশ্চর্য্য নয়, আশ্চর্য্য—অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের মত তিনি কোনো স্বল্পীন প্রগতিবাদের প্রচার বা আদর্শবাদের অনুগান করেন নি। তাঁর মধ্যে ভিক্টোরীয় আত্মপ্রত্যয় বা আত্মপ্রসাদ অনুপস্থিত। লক, বেন্থাম, মেকলে ও স্পেন্সারের উত্তরাধিকারীর পক্ষে এমন নৈরাশ্যবাদ বিস্ময়কর।

সূক্ষ্ম বিবেক ও বহুবাদী (Pluralist) দৃষ্টিভঙ্গী, গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব ও উদার নীতির অনুশাসন—অনেকগুলি কারণই এমন মনোভাবের পশ্চাতে রয়েছে। অগাষ্টাস ও হেনরীর ছাত্র, প্লেটোর ভক্ত ফিসার ভগবদভিপ্রায়ে উদাসীন ছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশের মধ্যে তাই তিনি ঐশী শক্তির লীলা লক্ষ্য করেন নি। গ্রীক ধর্ম, গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক নাটক, যেগার যাকে গ্রীক প্যাডিয়া (Padeia) বলেছেন, সকলেই দুজ্ঞেয় অদৃষ্টের মহিমা কীর্তন করেছে, সকলেই মানবের ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে—যার অভ্রভেদী মাহাত্ম্য আকস্মিকতার আঘাতে মুহূর্তে ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। গ্রীক ইতিহাস অস্বীকার করেছে অথণ্ড বৈশ্বিক প্রগতির অস্তিত্ব, বিশ্বাস করেছে পতন-অভ্যুদয়ের অন্তহীন চক্রাকার আবর্তন। ফিসারের মতামত বহুলাংশে গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত।

উদারনীতিবিদ হয়েও কেন তিনি প্রগতিবিশ্বাসী নন—অথচ জড়বাদী ব্যাখ্যা-বিরোধী সে তথ্য উপলব্ধি করতে হলে উদারনীতির ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করতে হয়। An Unfinished Autobiography'র একস্থলে ফিসার বলছেন —"ইংল্যাণ্ডে আমি মানুষ হয়েছি অথণ্ড শান্তি ও প্রসারশীল বাণিজ্যের যুগে, পৃথিবীর সর্বত্র জীবনযাত্রার মানদণ্ড ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছিল, যুক্তিবাদের প্রাধান্য বেড়ে চলেছিল, রাজনৈতিক বিতণ্ডা তীব্র ছিল বটে, কিন্তু তা অপ্রধান বিষয় নিয়ে।" এই পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের উদারপন্থী রাজনীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন

ভাবধারার সঙ্গম—উদার নীতি,—তাতে মিলেছে বেনেশাঁয়ঃব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরব-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতি, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, অ্যাডাম স্মিথ-প্রবর্তিত লাসে ফেয়ার বা নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দর্শন, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসূত এবং ফরাসী বিপ্লব সম্বলিত মানবিক মৌল অধিকারের বাণী, লর্ড উইলবারফোর্স ও ভাকটুসবেরির জীবপ্রেম, উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের ঐতিহ্য, বেন্থামের "প্রকৃততমের জন্য প্রচুরতম কল্যাণ"-বাদ, মিলের স্বাধীনতা-সুসমাচার, ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিধান এবং জড়বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জয়যাত্রাপ্রসূত আশাবাদ। এর দুটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল অ্যাডাম স্মিথের লাসে ফেয়ার নীতি ও বেন্থামের ইউটিলিটেরিয়ান মতবাদ এবং ভিত্তি হ'ল—লকের সামাজিক চুক্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মুনাফার প্রেরণা। এবম্বিধ দর্শন যে ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেয় তা প্রগতিবিশ্বাসী হতে বাধ্য। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দী হ'তে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস প্রধানতঃ ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের ইতিহাস। তার মধ্যে উদারনীতি অপেক্ষা অধিকতর প্রগতিশীল কোন আন্দোলন দেখা দেয়নি। ধর্ম্মের অনুশাসন, সংঘের শৃঙ্খল, সামন্ততন্ত্রের নৈরাজ্য থেকে তা ব্যক্তির সৃষ্টি সম্ভাবনাকে স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে মানবিক সত্তার অন্তর্নিহিত মর্য্যাদায়। তা অন্ধপ্রথার অত্যাচার ও বাতিল অর্থনীতির অবিচার সাধ্যমত বিদূরিত করেছে, বিদ্যাকে বিদ্যার জন্য অনুসরণ করেছে, সত্যকে শ্রদ্ধা করেছে সত্যের খাতিরে, ইংল্যাণ্ডে এনেছে শিল্পবিপ্লব, অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে সৃষ্টি করেছে জগৎ-জোড়া বাজার, পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ দিয়ে ভেঙেছে ধর্ম্মের রাজনৈতিক প্রভাব। তার অনুপ্রেরণায় ইটালী ও গ্রীস, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া আপন জাতীয় সত্তা স্বাধীনরাষ্ট্রের মধ্যে চরিতার্থ করেছে এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার ও পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাকৃতিক বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু এর উদারনীতির বিরুদ্ধে ত্রিবিধ প্রতিবাদ এসেছিল। হেগেল ও ফিখটের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈরাজ্যবাদী পরিণতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সর্ব্বময় রাষ্ট্রের সাহায্যে। সাঁসিমোঁ সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন সাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সে সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে দাবী করছিলেন রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ। তার সমর্থকদলে দেখি খৃষ্টানসমাজতন্ত্রবিশ্বাসী লামেনে, বিজ্ঞানবাদী কোমৎ, সাহিত্যিক কোলরিজ, কার্লাইল ও সাদেকে। মার্কস ও এঙ্গেলস উদারতন্ত্রের মূলনীতিকেই আক্রমণ করেছিলেন। মার্ক্সের মতে উদারপন্থী লাসে ফেয়ার রাষ্ট্র আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত শাসনযন্ত্রমাত্র, তার একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক শক্তি-প্রসূত আইনপ্রণয়ন ও

প্রয়োগের চরম ক্ষমতাধারী জনসাধারণের ওপর মুনাফার দাবী অক্ষুণ্ণ রাখা। উদার নীতি হ'ল "Simply one more particular of history seeking to masquerade as universal." শিল্পপতির উক্তির সঙ্গে তার ইতিহাস প্রথমাবধি বিজড়িত, শিল্পপতির সংকীর্ণ প্রয়োজন ও স্বার্থ উদারনীতির প্রয়োগকে অত্যাদিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং যতই সে নীতিকে ব্যাপকরূপ দেবার চেষ্টা হোক না কেন মূলতঃ তার উদ্দেশ্য অটুট থাকবে। মুনাফার মেফিস্টোফিলিসের কাছে তার আত্মা চির-বিক্রীত।

১৮৭৮ সালের বিফল বিপ্লব উদারনীতির স্বর্ণযুগ সূচনা করল। অবাধ বাণিজ্য-নীতি ও উপনিবেশ-শোষণের ফলে শিল্পসমৃদ্ধ ইংল্যাণ্ডের এত প্রচুর লাভ হ'তে থাকে যে তার ভগ্নাংশ দিয়ে জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী মেটানো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সহজ হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলনীতি অপরিবর্ত্তিত রেখে প্রাচুর্য্যসমৃদ্ধ উদারতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে। একদিকে শিল্প শ্রমিক-আন্দোলন ও অন্যদিকে গ্রীন, ম্যাথু আর্নল্ড, হোবহাউস প্রমুখ চিন্তানায়কের বিবেকবুদ্ধি পরিতৃপ্ত করার শক্তি তার ছিল। নারী ও শিশুশ্রমের অমানুষিক শোষণ, শ্রমিকাবাসের লজ্জাজনক ব্যবস্থা, লাভের হার ও মজুরীর হারের বিপুল পার্থক্য উদারনীতির বিবেক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ উদ্বুদ্ধ করে। আর্থিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে করনির্দ্ধারণ নীতি, চেম্বারলেন যাকে gospel of ransom বা মুক্তিপণের নীতি বলেছেন, তা স্বীকার করে আত্মপ্রসাদ-পূর্ণ সম্পত্তির মালিক। ১৮৮০-র কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় দাসে ফেবার রাষ্ট্র পরিবর্ত্তিত হয় সক্রিয় সমাজ-সেবক রাষ্ট্রে। তাতে ছটপ-টোরী জমিদার শিল্পপতি—প্রায় সকল শ্রেণীর সমর্থন ছিল।

মার্কস্ অবশ্যম্ভাবী শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করলেও প্রসারশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসংহতি সম্বন্ধে গভীর আস্থা ছিল। তার উপায় নিয়ে বেন্থাম ও ওয়েন, কবডেন ও ডিজরেলী, ম্যাথু আর্নল্ড ও ডারউইনের মতানৈক্য থাকলেও উদ্দেশ্য বিষয়ে মার্কের সময় থেকে কোন সংশয় দেখা দিতে পারেনি। ব্যক্তির প্রবুদ্ধ স্বার্থবোধের (enlightened self-interest) মধ্যে উদারনীতি শ্রেণীসংহতি সাধনের গোপন মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল এবং শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে যথাকালে স্বার্থবোধ প্রবুদ্ধ হবে আশা করে পরিতৃপ্ত ছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বিংশশতাব্দী সুরু হবার আগেই সঙ্কট দেখা দিল, প্রসারণের যুগ শেষ হয়ে আরম্ভ হ'ল সঙ্কোচনের যুগ। যতদিন পর্যন্ত সমস্যা কঠোর রূপ ধারণ করেনি অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপকতার গুণে ধনতন্ত্র নিরাময় লাভ করেছে। তার বিকাশপথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আসতে পারে বা মুনাফার হার কমে গিয়ে মুনাফার প্রেরণা নষ্ট হতে পারে এমন চিন্তা কোন পক্ষের মনে উদিত

হয়নি। উদারতন্ত্রী উপলব্ধি করেনি যে পার্লামেন্ট-নির্ভর গণতন্ত্রের ভিত্তি দুটি —নিরাপত্তাবোধ ও সমাজ-সংগঠনের মূলনীতি সম্বন্ধে সকল পক্ষের মতৈক্য— যাকে বলেছেন Unity on the fundamentals. প্রথমটি নির্ভর করে নির্বাধ মুনাফা আহরণের ওপর, যার এক প্রধান অংশ দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার-প্রাপ্ত জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক দাবী মেটানো সম্ভব। দ্বিতীয়টি নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে সকল পক্ষের আপোষকামী মনোভাবের ওপর। উদারনীতির রাজনৈতিক কাঠামো উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদের প্রসারশীল ধনতন্ত্রের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী যোগযুক্ত যে একের বিচলনে বা সঙ্কোচনে অন্যের অবনতি বা ধ্বংস অনিবার্য। পার্লামেন্ট, দ্বিদলপ্রথা, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, সার্বভৌম স্বাধীনতার আদর্শ—এগুলি হ'ল উদারনীতির বহিরঙ্গ, আর প্রাণ হ'ল মুনাফার ভিত্তিতে রচিত শ্রেণী-বিন্যাস। তৎপ্রচারিত আদর্শ যতই অভ্রভেদী হোক্ না কেন, অর্থনৈতিক ভিত্তি বিচলিত হোলে তারাও বিচলিত হতে বাধ্য।

ফিসারের মতবাদ রচিত হয়েছে বিংশ শতকের প্রারম্ভে, যখন থেকে ধনতন্ত্রের ভাঙন ও উদারতন্ত্রের অবনতি সুরু। আন্তর্জাতিক অরাজকতা, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতা বিক্ষুব্ধ করল ভিক্টোরীয় শান্তি; শ্রেণী-সচেতন বিপ্লবী শ্রমিক-আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীল অর্থনীতি বিপর্যস্ত করল ধনতন্ত্রের নিরাপত্তা; প্রথম মহাযুদ্ধের শোচনীয় অপচয়ে সমাধিলাভ করল মানবতার সকল আদর্শ। শান্তির পর যে সব সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিল, বিধ্বস্ত দেহমন নিয়ে তৎসমাধানে অক্ষম হ'ল উদারনৈতিক গণতন্ত্র। তার স্বতঃসিদ্ধগুলি অর্থ হারালো, স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হ'ল। রুশবিপ্লব, ইটালী ও জার্মাণীর ফাসিবাদ, এশিয়ার গণজাগরণ একে একে বিভিন্ন বিরোধী শক্তির উদ্ভব হ'ল—যার সর্বাত্মক মতবাদ ও সাম্রাজ্য-বিরোধী মনোভাব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-নির্ভর সাম্রাজ্য-পুষ্ট গণতন্ত্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিতে লাগল। যে আপোষ-কামী সংস্কার ও যুক্তিগত মতৈক্যের জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক পরীক্ষা সফল হয়েছিল, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের অভাবে তার অবসান সূচিত হ'ল।

ফিসার বলছেন—"Happiness, liberty, equality, the rights of man, progress, these are phantoms soaked in chaos." (Nazi Ideology)

উদারতন্ত্রের মধ্যে বরাবরই একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ দেখা যায়। উদার-নৈতিক মানস আসলে রোমান্টিক। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ব্যতীত পরিবর্তনের কোন মাধ্যমই তা স্বীকার করেনা, অথচ আশা করে সেই অনুপ্রেরণার মধ্যে সামাজিক কল্যাণের বীজ নিহিত থাকবে। তার ফলে উদারতন্ত্রীর অবচেতনে স্বাধীনতা ও সাম্যের বিরোধ—প্রথমটিতে সে ব্যক্তির চরিতার্থতা দেখেছে, দ্বিতীয়টিতে

যাবীয় কর্তৃত্বের দ্রুত। বিংশ শতাব্দীতে বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা হারিয়ে তার অন্তর্নিহিত বিরোধ আরো প্রকট হ'ল। সে অর্থহীন, লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ল। ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া সভ্যতার এই আত্মবিরোধ ও লক্ষ্যহীনতা ফিসারের মুখে Chance, Contingency—অজ্ঞেয় শক্তির প্রাধান্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যন্ত্রতান্ত্রিক অগ্রগতির যুগে এই আকস্মিকতা লাসেফেয়ারের রূপ ধরে এসেছিল। টয়নবির ভাষায় "In the light of a transitorily gratifying experience, our nineteenth century grandfathers claimed to know that all things work together for good for them that love the Goddess Chance." বিংশ শতাব্দীর রক্ত যাত্রার পারিপার্শ্বিকে আকস্মিকতা হারিয়েছে তার প্রসন্ন মুখ। তার মধ্যে ভাবীর অনিশ্চিতের ছায়া। উদারনীতিবিদের চারদিকে ভেঙে পড়ছে, তার এত সাধের আদর্শ, এত সংগ্রাম ও সাধনা-লব্ধ নীতি ও মূল্যবোধ, তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। এই 'Squandered treasure of humanity, toleration and good sense' দেখে, আশ্চর্য্য নয়, ফিসার অজ্ঞেয় আকস্মিকতার বাণী শোনাবেন, টেনিসনের মত বলবেন—

I stretch lame hands of faith, and grope,
And gather dust and chaff and call
To what I feel is Lord of all
And faintly trust the larger hope.

(২)

ফিসারের রচনাকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—কতকগুলি বিষয়ে তাঁর গবেষণা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত যথা 'মধ্যযুগের সাম্রাজ্য' (১৮৯৮), 'নেপোলিয়ানের রাষ্ট্রনীতি, জার্মেণী' (১৯০৩) ও 'ইউরোপের ইতিহাস' (১৯৩৬)। আর কতকগুলি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকর্তৃক আহুত হয়ে বক্তৃতা দেন—যথা লাওয়েল ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত—'ইউরোপের সাধারণতন্ত্রী ঐতিহ্য' (১৯১১), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত—'বোনাপার্টিবাদ' (১৯০৮), গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটিতে প্রদত্ত—'গণকল্যাণ' (Common weal) (১৯২৪)। প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালার দুটি সমষ্টি—'অতীতের পাতা' (Pages from the Past) এবং 'রাজনীতি ও ইতিহাসের পাঠ' (Studies in History and Politics)। লংম্যান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের একখণ্ড (১৪৮৫-১৫৫৮), এবং হোম-য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'নেপোলিয়ান' (১৯১২)।—এই মোটামুটি তাঁর ইতিহাস সাহিত্যে দান। এতদ্ব্যতীত ব্রাইস, মেইটল্যাণ্ড ও ভিনোগ্রাডফের রচনাবলী তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।

ফিসারের প্রথম ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা "মধ্যযুগের সাম্রাজ্যে" মধ্যে প্রতিভার বিশেষ ছাপ নেই। স্মরণ রাখতে হবে উক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ব্রাইস তাঁর অনবদ্য 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' রচনা করে গেছেন। তুলনায় উত্তরসাধক ফিসারের দুর্বলতা সুপরিস্ফুট। মধ্যযুগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অনেক বেশী গভীর হয় পরবর্তীকালে—ইউরোপের ইতিহাসে The Catholic mind শীর্ষক পরিচ্ছেদটি তার প্রমাণ। নেপোলিয়ান সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর প্রতিভা আপন প্রকাশপথ খুঁজে পেল। প্রায় দ্বিশত পৃষ্ঠার মধ্যে নেপোলিয়ানের যে ক্ষুদ্র চরিত্রচিত্র তিনি অঙ্কন করেছিলেন—তার তুলনা বিরল। নেপোলিয়ানের যুগ সম্বন্ধে কত ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকলে এত স্বল্প পরিধির মধ্যে তাকে মূর্ত করা চলে সে বিষয়ে ইতিহাস-পাঠকদের দ্বিমত নেই। Napoleonic Statesmansbip, Germany শীর্ষক গবেষণায় তাঁর প্রতিপাদ্য নেপোলিয়ান চরিত্রের অন্তর্বিরোধ। একদিকে ফরাসী বিপ্লবের মহান্ আদর্শ ও মানবিক নীতির ভগবান, অন্যদিকে উলঙ্গ পরদেশ-শোষণ; একদিকে প্রগতি ও যুক্তিবাদের প্রতি মৌলিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মর্মগত দুর্বলতা, অর্থহীন অযৌক্তিকতা ও অর্থহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা—অন্যদিকে "an army of spies and custom house officers, of insolent soldiers and corrupt officials, of extortion, repression and despotism."

'বোনাপার্টিবাদে' ফিসার এই অন্তর্বিরোধ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের দুটি দিক ছিল। তা কেবল ফ্রান্সের বাতিল সমাজ ব্যবস্থা—সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, মানবের প্রাকৃতিক অধিকারের বাণী প্রচার করে তার শক্তি নিঃশেষিত হয় নি, তার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমান্তের দাবীও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছিল। ফরাসী গণতন্ত্রের এই সামরিক সত্তার প্রতীক নেপোলিয়ান। ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঐতিহ্য তিনি সৃষ্টি করেননি স্বয়ং উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বিপ্লবীদের কাছে। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে স্বাধীনতার মূল্যের চেয়ে সাম্যের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে বেশী। মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ঐতিহ্য এবং যন্ত্রের অভাব (জিরনডিন ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের কথা কেউ বলেনি), সর্বপ্রকার সংঘ-জীবনের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদের নীতিগত আপত্তি (যার ফলে ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলন গড়তে পারেনি), শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ (মন্টেসকের নীতি অনুসারে), এবং সর্বোপরি গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর সঙ্গে সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধের প্রয়োজন জ্যাকোবিনদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চরমভাবে কেন্দ্রীভূত করে। নেপোলিয়ান সহজেই সে অধিকার লাভ করেন। এর পশ্চাতে ছিল বিপ্লবী ভূমি-নীতির ফলভাগী জোতদার ও বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা Reign

of Terror-এর নৈরাজ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল শক্তিমানের চরণতলায়। তাদের রক্ষা করাই নেপোলিয়ানের বৃহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তি। Civil code-এ তাদের সম্পত্তি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা, পোপের সঙ্গে আপোষের মধ্যে তাদের ধর্মপ্রেরণা তুষ্ট করার প্রয়াস। রাজনৈতিক সাম্যের মোহে এরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী ত্যাগ করেছিল। সুতরাং নেপোলিয়ান বিপ্লবপ্রসূত বাকিবাদকে অগ্রাহ্য করলেন, ধর্মব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থা—সমাজ-সংহতির সমস্ত অস্ত্রগুলি নিঃশেষে প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পথ।

সন্তমুক্ত ফরাসী মধ্যবিত্ত ও কৃষকের নেপোলিয়ান-প্রীতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ফিসার—"So long as Napoleonic regime lasted, bourgeois and peasant felt themselves sheltered from the quadruple menace of socialists, royalists, clericals and jews." সিভিল কোডে শ্রমিক-শোষণের ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিল সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—"In the great struggle between labour and capital the sympathy of Napoleon and Napoleon's lawyers was on the side of capital."

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ওপর পড়েছে চতুর্দশ লুইয়ের ছায়া। "ফরাসীরা স্বাধীনতা বা সাম্য চায় না, তারা চায় গৌরব।" সুতরাং মস্কো থেকে লিসবন পর্যন্ত যুদ্ধের কালানল জ্বালিয়ে নেপোলিয়ান গৌরবের ব্যবস্থা করলেন। গায়টে ও হেগেল নেপোলিয়ানকে নবযুগের অগ্রদূত বলে অভিনন্দিত করেছিলেন অথচ সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ফরাসী স্বেচ্ছাতন্ত্রের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। শৃঙ্খলিত মানবমনের ওপর ক্ষমতার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা, এ মন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রয়োগ নেপোলিয়ানই প্রথম করেন। মার্দা দুঃখ করেছেন এমন সাম্রাজ্য টিকল না। সৌভাগ্যের বিষয় Geyl-এর Napoleon—For and Against পুস্তকে এর বহু বিরোধী মতও ধৃত হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে সৃষ্ট এই সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য ছিল শোষণ, ঐক্যসূত্র—সৈন্য বাহিনী। শুধু পরোক্ষ ফলস্বরূপ তা জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ে সাহায্য করে এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে সে জাতীয়তাবাদ উদারতন্ত্রের পথ নেয়। হার্ডেনবার্গ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাম্রাজ্যের পতনই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্স। নেপোলিয়ান ফরাসী জাতীয়তাবাদের গুরুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এলবা হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর উদারতন্ত্রের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন তিনি, সেন্ট হেলেনায় লিখিত স্মৃতিকথায় নিজেকে বিপ্লবের সন্তান বলে প্রমাণ করবার অপপ্রয়াস করেছিলেন। শহীদ নেপোলিয়ানের এই অদম্য রূপ লামার্টাইন, হুগো, ভিগনি—কবি, ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিকের ফলকে নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে পরাজিত ফ্রান্সের আহত আত্মমর্যাদা স্পর্শ করল, বুর্জোয়াশাসন-পীড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভুলে গেল ক্রমেয়ারের

কাহিনী। অবশেষে ১৮৪৮ এর জুনবিদ্রোহের স্মৃতি সমাজতন্ত্রভীত বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীকে আরেক নেপোলিয়ানের পক্ষতলে আশ্রয় নিতে প্রবুদ্ধ করল। এইখানে বোনাপার্টিবাদের গোপন রহস্য। যখনই কোন জাতীয় সংকট উপস্থিত হয়েছে বা মধ্যবিত্ত ও কৃষকের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই তার মধ্যে সমাধান খোঁজা হয়েছে।

তৃতীয় নেপোলিয়ান ক্রাশে বেলওয়ে অর্থাৎ ব্যাপক ভিত্তিতে ধনতন্ত্র প্রবর্তন করেন, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করেন। তথাপি কোন রাজনৈতিক দলকে তিনি তুষ্ট করতে পারেন নি। গিজো ঠিকই ধরেছিলেন যে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের ভয়ে প্রথম প্রথম সমস্ত দলগুলি নেপোলিয়ানকে সাহায্য করবে—কিন্তু পরে বিরুদ্ধে যাবে। ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতি শেষে নেপোলিয়ানের পতন ঘটাল। কিন্তু শুধু গ্যামবেটা বা থিয়ার্স বা বিসমার্ক তার জন্য দায়ী নয়। ফিসার দেখিয়েছেন, শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবীও দায়ী। মার্ক্স ও লাসালের পরিকল্পনায় এদের ভবিষ্যৎ সূচিত হয়েছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মত তার পশ্চাতে কেবল বিশুদ্ধমতবাদই ছিল না, ছিল সুকঠোর অর্থনৈতিক সত্য। বিভ্রান্ত তৃতীয় নেপোলিয়ান যুদ্ধের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। অলিভিয়েরের স্মৃতিকথায় রাজ-পক্ষের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু লোদি ও মাজেন্তার স্বপ্ন সেডান ও মেজের শোচনীয় পরাজয়ে বিলীন হয়ে গেল। না হয়ে উপায় ছিল না। ৮ই মের গণভোটে নেপোলিয়ান লিবারেল বুর্জোয়াদের আস্থা হারালেন। উদারতন্ত্রী সাম্রাজ্যের আবাস বড় রেখাতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

The Republican Tradition in Europe-এ ফিসার রেনেসাঁ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাধারণতন্ত্রী ঐতিহ্যের ইতিহাস লিখেছেন। সাধারণতন্ত্রী মতবাদের মূলনীতি নিয়ে তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নি, তার ঐতিহাসিক চিত্রই অঙ্কন করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালীতে সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় কেন হ'ল এবং কি কি অবস্থার অভাবে তা বিফল হ'ল তার বিশদ বিশ্লেষণ আমরা পাইনা। গুয়েলফ্ ও গিবেলিনের সংঘর্ষ এবং সামন্ত-তন্ত্রের বিরোধিতা ছাড়াও পতনের অন্য কারণ ছিল। বাণিজ্য ও শিল্পসংঘগুলির আভ্যন্তরীন বিরোধ দিন দিন ঘনিয়ে উঠছিল। এই বাণিজ্য-নির্ভর নাগরিক অলিগার্কির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের একচেটিয়া সুবিধা সংরক্ষণ। প্লুটার্ক ও লিভিয়াসের ভাষায় বক্তৃতা দিলেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিনা কারণে মেকিয়াভেলি ও গিকিয়ার্ডিনি বৈরতন্ত্র সমর্থন করেন নি। কেবল ভেনিসের শাসনব্যবস্থায় উপর্যুক্ত বিরোধ মীমাংসার সুযোগ ছিল বলে ভেনিসীয় সাধারণতন্ত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়েছে।

যে সকল দেশের রাজতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল—যেমন ইংল্যাণ্ড—সে সকল দেশে সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হয়নি। ইল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি ছিল বার্গার-অলিগার্কি, তার পশ্চাতে স্পেন-বিরোধী মনোভাব ছাড়া অন্য কোন সংহতিমূলক শক্তি ছিল না। আমেরিকায় অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্যনীয়। এ ক্ষেত্রে অন্তহীন বিস্তারের সুযোগ থাকায় অলিগার্কির মধ্যে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হয়নি। অথচ অনুকূল সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাবে ইল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্র টেঁকেনি। ইউরোপের অন্যত্র সামন্ততন্ত্রের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল দুর্বল, তাই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য বদ্ধমূল হয়েছে, বন্যা ও বুনের বাস্তববাদ মিল্টন ও হ্যারিংটনের ইউটোপিয়ার ওপর জয়লাভ করেছে। এমনকি ১৭৯১ সালের ফরাসী কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে সাধারণতন্ত্রের কথা শোনা যায়নি। ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট থেকে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অভিযান সুরু হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হ'ল। অন্য পথ না পেয়ে কনভেন্‌শান রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করল। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে অতীতের বা সমকালীন কোন সাধারণতন্ত্রের মিল ছিল না। তা প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় শক্তির উপর জোর দেয়, তার মধ্যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিলনা এবং তা অলিগার্কি নয়—পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সিসেরো, প্লুটার্ক ও রুশোর মতবাদ ছিল তার দর্শন, প্রথম স্বতঃসিদ্ধ ছিল Perfectability of man। মনুষ্য প্রকৃতিতে অখণ্ড বিশ্বাস মধ্যযুগীয় ধর্মনীতির মতই অন্ধ ছিলো। তার তাগিদে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করে প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে সারা ইউরোপে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল ফরাসী সাধারণতন্ত্রী। এই উদার মানবিক আদর্শের সঙ্গে হীনতর জাতীয় স্বার্থ বিজড়িত ছিল। তালেরাঁ বা গার্ড ফ্রান্সের সীমান্তের কথা ভোলেন নি।

ইউরোপের বিভিন্নদেশে সাধারণতন্ত্রের বাণী বহন করে নিয়ে গেল ফরাসী সৈন্যবাহিনী। ফিসার তার ধারাগুলি যথাযথ নির্দেশ করেছেন। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ এর মধ্যে সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্র যুক্ত হ'ল। সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে দুটি দল দেখা দিল—একটি উত্তরাধিকার সূত্রে সাধারণতন্ত্রী, যাদের মনে সাধারণতন্ত্র ও জ্যাকোবিন যুগের সামরিক গৌরব অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত;—অন্যটি সমাজতন্ত্রী, যাদের দৃষ্টি অতীতে নয় ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল র‍্যাডিকালদের বিপ্লব, তার নেতা ছিলেন লামার্টাইন; জুনের বিপ্লব হ'ল শ্রমিক বিপ্লব, যার নেতা ছিল না। প্রথমটির মধ্যে ভাণ ছিল প্রচুর অথচ ১৭৮৯ থেকে ব্যাপকতর কোন বিপ্লব-পরিকল্পনা ছিল না। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক বিপ্লব হোলেও তার পশ্চাতে কোন সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক মতবাদ বা শ্রেণীসচেতন শ্রমিক সংহতি ছিল না। ফলে উভয়ই উদারতন্ত্রী বুর্জোয়াদের হাতে বিনষ্ট হয়।

ফিসার ফুনবিপ্লব ও প্যারিস কম্যুনের সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ। তাঁর দুঃখ ফ্রান্সের উদারতন্ত্র সুযোগের অভাবে ও নেপোলিয়ানের মূর্খতায় সফল হয়নি। থিয়ার্স বা গ্যামবেটা বা ফাভ্রে কে তিনি প্রকৃত উদারতন্ত্রী বলে স্বীকার করেন নি, থিয়ার্স সম্বন্ধে বলেছেন—"He would shoot down red socialists with as little concern as a gamekeeper knocks over a jay or a magpie." এই বাক্যটির মধ্যেই উদারতন্ত্রের ব্যর্থতার আসল কারণ নিহিত, অথচ ফিসার তা ধরতে পারেন নি। ফ্রান্সের উদারতন্ত্র বা ফ্রাঙ্কফার্টের জার্মান উদারতন্ত্র ব্যর্থ হবার সব চেয়ে বড় কারণ—তাদের দুর্বলতা বা নেতার অভাব নয়। সফল হতে তারা চায়নি। মার্ক্স ও এঙ্গেলস ইতিহাসের যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলেন তাতে শ্রমিকবিপ্লবের আবশ্যিক ভূমিকারূপে বুর্জোয়া-বিপ্লবের নাম করা হয়েছে। ভবিষ্যতে শ্রমিক-বিপ্লবের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ শুধু আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করতে কোন বুর্জোয়া বিপ্লব করতে প্রস্তুত ছিল না। এই মানসিক দ্বিধা ও সংশয় ফ্রাঙ্কফার্টের সভ্যদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। লেনিন তা বুঝেছিলেন বলে প্রলিটারিয়েট বিপ্লবের condition precedent রূপে বুর্জোয়া বিপ্লবকে মনে করেন নি।

তাঁর কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মূল্যবান; যথা—'আধুনিক জার্মাণ ঐতিহাসিক,' 'ফুদ্ররাষ্ট্রের মূল্য,' 'ছইগ ঐতিহাসিক,' 'ফরাসী জাতীয়তাবাদ' 'প্রাসিয়ার গণজাগরণ,' 'নাৎসিদের আদর্শ'। জার্মাণ ঐতিহাসিকদের পাণ্ডিত্যের উচ্চপ্রশংসা করলেও তিনি মেনিয়েছেন তাঁদের ইতিহাসব্যাখ্যা। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদকে পরিপুষ্ট ও সমর্থন করেছে। ট্রিট্‌স্কে এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা দোষী। যেমন অমঙ্গলজনক এই প্রাসীয় সামরিক মনোভাব, তেমনি অমঙ্গলজনক হেগেলদের উগ্র ফরাসী জাতীয়তাবাদ। নাৎসিবাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা অতি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ফিসার এবং তাকে সভ্যতার ক্রুরতম শত্রু বলতে দ্বিধা করেন নি। 'ছইগ ঐতিহাসিক' প্রবন্ধটিতে মেকলে ও অটো ট্রেভেলিয়ানের মতামত পরীক্ষা করা হয়েছে। মেকলে শ্রেণীসংহতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে সেই শাসন শ্রেষ্ঠ যা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে এবং প্রবুদ্ধ অভিজাত ও বিচক্ষণ শ্রমিক দ্বারা সমর্থিত। ফিসার এমনি এক শ্রেণীসংহতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, যদিও তাঁর ভিত্তি ব্যাপকতর হয়ে সর্বসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। The Common Weal নামক বক্তৃতায় তিনি শ্রেণীসংহতির প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আবশ্যিক প্রতিপাদন করেছেন। ধনের অসম বণ্টন নাকি সভ্যতার শত্রু নয়, শত্রু—অশিক্ষা ও কুসংস্কার, অর্থাৎ ইউরোপের অসুখ নীতিগত, অর্থনীতিগত নয়। অথচ কতকগুলি অর্থনৈতিক যুক্তির ছদ্মবেশ পরে অতীতের বাধবিসম্বাদ মানব-জাতির ক্ষতি করছে। প্রজননবিজ্ঞানের দিক থেকে দারিদ্র্যের নাকি মূল্য রয়েছে। The Common

Weal-এর উদ্ভব সম্ভবতঃ ঘটিত রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হয়। যে বিপ্লব শ্রেণীবিশেষের Privilege বা স্বার্থের বিরুদ্ধে—যথা ফরাসী বিপ্লব—ফিসার তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু যে বিপ্লব property বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে, যথা রুশ বিপ্লব, ফিসার তাকে কখনই অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর অবচেতনে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল গ্রীক সভ্যতার মহিমার কথা তিনি কোনদিন ভোলেন নি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "ইউরোপের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনার দিক থেকে ফিসারের দুঃসাহস বিস্ময়কর। বিরাট য়ুরোপীয় ইতিহাসের অন্তর্হীন বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অবহিত থেকে তার সমগ্রতার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচায়ক। কত গভীর জ্ঞান থাকলে বিষয়বস্তু এমন সুবিন্যস্ত, রচনাশৈলী এত সহজসিদ্ধ ও চিত্রধর্মী হয়, কত ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলে দেশকালের এমন স্বচ্ছন্দ তুলনা চলে! আবার পাণ্ডিত্যের চেয়েও লক্ষণীয় তাঁর শিল্পীজনোচিত কল্পনাশক্তি, স্রষ্টাসুলভ অন্তর্দৃষ্টি। প্রতি চরিত্র প্রাণবন্ত, প্রতি ছত্রে ঐতিহাসিকের উদার, বিদগ্ধ রুচিশীল ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। মানুষের জীবনে যেখানেই যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রমাণ তিনি পেয়েছেন সেখানেই তার সন্ধান দিয়েছেন, অথচ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির দুর্ভেদ্য ছদ্মজাল তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। একদেশদর্শিতার পরিচয় কচিৎ পাওয়া যায় বটে—তবে য়ুরোপীয় সমাজের সর্ববিধ প্রকাশধারার সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট পরিচয় দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। মন্তব্যের মধ্যে নীতিবাগীশদের উদ্ভাসিকতা নেই, তবে সত্যভাষণের সঙ্কোচও নেই। অথচ স্বল্পই প্রকাশ পেয়েছে উগ্র প্রতিক্রিয়ার পরিচয়। একটি ক্লাসিকাল সংযম ও স্বচ্ছ শ্রেয়োবুদ্ধি তার বিচার-শক্তি ও মূল্যবোধকে পরিমার্জিত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—দুইটি অধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে—The Catholic Mind ও International Currents.

ভূমিকায় অস্বীকার করলেও ফিসারের প্রকৃতি বীর বিবর্তনে বিশ্বাসী। য়ুরোপীয় ইতিহাসের বিষয়-বিন্যাসে তার প্রমাণ মেলে। বেকনের মত তাঁরও বক্তব্য ছিল—Truth is the daughter, not of authority, but of time. এবং সেই বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ তাঁর পুস্তকের তিনটি ভাগ—(১) প্রাচীন ও মধ্যযুগ, (২) রেনেসাঁ ধর্মবিপ্লব ও যুক্তিবাদ এবং (৩) উদারতন্ত্রের পরীক্ষা। কালানুপাতে তৃতীয় ভাগটি বৃহত্তম তথা ফিসারের উদারতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। ইতিহাস সম্বন্ধে দর্শন না থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ফিসারের, যার ব্যতিরেকে ইতিহাস রচনা অসম্ভব। তিনি কি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেননি যে মাঝে মাঝে সভ্যতার সংকট উপস্থিত হোলেও ইউরোপের অন্তর্নিহিত শক্তি তার ওপর অবশেষে জয়

লাভ করেছে? সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক পরিবর্ত্তন করে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই তার স্বভাবধর্ম? প্রাচীন গ্রীসের স্বাধীনতার ঐতিহ্য, প্রাচীন রোমের সমাজশৃঙ্খলার আদর্শ, খৃষ্টানধর্ম্মের নৈতিক মূল্যবোধ, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তিবাদ, ফরাসী-বিপ্লবের মৌল মানবিক অধিকারের বাণী—সবগুলিই কি এক প্রগতিপ্রবাহের মধ্যে ধারা মেলায়নি? রুশ-বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্যন্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং রুশবিপ্লবের পর থেকে প্রগতি সম্বন্ধে আস্থা হারালেও পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসের গতি ফিশারের রচনায় একটা মূলগত ছন্দ লাভ করেছে। নিছক আঙ্গিকের দিক থেকে ফিশারের বেশী ত্রুটি নেই। বর্ণনায় চিত্রধর্ম্মে পাঠক অভিভূত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের অভ্যুত্থান, মধ্যযুগের শিক্ষা ও ধর্ম্ম আন্দোলন, পিটার দি গ্রেট সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলি উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি বহুক্ষেত্রে তুলনাহীন। একটি দুটি রেখায় একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি বা যুগকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলেকজাণ্ডার, সেণ্ট পল, জাষ্টিনিয়ান, হিল্ডেব্র্যাণ্ড, দান্তে, জন হাস, নিকোলাস ক্রেবস্—জীবনের বিভিন্ন বিভাগ থেকে চয়ন করা চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মার্ক ব্লকের মত আপাতবিষম দুই যুগকে তুলনা করা তাঁর রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই পদ্ধতির বিপদ অনেক, যেমন পঞ্চম শতাব্দীর গলের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর আমেরিকার তুলনা করা (১১৬ পৃঃ) ন্যায়সঙ্গত হয়নি। এপিগ্রাম সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ফিশার—তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—**England grew, Prussia was manufactured.**

১২২২ পৃষ্ঠার মধ্যে নব্যপ্রস্তরযুগ থেকে হিটলারের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাসকে রূপায়িত করার চেষ্টায় ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অনেক সময়ে ফিশারের মতামত বিতর্কের বিষয়। ভূমিকার প্রথম ছত্রটির কথা ধরা যাক। ইউরোপীয় ইতিহাসের বিচিত্র বিকাশকে গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে যোগ করে বহুবিধ সমস্যা এড়ানো যায় বটে, কিন্তু উক্তিটি কি ইউরোপের সকল দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবং কি পরিমাণে প্রযোজ্য? আর নিকোলাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি কি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের কি কোন ফুফল দেখা দেয়নি? মহাযুদ্ধের জন্য ধনিকশ্রেণীকে দায়ী করা একান্তই 'baseless fable'? যুদ্ধের সম্ভাবনা কি জাহাজঘ, স্নাইডার ও ক্রাপের মত ধনিককেও বিচলিত করেছিল? "Patriotism was as little to Lenin's heart as parliaments."—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জের টেনে নিয়ে যাওয়াই কি লেনিনের দেশপ্রেমের পরিচয় দিত?

ফিশারের দৃষ্টিভঙ্গী বহুবাদী। ঐতিহাসিক ঘটনার বা আন্দোলনের পশ্চাতে তিনি একাধিক শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। তার সঙ্গে এই নিয়ে কলহ করা

চলে না, কারণ আজও ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার মত নিরাসক্তি আমাদের আসেনি। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সম্মুখে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ বাধা অনেক। কিন্তু মার্ক্সের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইতিহাসের ধারার ওপর যে আলোকপাত করেছে তার মূল্য অনস্বীকার্য্য। প্রয়োগের মধ্যে তা বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছে। তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার ফলে রেনেসাঁ, ধর্মবিপ্লব বা সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের গৃহবিবাদ পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়নি ফিসারের পুস্তকে। টনি ক্রিষ্টোফার ছিল নন, অথচ তার সাহায্য নিতে ছাড়েননি।

কিন্তু ফিসার যে ধনতান্ত্রিক সমাজের গলদ সম্বন্ধে নির্বিকার ছিলেন, তাও নয়। শিল্প-নির্ভর গণতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে Strands of History ও International Currents শীর্ষক অধ্যায়ে। শ্রমিক শ্রেণীর অপূর্ণ অভিযোগই যে সামাজিক অশান্তির কারণ তিনি জানেন, তবে তাঁর সমাধান হ'ল শান্তির পথে, সংস্কারের পথে তাকে দূর করতে হবে—বিপ্লব বা হিংসার পথে নয়। কারণ দ্বিতীয় পন্থার ফল অরাজকতা আর অরাজকতা মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের পরিপন্থী। অরাজকতা যদি না আসে—তবে অবশ্যম্ভাবী স্বৈরতন্ত্র, তা সাম্যবাদ বা ফাসিবাদ যারই রূপ ধরে আসুক না কেন। উভয়ের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ গৌণ, সুতরাং ফিসারের পরিত্যাজ্য। তিনি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে, কিন্তু উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রের মারফৎ। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সক্রিয় সমাজ-সেবক রাষ্ট্রের বেশী তিনি অগ্রসর হবেন না।

New Dictatorships and Old Democracies শীর্ষক অধ্যায়টি নানা পরিরোধী প্রশ্নে উদ্বেল। অনুভপ্ত উদারতন্ত্রীর বিহ্বল আত্মজিজ্ঞাসার অপূর্ব্ব নিদর্শন এটি। ধনতন্ত্রের কুশ্রীরূপ তিনি দেখেছেন—প্রতিযোগিতার মধ্যে অপচয়, যৌথ কোম্পানীগুলির মর্ম-হীনতা, আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগের ওপর ধনিক শ্রেণীর অন্যায় প্রভাব, মানুষে মানুষে বিপুল অর্থনৈতিক বিভেদ, উত্তর-সামরিক যুগে অমিত প্রাচুর্য্যের মধ্যে অসীম দারিদ্র্য (পৃঃ ১১৮৬)। এই Waste land এর দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় বৃদ্ধ প্রশ্ন করছেন—"What was the world coming to?" বহুদিনের পরিচিত পৃথিবী তার সদাচার শালীনতা রুচি সহিষ্ণুতা শ্রেয়োবুদ্ধি নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক 'rules of the game' কেউ ত' পালন করেনা। সহসা তিনি লেনিনকে প্রশংসা করে বলেন—"humanitarian on so large and comprehensive a scale", এমন কি ধ্বংসের প্রতি লেনিনের ঔদাসীন্যও মেনে নেন, যদি তাতে রাশিয়ার সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তার মনে সন্দেহ হয়—রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কি হবে? রুশ বিপ্লব রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও অর্থনৈতিক

সাম্যের গুরুত্ব দিয়েছিল, এমন কি দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটি ত্যাগ করতেও পশ্চাৎপদ ছিল না। হিসার তা যুক্তি বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা কোন দিক থেকেই ভাল বলে মনে করেন নি। আলোচনা ও আলোষের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু বিরোধী দলের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে—হিংসা ও বলপ্রয়োগের পন্থা বাদ দিয়ে এই বিরাট গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়নি বলে তাঁর ক্ষোভ। কিন্তু হিসার ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতাকে সকল ক্ষেত্রে শেষতম সীমা পর্য্যন্ত সফল করতে গেলে সমাজের মূলনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এবং ইংল্যাণ্ডের মত দেশের বাইরে সে প্রশ্নের বিনা বিপ্লবে উত্তর মেলে কিনা সন্দেহ। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি ও সমাজসেবক রাষ্ট্রের ওপারে উদারনীতির দৃষ্টি চলে না। একশত বৎসরের সাধনা-লব্ধ বাস্তব কল্যাণের ঐতিহ্যকে কোন এক সম্ভব-পর স্বর্গরাজ্যের জন্য বিপদগ্রস্ত করতে তাঁর বিবেকে বাধে। ফাসিবাদ ও সাম্যবাদের উন্মাদনার মধ্যে তিনি মধ্যযুগীয় ধর্ম্মান্ধতা লক্ষ্য করেন, তাঁর ভয় হয়—মননের ও কর্ম্মের স্বাধীনতা আবার কোন নূতন পোপের কাছে বাঁধা রাখবে ইউরোপের জনসাধারণ! স্বাধীনতার চেয়ে রুটিতে অধিকতর বিশ্বাসী বিপ্লবী দর্শন সুরুচি, শ্রেয়োবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিবেকের মর্য্যাদা দেয় না—টম পেইন বার্ক সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করে—"you pity the plumage but forget the dyiug bird." বর্ত্তমান যুগের উদারনীতিবাদের এই হোলো ট্রাজেডি এবং সে ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'লেন অধ্যাপক হিসার।

সুবা বাংলার পর্তুগীজ বাসিন্দা

শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী

(২)

পলটন ও হারমাদ

সুবা বাংলার পর্তুগীজদের কথা বলতে গিয়ে পুরাণো আমলের দেশী-বিদেশী সব লেখকই বিশেষ করে বোম্বেটে আর চোর-ডাকাতদের কথাই লিখেছেন। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়। মনে হয়, সে যুগে বাংলা দেশে ফিরিঙ্গী বা পর্তুগীজদের ভিতর হারমাদ আর গুণ্ডা বদমাসের সংখ্যাই বেশী ছিল। পূর্ববঙ্গ আর গঙ্গার মোহনার আনাচে-কানাচে সব জায়গায় ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা যে অকথ্য অত্যাচার করত, তার পাশে দু-দশ জন পর্তুগীজ পাদ্রীর ক্রিয়াকলাপ, এমন কি হুগলীর ব্যবসা-বাণিজ্যও নেহাৎ-ই নিষ্প্রভ মনে হয়। আর ফিরিঙ্গী পল্টনের জীবনযাত্রার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সাধারণ চোর-ডাকাতের জীবনের প্রায় কোনওই তফাৎ নেই।

সে যুগের ভারতীয় ও পর্তুগীজ সমাজে 'পল্টন' নামটার বিশেষ কদর ছিল। Linschoten লিখেছেন—ফিরিঙ্গীদের ভিতর অবিবাহিত যুবকমাত্রেই পলটন। অবশ্যি পলটন বলেই যে তারা কোনও কাপ্তেনের অধীনে থাকত বা সৈন্যদলে নাম লেখাত এমন নয়। তবে সম্ভবতঃ তারা সবাই নিজেদের Fidalgo (কথাটার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'Knight' ধরে নেওয়া চলে) বলে জাহির করত। এদেশে ফিরিঙ্গী কাপ্তেনদের একমাত্র সহায়-সম্বল ছিল পলটনরা। ফলে 'যেন তেন প্রকারেণ' তারা পল্টনদের খুশী করে দলে ভিড়াতে চেষ্টা করত। খানা-পিনা দেওয়া-থোওয়া কিছুরই ত্রুটি হত না। পল্টনদের ভোজ দিলে কাপ্তেনকে তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে হত। শুধু তাই নয়, নিমন্ত্রিতদের যথেষ্ট সমীহ করে না চললে, ভবিষ্যতে তাদের কাছে আমল পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকত না। আরাকানে ফিরিঙ্গী নৌবহরের মাঝি-মাল্লারা কাপ্তেনের জমিতেই বসবাস করিত। সেখানে কি কাপ্তেন কি পল্টন ফিরিঙ্গী মাত্রেরই খুব খাতির ছিল। মগের মুলুকে ফিরিঙ্গীদের বৌকিরা রাণীর অন্দরমহলেও ইচ্ছামত যেতে আসতে পারত। মগ্ রাজা পর্তুগীজদের জমিজমা দিতেন। তার বদলে তাদের কিছু সৈন্য আর 'গেলিয়া' নৌকা যুদ্ধের জন্য তৈরী রাখতে হত।

পলটনদের যতই খাতির থাক, তাদের সঙ্গে ভদ্র গৃহস্থের পার্থক্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের পর্তুগীজ সমাজ যথেষ্ট সজাগ ছিল। এদেশে বিবাহিত পর্তুগীজ ভদ্রলোকেরা এক বিশেষ ধরণের জামা পরতেন। অবিবাহিত যুবকদের তা

গায় দেওয়া নিষেধ ছিল। তবে বাংলা দেশের আধা-বুনো ফিরিঙ্গী সমাজে এসব দস্তুর কতটা মেনে চলা হত তা' বলা কঠিন।

পল্‌টনরা খুব অবয়-ঢং জামাকাপড় পরে চলাফেরা করত। রাস্তাঘাটে চাকররা তাদের মাথায় ছাতি ধরে চলত। এক একটা বাড়ীতে দু'টি বা একটি চাকর নিয়ে দশ বার জন পলটন থাকত। মাথা পিছু একখানা খাট আর একটা টেবিল, আর তা ছাড়া দুচারটে টুল,—সাধারণতঃ এই ছিল তাদের মোট আসবাব-পত্র। পান্তাভাত, নোনামাছ আর এর উপর বড় জোর আর দু-একটা সস্তা কিছু খাবার খেয়ে তারা ফুর্তিবৃত্তি করত। পোষাক-আশাকে চটকদারীর বিশেষ ভক্ত হলেও পল্‌টনদের এক একটি আস্তানায় দু-এক প্রস্থর বেশী রেশমী পোষাক থাকত না। ফলে দিনের বেলায় কেউ একজন বাইরে বের হলে, দলের বাকী সবাই ঘরে বসে থাকত। সুতীর কামিজ আর পায়জামা পরে বাড়ীর বারান্দায় বা রোয়াকে বসে দিনভর আড্ডা দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ। খোসগল্পের সঙ্গে গান-বাজনাও চলত। অনেক সময় আড্ডা জমাবার জন্য তারা রাস্তার লোকদেরও খুব খাতির-যত্ন করে ডেকে এনে বসাত। কিন্তু রাত হলেই তাদের আর এক মূর্তি। তখন তারা দল বেঁধে গুণ্ডামি আর বাহাদুরি করে বেড়াত। কারণ এমনিতে তাদের রোজগার ছিল সামান্যই। তাদের অনেকেই পর্তুগীজ, জেসুইট আর দেশী খৃষ্টান অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে গোপন প্রণয়ের বেসাতি করে ফন্দির জোগাড় করত।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের পর্তুগীজ পলটনরা ঠিক আদর্শ চরিত্রের লোক ছিল না। সে যুগে এদেশের পর্তুগীজ সমাজে ঘরছাড়া আইবুড়ো মেয়ে আর বিধবাদের বলা হত Solteira। পলটনরা অনেকেই খোলাখুলি Solteira-দের সঙ্গে বসবাস করত। আর এদের নিয়ে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং duel প্রায়ই হত। কিন্তু এক ব্যাপারে পর্তুগীজদের প্রশংসা করতে হয়। Solteira-দের সন্তানরা সমাজে বৈধ বলেই গণ্য হত। মা-বাপের সম্পত্তিতে তাদের অধিকার সম্পর্কে কোনও আপত্তি কখনও উঠত না।

ল্যাটিন রক্তের উত্তাপ যতই হোক না কেন, এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অনেকেই শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠত। তখন তারা শান্তির সন্ধান করত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভদ্র গার্হস্থ্য জীবনের আওতায়। সন্দীপের কুখ্যাত ফিরিঙ্গী রাজা Gonsalves স্বয়ং এক সময় বোম্বেটেগিরি ছেড়ে ব্যবসায় চেষ্টা দেখেছিলেন। পলটনদের প্রায় কারও হাতেই নগদ টাকা কিছু থাকত না। তাই প্রথমটায় তাদের চেনাশুনা ব্যবসায়ীদের মালপত্র কিনি করে কিছু মজুরী নিয়েই খুশী থাকতে হত। পরে দু'পয়সা জমলে তারা নিজেরাই ব্যবসাপত্র খুলে বিয়ে থা' করে পুরোদস্তুর সংসারী সেজে বসত।

পর্তুগীজ পলটন-হারমাদদের অনেকেই থাকত ভদ্র সমাজ এবং শহর বন্দর থেকে অনেক দূরে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে ছোটবড় নানান্ ঘাঁটিতে, গঙ্গার মোহনার জনমানবশূন্য দ্বীপগুলিতে এবং চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা, সন্দীপ, বাকলা প্রভৃতি আরও অনেক জায়গায় ফিরিঙ্গী বোম্বেটের আড্ডা ছিল। এ ছাড়া দেশী রাজাদের কৌজে চাকরী নিয়েও পর্তুগীজরা ছোট ছোট দল বেঁধে হিজলি, শ্রীপুর, কাত্রাবহু, ফুলুয়া প্রভৃতি জায়গায় বসবাস করত। এই শ্রেণীর পর্তুগীজদের স্বদেশী সভ্য সমাজের সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকত না আর স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও কোনও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠত না। ফলে তাদের স্বভাবসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা সামলে রাখার কোনও প্রয়োজন হত না। বিদেশী ভ্রমণকারীরা এদের আর অন্ত-আনোয়ারের জীবনযাত্রার মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু তা বলে এদের জীবনের পথ ঠিক কুসুমাকীর্ণ ছিল মনে করলে ভুল হবে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের সঙ্গে মগদের অনেকদিন লড়াই করতে হয়েছিল। লড়াই থামলেও বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকত। তবে ফিরিঙ্গী আর মগদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমনিতে ভালই ছিল এবং এদের যৌথ চেষ্টায়ই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় শ্মশান হয়ে যায়।

ক্যাথলিক পাদ্রী সাহেবেরা মাঝে মাঝে এই সুদূর অঞ্চলে গিয়ে ধর্মভ্রষ্ট স্বদেশবাসীদের সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেন। তাঁদেরই চেষ্টায় কখনও কখনও বাংলাদেশের অন্ত পাড়াগাঁয়ে ফিরিঙ্গী খৃষ্টানদের জন্য গীর্জা তৈরী হত। খৃষ্টান ধর্মজীবনের কেন্দ্রগুলি থেকে অনেক দূরে বসবাস করলেও, পর্তুগীজ পলটন-হারমাদরা ক্যাথলিক চার্চের নাগালের একেবারে বাইরে ছিল না। কোনও ফিরিঙ্গী ঘাঁটির সুখ্যাতি বেশীদূর ছড়ালে দলগুদ্ধ সবাইকে জাতিচ্যুত করা হত। আর বাংলার ফিরিঙ্গীরা যতই দুর্ধর্ষ হোক না কেন, জাতিচ্যুত হওয়াটাকে তারা 'মহতী প্রণষ্টি' বলেই মনে করত। কারণ তখনকার দিনে সব ক্যাথলিকদের মত এদেরও ধারণা ছিল যে ইহকালে তারা যা-ই করুক না কেন মরণকালে একবার যীশুর নাম করে পাদ্রী বাবার কাছে 'confession' করতে পারলেই 'মুক্তিরেষ ন সংশয়ঃ'। ফলে যারা জাতিচ্যুত হত, তাদের একমাত্র চেষ্টা থাকত কোনও মতে মিশনারীদের ধরে পড়ে আবার জাতে ওঠা।

পলটন-হারমাদদের জীবনের অনেকটা সময়ই কাটত নৌকায় নৌকায়। সাধারণতঃ তারা যে নৌকা ব্যবহার করত তার নাম 'galliot'। এর প্রত্যেকটায় এক এক ধারে পনের কুড়িটি করে বৈঠা থাকত। নৌকা বাইত সাধারণতঃ দেশী লস্করয়াই এবং অনেক সময় তাদের পরিবারও তাদের সঙ্গে থাকত। পলটন এবং মাঝি-মাল্লা ছাড়া ফিরিঙ্গীদের নৌকায় আর থাকত কিছু নফর গোলাম। Pyrard de Laval বলেছেন—প্রতি নৌকায় দু-একটি পাদ্রীকেও নেওয়া

হত। এ বর্ণনা সম্ভবতঃ বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। বলা বাহুল্য, কাপ্তেন আর পলটনদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মাঝিমাল্লাদের থেকে আলাদা ছিল। এজন্যে প্রতি নৌকায় দু'টি করে রান্নাঘর থাকত।

পর্তুগীজদের পদাতিক আর নৌকাবাহী সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র প্রায় একই রকম ছিল। সেকেলে বন্দুক, বল্লম, ছোট ছোট চীনে ঢাল আর তীর-ধনুক নিয়ে তারা লড়াই করত। তাদের পরনে থাকত চামড়ার গলাবন্ধ, আঁটসাট জামা, লোহার টুপি বা শিরস্ত্রাণ আর খুব খাটো আর টাইট 'ব্রিচেস্'। নৌকায় কেউ জুতা-মোজা ব্যবহার করত না। আবার এ সব পলটনরাই ডাঙ্গায় থাকতে যে ধরণের 'ব্রিচেস্' পরত, তা' তৈরী করতে কাপড় লাগত দশ-বার গজ। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাতে নৌকায় তালপাতার তাঁবু খাটান হত। পলটনরা ঘুমাত মাদুর, তোষক বা গালচে বিছিয়ে। ভোর হলে আবার এসব গুটিয়ে রাখা হত। নৌকায় ভিতর নড়াচড়ার বিশেষ জায়গা থাকত না। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের নৌকায় বেজায় ভীড় হত। ফলে উল্টো হাওয়া বইলেই কিছু মালপত্র জলে ফেলে দিতে হত। ফিরিঙ্গী নৌকায় কাপ্তেন, পলটন, মাঝিমাল্লা ছাড়া আরেক শ্রেণীর অনেক লোক প্রায়ই থাকত; অবশ্যি তাদের 'লোক' না বলে 'জীব' বলাই ভাল। কারণ তাদের থাকতে হত পাটাতনের নীচে, খাদ্য দেওয়া হত শুকনো চাল আর জল এবং হাতের চেটোয় মুটো করে' তার ভিতর দিয়ে বেত চালিয়ে এদের চার পাঁচজনকে এক এক সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। বাংলার সহরগ্রাম লুঠ করে পর্তুগীজরা যে সব হতভাগাদের বিক্রীর জন্য চালান দিত, এই হত তাদের হাল।

(৩)

সহরে জীবন : সমর ও অমর

খাস পর্তুগালে যাদের জন্ম, তারা বাংলার পর্তুগীজ সমাজে কুলীন বলে গণ্য হত। ভারতীয় পর্তুগীজ বা Castico-দের স্থান ছিল ঠিক তার পরেই। পর্তুগীজদের অনেকেই এদেশী মেয়ে বিয়ে করত। আধা-পর্তুগীজ আধা-বাঙ্গালীদের বলা হত Mestico। মানের দিক থেকে Mestico-রা Castico-দের চেয়ে কিছুটা খাট ছিল। আর ফিরিঙ্গী সমাজের সব চেয়ে নীচের সিঁড়িতে ছিল আধাকাফ্রি Mulatto এবং দেশী খৃষ্টান বা 'কালা'রা।

সামাজিক বিচারে বড়-ছোটর তফাত থাকলেও, এদেশে পর্তুগীজরা বোলচালে কেউ কারও চেয়ে বিশেষ কম ছিল না। সবারই ধরন-ধারণ ছিল অত্যন্ত বাসভারী। সহরের রাস্তায় বের হবার সময় তাদের পরণে থাকত ঢিলে-ঢালা রেশমী পোষাক এবং যুগপৎ রাজকীয় গাম্ভীর্য আর পেছনে নফর মাথায় ছাতা ধরে চলত। প্রায় সবারই কোমরে তলোয়ার বাঁধা থাকত। কেউ কেউ তলোয়ারের বোঝা

নিজে না বয়ে, চাকরের হাতে দিয়ে দিত। পথে চেনাশুনা কারও সঙ্গে দেখা হলে দরবারী কায়দায় কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে, এক পা সামনে বাড়িয়ে বিচিত্র হস্ত ভঙ্গিমা করে অভিবাদন জানানর রীতি ছিল। অভিবাদন যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ না করলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা থাকত। ভারতবর্ষের পর্তুগীজ সমাজে মানমর্যাদা বাঁচাবার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিছু বেশীই হত মনে হয়। অতিথির বসবার চেয়ার গৃহকর্তার চেয়ারের চেয়ে উঁচুতে রয় হলে তা' বিশেষ অপমানকর বলে ধরা হত এবং সে ক্ষেত্রে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য duel লড়াই অতিথির পক্ষে স্বাভাবিক রীতি ছিল।

অবশ্য পর্তুগীজ গার্হস্থ্য জীবনের সুর এত উঁচু তারে বাঁধা ছিল না,—থাকলে সত্যিই 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত' হ'ত। বিদেশী পর্যটকরা ফিরিঙ্গী গৃহস্থালীর প্রশংসাই করেছেন। সহর-বন্দরে পর্তুগীজরা দেশী কায়দার চালা-ঘর অথবা ইটের দালানে বসবাস করত। সস্তা নফর গোলামের কৃপায় ঘরদোর ঝকঝকে পরিষ্কার থাকত। এদেশে পর্তুগীজদের নিয়মিত স্নান এবং বারবার বেশ পরিবর্তনও বিদেশী আগন্তুকদের কাছে বিশেষ বিস্ময়কর মনে হত। কারণ ষোল-সতেরো শতকের ইউরোপীয় স্বাস্থ্যনীতিতে এ সব সুব্যবস্থার হদিশ মিলত না। বাইরে বের হবার সময় চটকদার পোষাকের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকলেও, বাড়ীতে পর্তুগীজরা যে জামাকাপড় পরত তা' আধুনিক রুচিসম্মত বললে অত্যুক্তি হবে না। খুব পাতলা আর ধবধবে সাদা সুতির কামিজ পায়জামা এবং মখমলের টুপি পরে দিনের অনেকটার সময়ই তারা বোয়াকে বসে পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিত। মৌতাতটা যাতে পুরোপুরি হয় সে জন্য আড্ডার সময় গোলামরা পেছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করত, কেউ বা কর্তাদের গা দলাইমলাই করত। বন্ধুবান্ধব দেখাসাক্ষাত করতে এলে কখনও কখনও বাড়ীর মহিলারাও এসে আসরে যোগ দিতেন এবং পর্তুগীজ কায়দায় গীটার বা লুটের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করে অভ্যাগতদের চিত্ত-বিনোদন করতেন। গানবাজনার প্রতি অনুরাগ পর্তুগীজদের একটু বেশীই ছিল বলতে হবে। তাদের ভোজন, শয্যাগ্রহণ এবং নিদ্রাত্যাগের সময়ও গোলামদের যন্ত্র এবং কণ্ঠ সঙ্গীত করার রীতি ছিল।

বিলাসী এবং আরামপ্রিয় হলেও ধার্মিক অনুষ্ঠানে তাদের কোনও গাফিলতী ছিল না। নিয়মিত গীর্জায় যেতে কারও বিশেষ বাধা হত না। অবশ্য গীর্জায় ঢুকলেই ফিরিঙ্গীদের গরম চাল নরম হত, এমন নয়। ক্যাথলিক কায়দায় প্রার্থনার সময় হাটুগেড়ে বসতে কর্তাদের যাতে কোনও কষ্ট না হয় সেজন্য গোলামরা গীর্জাতেও গদী বয়ে নিয়ে যেত। পায়ে শিকল বাঁধা গোলামদের উপস্থিতিতে গীর্জার সৌম্য শান্তি নষ্ট হত সন্দেহ নেই।

Pyrard de Laval লিখে গেছেন—প্রাচ্যের সর্বত্র পর্তুগীজরা ধর্মের সঙ্গে

ফূর্তি-আমোদের মধ্যিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটাত। প্রত্যেক রবিবার এবং অন্যান্য পুণ্যদিনে ক্রুশ আর নিশান হাতে ষোড়সওয়ারের মিছিল বের হত। সওয়াররা ঘোড়া নিয়ে নানান্ কায়দায় দৌড়-ঝাঁপ করত। দলে দলে সব লোক নদীর ধারে ছায়াঘেরা বাগানে চড়ুইভাতি করতে যেত। 'খৃষ্টমাস ইভের' দিন রাস্তার ধারে ধারে লণ্ঠন জ্বালান হত, টেবিল পেতে তার উপর ধবধবে সাদা ঢাকনা বিছিয়ে নানা সুখাদ্য বিক্রীর জন্য সাজিয়ে রাখা হত। প্রার্থনার সময় গীর্জায় বিচিত্র বাজনা বাজত। গীর্জার বাইরে রীতিমত মেলা বসত। বিশেষ করে, খেলনা আর পুতুলের চাহিদা খুবই বেড়ে যেত। গীর্জায় গীর্জায় এবং অনেক বাড়ীতে খৃষ্টের জন্মকাহিনী নিয়ে নাটক হত। কোথাও বা পুতুলনাচের মারফত এই কাহিনী বর্ণনা করা হত। এ ছাড়াও জেসুইট পাদ্রীদের কলেজে নিয়মিত নাটক হত। আর কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই ধর্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল করে যেত। বিয়ে বা নামকরণ উৎসব উপলক্ষেও ষোড়সওয়ারের মিছিল হত। এ সব মিছিলের সময় খুব গান-বাজনা এবং গোলাপ জল ছোড়াছুড়ি চলত। বিয়ে বা নামকরণ উৎসবের পর ছোটখাট ভোজ হত। এই সব ভোজে আহারের প্রাচুর্য থাকত না বটে, তবে অর্থব্যয়ে কোনও ত্রুটি হত না।

ধর্মগত এবং সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়াও পর্তুগীজদের আমোদ-প্রমোদের নানা ব্যবস্থা ছিল। এ যুগের বিলাতী ক্লাবের ধরণে তাদের জুয়ার আড্ডা ছিল। সেখানে বাজী ধরে তাসপাশা খেলা ছাড়াও পানাহার, গানবাজনা এবং রাত্রিবাসের ব্যবস্থা থাকত। এ সব আড্ডার আদব অনুযায়ী অনেকেই খেলার জিতলে লাভের অংশ দর্শক এবং সঙ্গীসাথীদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। এই রীতিটির নাম ছিল 'বায়াতো' এবং এর লোভে জুয়ার আড্ডায় গরীব পলটনদের ভীড় জমত। সে যুগের ফিরিঙ্গী পত্তনগুলিতে হাতবল, স্কিটল খেলা, ম্যাজিক, সং-এর তামাসা জন্তুজানোয়ার এবং সাপের খেলা এবং নাচগানের খুব কদর ছিল। সব মিলিয়ে এদেশের পর্তুগীজ বাসিন্দাদের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না।

কিন্তু পর্দাপ্রথার বিশেষ কড়াকড়ির ফলে প্রচুর ভোগবিলাস সত্ত্বেও অন্তঃপুরিকাদের সুখশান্তিতে যথেষ্ট ঘাটতি পড়ত। গীর্জা বা বিশেষ পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী ছাড়া তাদের কোথাও যাওয়া নিষেধ ছিল। নেহাৎ ক্ষণেভদ্রে তারা বাড়ীর বের হত, তাও চারদিক ঢাকা পাল্কী চেপে। বাইরে যাবার সময় তাদের পরণে থাকত মখমল, কিংখাব, দামাস্ক বা নিদেন পক্ষে রেশমের পোষাক এবং প্রচুর অলঙ্কার। বাড়ীতে তাদের পরিধেয়ের মধ্যে প্রধান ছিল 'বাজু' বা পাতলা এক ধরণের সেমিজ, চাদরের মত করে জড়ান রঙীণ একখণ্ড কাপড় এবং পায়ে চটি। খাওয়ার ব্যাপারে তারা পুরোপুরি বাঙালী বনে গিয়েছিল। ডাল, ভাত, ঘি, নোনা মাছ, আর আচার ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। কাঁটাচামচের

ব্যবহারটা বেহায়া গোছের ব্যাপার বলে ধরা হত। বাঙালী মেয়েদের মত ফিরিঙ্গী বৌ-ঝিরাও গেলাস ব্যবহার না করে সোজাসুজি কুঁজো থেকে জল ঢেলে খেত। ইউরোপ থেকে নবাগত যারা এই কায়দাটা ঠিকমত রপ্ত করতে পারে নি, তাদের নিয়ে অনেক ঠাট্টা টিটকারী করা হত। বারবার স্নান করা এবং চন্দন গায়ে মাখার অভ্যেসটিও পর্তুগীজ মেয়েরা এদেশে এসে শিখেছিল। সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে বসে থাকা ছাড়া সারাদিন তাদের বিশেষ কোনও কাজ থাকত না। গানবাজনা করে, পান চিবিয়ে, জানলার ধারে বসে, পুতুলে সাঁতার কেটে কোন মতে তারা সময় কাটিয়ে দিত। শোনা যায়, সুযোগ পেলেই গোলাম-বাঁদীদের সাহায্যে তারা অবৈধ প্রণয়ী সংগ্রহ করত। এ সব ব্যাপার ধরা পড়লে আর নিস্তার থাকত না। তাই অনেকেই সময় থাকতে খাবারের সঙ্গে ধুতুরার বিষ মিশিয়ে দিয়ে স্বামীর তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচত।

সমসাময়িক বর্ণনা থেকে ষোল-সতের শতকের বাংলায় পর্তুগীজ জীবনের যে ছবি আমরা পাই, সভ্যতা বা সুরুচির মাপকাঠিতে হিসাব করলে তার দাম খুব বেশী দাঁড়ায় না। কিন্তু ইতিহাসের পাঠক শুধু সভ্যতার বিকাশ, মনীষের গুঠা পড়া আর অতিমানবের কীর্তির কথা জেনেই তুষ্ট হয় না। ইতিহাসের pageantry সম্বন্ধে মানুষের একটু স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। আর বাংলার নরম মাটিতে এই লাটিন জাতির উদ্দাম জীবনযাত্রার ছবির প্রধান মূল্য এক চিত্তাকর্ষক pageantry হিসাবেই।

ভারতীয় ঐতিহাসিক নথীর পরিষদের (Indian Historical Records Commission) সপ্তবিংশতিতম অধিবেশন ২৫-২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রী কে, এল, দুবে অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা জানাবার পর সভার কাজ সুরু হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন স্থির ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর হিন্দুস্থানী অভিভাষণের ইংরাজী অনুবাদ ডক্টর তারাচাঁদ পাঠ করেন। মৌলানা আজাদের অভিভাষণে জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives) সমস্যাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়। ১৬৭২ সন অবধি প্রায় তিন শতাব্দীর যাবতীয় সরকারী দলিল-দস্তাবেজ চিঠিপত্রের যে বিরাট সংগ্রহ আমাদের জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে ঐতিহাসিক গবেষকের কাছে তার মূল্য অসাধারণ। বিশেষতঃ সম্প্রতি ১৯০১ সন অবধি সমস্ত কাগজপত্র গবেষকদের দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে এই মূল্য আরও বেড়ে গেছে। অন্যদিকে আবার প্রাক্তন ভারত সরকারের 'রেসিডেন্সী' এবং 'পলিটিকাল এজেন্সী'গুলির কাগজপত্র সম্প্রতি জাতীয় মহাফেজখানায় আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে অনেক এবং আজ এই মহাফেজখানা শুধু এশিয়ার সর্ববৃহৎ নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম মহাফেজখানাগুলির অন্যতম। কাগজপত্র রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এই বিরাট সংগ্রহ সুব্যবহার করার জন্য যাবতীয় দলিলগুলির বিস্তৃত এবং পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অথচ এ কাজ সুরু হয়েছে মাত্র বললেও অত্যুক্তি হবে না। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর অভিভাষণে জানিয়েছেন যে অর্থাভাবহেতু সুদূর ভবিষ্যতেও এ কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে এই তালিকা প্রস্তুত করার কাজে সাহায্য করতে তিনি আবেদন করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর অভিভাষণ পাঠের পর প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা সুরু হয়। শ্রীনিবাস সেন আঠারো শতকের ফরাসী ভাগ্যান্বেষী মোদাভের চিঠিপত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। পণ্ডিচেরীর মহাফেজখানায় প্রাপ্ত এই চিঠিপত্রগুলি থেকে শুধু মোদাভের জীবনকাহিনী নয়, তৎকালীন (১৭১৩—৭১ খৃষ্টাব্দ) ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। শ্রী সি, এস, শ্রীনিবাসাচারী মাদ্রাজ Recorder's Court (১৭৯৮—১৮০১) এবং তার কার্য-কলাপ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাদ্রাজ Mayor's Court বন্ধ করে তার জায়গায় এই আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই আদালতের দলিলপত্র থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিচারব্যবস্থার কতকগুলি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে

খবর পাওয়া যায়। শ্রীকালীকিঙ্কর দত্ত পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী এবং তাঁর সম্পত্তি সংক্রান্ত কয়েকটি দলিল বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯৪৯—৫০ সনে West Bengal Regional Records Survey Committee বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দপ্তরখানায় যে সব দলিলপত্রের সন্ধান পায় তার ভিত্তিতে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধও পঠিত হয়।

১৯৪১ সনের কটক অধিবেশনের তুলনায় এবারকার নজীর পরিষদের অধিবেশন আলোচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল সন্দেহ নেই। তবু একটা কথা বলা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক নজীর বলতে যে বিশেষ ধরণের দলিল-পত্র বোঝায়, এই পরিষদের আলোচনা তাদের বিষয়েই সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। না হলে অন্যান্য ঐতিহাসিক সমিতির কর্মসূচীর সঙ্গে নজীর পরিষদের কার্যাবলীর কোনও পার্থক্য থাকে না।

• • •

গত ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর নাগপুরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন হয়ে গেল। মূল সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা কারমাইকেল অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, অন্যান্য শাখার সভাপতি ছিলেন—ডক্টর এ. ডি. পুসলকার (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—১১১ পৃঃ অঃ পর্য্যন্ত), ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন (ঐ—১১১ পৃঃ অঃ থেকে ১২০৫ পৃঃ অঃ পর্য্যন্ত), ডক্টর হবিবুল্লা (মুসলিম ভারতের ইতিহাস—১২০৫ পৃঃ অঃ হতে ১৫২৬ পৃঃ অঃ পর্য্যন্ত), ডক্টর মুহম্মদ হোসেন খান (মোগল ভারতের ইতিহাস—১৫২৬ পৃঃ অঃ হ'তে ১৭৬৪ পৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) ও ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় (আধুনিক ভারতের ইতিহাস)। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ২৭শে ডিসেম্বর সকালে কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। তিনি ইতিহাসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করেন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচনার প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্মিলিত ঐতিহাসিকবৃন্দকে সচেতন করে দেন। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘকালাবধি অসুস্থ ডক্টর রায় চৌধুরী সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ মহামহোপাধ্যায় গোস্বামী কর্তৃক পঠিত হয়। তাতে শুধু সমকালীন ঐতিহাসিক গবেষণায় একটা নিষিধ ছিল না, উৎসাহী গবেষকের সম্মুখে অনেক নূতন পথের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। ২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে ও ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে বিভিন্ন শাখার সভাপতিরা ভাষণ দেন; দ্বিতীয় দিন বিভিন্ন শাখার অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিও পঠিত হয়। ভাষণের প্রত্যেকটি উচ্চশ্রেণীর হয়েছিল যদিও প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করা চলে না।

বস্তুতঃ ইতিহাস কংগ্রেসে পঠিত প্রবন্ধের দৈন্য দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক ইতিহাস এখনও অনাবশ্যক প্রাধান্য পাচ্ছে। যদিও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখায় সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়, অন্যান্য

শাখায় বিশেষ করে পঞ্চম শাখায়, তাদের স্থান নগণ্য। গবেষকদের পক্ষে বিশেষজ্ঞ হবার একটা সীমা থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞ হবার লোভে দৃষ্টিভঙ্গীকে সূক্ষ্মতম ও পরীক্ষার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতম করতে গেলে ইতিহাসের মূল ধারাকে হারাতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবন্ধের মধ্যে কোন নূতন উপাদান বিচার বা তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস লক্ষিত হয় না, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সাক্ষ্যের এমন নিষ্ফল প্রাচুর্য্য ইতিহাস কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে না। এ বিষয়ে শাখা সভাপতিদের অধিকতর অবহিত হওয়া উচিত মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে রামগিরি ভ্রমণের আয়োজন ছিল। তৃতীয় দিন প্রাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়োদশ ইতিহাস কংগ্রেস সমাপ্ত হয়।

• • •

আচার্য্য যদুনাথের অশীতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১০ই ডিসেম্বর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি হলে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ ও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দিত করেন। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে আচার্য্য যদুনাথের দান অতুলনীয়। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে তাঁর নিরলস সাধনা চলেছে মোগল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব্ব নিয়ে। তাঁর রচনাবলীই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, প্রতিভার সম্যক্ পরিচয়, সেই অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও নিষ্ঠার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন করে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ ও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বাঙালী জাতি ও ভারতীয় ঐতিহাসিক সমাজের গুরু-ঋণ শোধ করলেন।

সুসজ্জিত সভাগৃহে বৃদ্ধ আচার্য্য প্রবেশ করলে সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি আসন পরিগ্রহ করলে মাল্যদান হয় ও প্রারম্ভিক সঙ্গীতের পর বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ ও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান হয়। কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ থেকে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষ থেকে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সাহিত্যসেবীদের পক্ষ থেকে শ্রীসুশীলকুমার দে ও আচার্য্যের ছাত্রগণের পক্ষ থেকে শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক শ্রীসুসোভন সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের বাণীসমূহ পাঠ করেন। তারপর বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আচার্য্যকে মানপত্র দেওয়া হয়। উত্তরে আচার্য্য যে মূল্যবান অভিভাষণ প্রদান করেন—এই পত্রিকার মুখবন্ধে তা প্রকাশিত হলো। যদিও আচার্য্য তাকে আপনার শেষ বাণী বলে উল্লেখ করেছেন—তথাপি যেন তা সত্য না হয়। আচার্য্য শতজীবী হ'ন ও ঐতিহাসিক সমাজের সম্মুখে এক অবিচলিত তপস্যার আদর্শ রূপে বিরাজ করুন।

———

সংশোধন : 'ইতিহাস' পত্রিকার দ্বিতীয় (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় প্রকাশিত 'সোভিয়েট অর্থনৈতিক বিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটী ভ্রম ছিল। ভ্রম-সংশোধন নীচে দেওয়া হল :—

পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
১০১	৫-৬	সমষ্টিগত কৃষি ব্যবস্থার আশ্রয়ে উৎপাদন তত দ্রুততালে বাড়াবার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল না।	সমষ্টিগত কৃষিব্যবস্থার আশ্রয়ে উৎপাদন যত দ্রুততালে বাড়াবার সম্ভাবনা ছিল ব্যক্তিগত চাষে তত দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল না।
১০১	১৫	এই অসামান্য প্রসাবে	মাষ্ট্রকমতায় এই অসামান্য প্রসাবে
১০৮	৩১	অনুমোদিত	অনুমোদিত

ইতিহাস

ত্রৈমাসিক পত্রিকা : প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

সম্পাদক :
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীসরোজকৃষ্ণ সিংহ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচীপত্র

ঐতিহাসিক চিত্রের 'সূচনা'

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪

গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী ১৯৮

ইতিহাস ও গণবিজ্ঞান

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ২১৯

দুইটি ঐতিহাসিক চিন্তাধারা

শ্রীশশীভূষণ চৌধুরী ২২৭

স্বাধীন কাছাড় রাজ্যের শেষ অধ্যায় ও তৎকালীন জীবন

শ্রীদেবব্রত দত্ত ২৩৭

বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীসুকুমার সেন ২৪২

ললিতকলা বিষয়ক পরিভাষা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত ২৪৩

স্যর উইলিয়ম ফষ্টার

শ্রীপ্রভুদয়াল গুপ্ত ২৪৭

মূল্য : প্রতি সংখ্যা—দেড় টাকা, বার্ষিক পাঁচ টাকা

প্রকাশক :
শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা—১৩

ইতিহাস

প্রথম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৫৮ [চতুর্থ সংখ্যা

'ঐতিহাসিক চিত্রে'র সূচনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ঐতিহাসিক চিত্র' বাংলা ভাষায় ইতিহাস বিষয়ে পত্রিকা প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা। ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র সম্পাদিত এই পত্রিকা মাত্র তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় 'সূচনায়' ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বাংলায় ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে যা বলেন, আজও বহুলাংশে তা নূতন করে শোনা প্রয়োজন। 'বিশ্বভারতী'র অনুমতিক্রমে উক্ত রচনাটি আমরা পুনর্মুদ্রিত করলাম।]

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার ভার সম্পাদক দয়া অধিকার পাইয়াছি, আর কোন প্রকারের অধিকারের দাবী রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকদলকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোন শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না,—সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চ কলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হয়ে।

যাঁহারা কর্মকর্তা পাছে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন",—অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে। সম্পাদক মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহার ফল বাঙ্গলার এবং আশা করি অন্যদেশের পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য "ঐতিহাসিক চিত্রের" শুভ-জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত

হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতি সাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফলে কেবল পাণ্ডিত্য নহে, তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাঙ্গলা দেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাঙ্গলার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালরূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাষ্টারের শাসন হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্য প্রাসাদের বড় সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্র অর্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনা পত্রে জানাইয়াছেন "নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণ কাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙ্গালী রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাবৃত্ত প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এই ত প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পক্ষ পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্ত্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে ঐতিহাসিক চিত্র দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না,—সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি ঐতিহাসিক চিত্রের মৃত্যু হয় তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলা

যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাঙ্গালার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ঐতিহাসিক চিত্র তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি,—লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা,—এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহ কার্যে ঐতিহাসিক চিত্র সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে—বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (Productive এবং unproductive।) বিলাস সামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা যায়;—কারণ ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, ঐতিহাসিক চিত্র যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না। কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে কাঁচা দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় পাকা পণ্যে পরিণত হইয়া এদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়;—তখন আমরা জানিতেও পারিনা তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোন মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন, তখন সেটিকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু কি বাণিজ্যে কি সাহিত্যে ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আধার হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোন কাজেই লাগিবে না?

ঐতিহাসিক চিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানা স্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশী জোগাড় হয় নাই, ইহার কলবল ও অর্ডার হইতে পারে, ইহার উৎপন্নদ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য, যে মহৎ অভাব মোচনের আশা করা যায়, তাহা বিলাতের বড়া বড়া সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি

১৯৩৫-১৯৩৯

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সাবধানী ঐতিহাসিক সমকালীন ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন তাদের সংখ্যা অনেক এবং মূল্য অবিসংবাদিত। তাঁর পক্ষে সমকালীন ইতিহাসের সমস্ত উপাদান জানা সম্ভব নয়, আরো সম্ভব নয় প্রাপ্ত উপাদানের বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ বিচার। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে তিনি বহুল ও বিচিত্র ঘটনাবলীকে আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে যথাযথ বিন্যস্ত করতে পারেন না। তাঁর দৃষ্টি তাদের প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তার চেতনা আবিষ্ট, নিতান্ত ব্যক্তিগত সংস্কার ও সংশয়, নিতান্ত সাময়িক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মোহে। দেশকাল শ্রেণী ও স্বার্থের খণ্ড এবং ক্ষণিক আবেদনের সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে সত্যের শাশ্বত লোকে উঠতে হলে যে সাধনার প্রয়োজন তা দুষ্কর এবং তাতে সিদ্ধি দুর্লভ। বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে অচেতন ও সর্ব্বব্যাপী প্রচার যতই গৃহীত হচ্ছে—সমকালীন ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ততই জটিলতর হচ্ছে; হচ্ছে আরো ভ্রান্তিসঙ্কুল, যেখানে, ঘটনার গহণ অরণ্যের মধ্যে সহস্র ফ্যাক্টের স্বর্ণ-মারীচ নিত্য মরীচিকা দেখিয়ে অনুসন্ধিৎসু মনকে বিভ্রান্ত করছে, সেখানে বিউরি স্মরণ করে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের শক্ত নিরাপদ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে থাকাই শ্রেয়ঃ। সমকালীন ইতিহাস আলোচনা বিবেকবান্ ঐতিহাসিকের কাছে পরধর্ম্ম, অতএব ভয়াবহ।

কিন্তু চান আর না-ই চান, ঐতিহাসিকরা উদাসীন থাকতে পারেন না। সামাজিক জীব হিসাবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সমকালীন ইতিহাসের ঢেউ লাগে। মাঝে মাঝে তাঁদের শাশ্বত সত্যের মিনার থেকে নেমে আসতে হয়। অধ্যাপক গুচ্, উড্‌ওয়ার্ড, নেমিয়ার ও টেলর তার কটি দৃষ্টান্ত। রয়্যাল ইন্‌স্টিউট অব্ ইনটারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার্সের ঐতিহাসিকবৃন্দ টয়েনবির নেতৃত্বে অনেক কাজ করেছেন ও করছেন যা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তথাপি উপর্য্যুক্ত আপত্তি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ছয় হাজার বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে তা নিছক বোধসৌকর্য্যার্থ নয়। আধুনিক ইতিহাস অভিহিত পর্ব্বটিকে আরো কত দীর্ঘ করা হবে? দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ফ্যাক্টের অভাব কি একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা? কি প্রাচীন কি অর্ব্বাচীন ইতিহাসে কোনকালেই ত সমস্ত ফ্যাক্ট জানা যায় নি। সিদ্ধান্ত সব সময়ই নির্ব্বাচন-নির্ভর এবং নির্ব্বাচন ঐতিহাসিকের বুদ্ধি ও বিবেচনা-নির্ভর।

তাছাড়া প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে যে সকল বিতর্কসমূল সমস্যা রয়েছে তার অনেকগুলির কারণ ফ্যাক্টের অভাব নয়, ঐতিহাসিকদের বস্তুব্যভেদ।

মিশরের হিকসস-অভিযান বা আর্য্যদের বাসস্থান, মার্কারোসার ইতালীয় নীতি বা বোনাপার্টির আর্থাপনীতি সম্বন্ধে বিতর্কই কেবল নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুগত ও নিরাসক্ত হতে পারবে, পঠনশালায় আবহাওয়ায় যোগ্য বিবেচিত হবে—আর ফ্রান্সের দালাদিয়ের সরকার বা জার্মাণীর হিটলারী আমল বা স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক অপাঙ্‌ক্তেয় পরিগণিত হবে—এর মধ্যে যুক্তি কোথায়? আলোচনার নৈর্ব্যক্তিকত্ব বিষয়-বস্তুর ওপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। সমকালীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে বরং বেশী একটা উপাদান পাওয়া যাচ্ছে—ঐতিহাসিকের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। Zeitgeist বা যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ না করলে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না—একথা কলিংউড প্রমুখ ভাববাদীরা বলে থাকেন। বিংশশতাব্দীর মানুষ যদি পুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সের Zeitgeistএর সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করতে পারে তবে সমকালের ধর্ম্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আপন সত্তাকে বিজড়িত করতে পারে না কেন? বর্ত্তমানের সঙ্গে তবু আমাদের আধিভৌতিক যোগ রয়েছে। অতীতের সঙ্গে যোগ সাধন সম্পূর্ণরূপে আত্মিক যোগ সাধন। শুধু বিশুদ্ধ মনন ও স্মরন-ধর্ম্মী কল্পনা দ্বারাই আধিভৌতিক যোগের অভাব অতিক্রম করতে হয় সে ক্ষেত্রে। এখানে bias বা আসক্তির প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু তার সম্ভাবনা কি প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় নেই? ফরাসী ঐতিহাসিক ব্লকের কাহিনী স্মরণীয়। তাঁকে আধুনিক ইতিহাস-পাঠনে চিন্তিত দেখে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সান্ত্বনা দেন—'তবুও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাস পড়াতে দেওয়া হয়নি!' বস্তুতঃ পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে নিরপেক্ষতার কোন পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। হয়তো বা বলে, বেনো, দালাদিয়ের সম্বন্ধে ফরাসী ঐতিহাসিকদের মতভেদ ঘটবেনা, নিশ্চিত মত-ভেদ ঘটবে ব্রেফুস সম্বন্ধে, নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তাঁদের বিতর্ক হবে তীব্রতর, ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তীব্রতম। ধর্ম্মবিপ্লব সম্বন্ধে অ্যাক্টন কি নিরপেক্ষ? সিজর প্রথম তিনশতকের খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে? প্রাচীন ইতিহাসের আধারে প্রত্যেক খ্যাত-নামা ঐতিহাসিক আপন যুগের এমন কি আপন সত্তার ইতিহাস রচনা করে থাকেন। মেকলে লিখেছেন ভিক্টোরীয় যুগের হুইগদের কথা, তোকভিল উদার তন্ত্রের ইতিহাস, ট্রিটস্কে বিসমার্কের জার্ম্মাণীর কাহিনী। ট্রেভেলিয়ানের ভাষায়—আসক্তি থাকবেই, তবে যেন তা right kind of bias হয়। অর্থাৎ ইতিহাসের মূল আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত থাকে। ঐতিহাসিক সাধু হবেন, তিনি তথ্য পরীক্ষা ও উপাদান বিশ্লেষণের জন্য বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করবেন, এই আমরা তাঁর কাছ থেকে দাবী করতে পারি, তার বেশী নয়। তৃতীয়তঃ

প্রচার আধুনিক যুগে সত্য উপলব্ধির সম্মুখে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নাই। বিকৃত সত্য, অর্ধসত্য, এমন কি নির্লজ্জ মিথ্যা পরিবেশনে পররাষ্ট্র-দপ্তর মেকিয়াভেলিকেও হার মানায়। কিন্তু ঠিক সেই জন্যই কি সত্য উদ্‌ঘাটনের ভার আদর্শ ও মূল্যবোধহীন রাজনীতিবিদের উপর না দিয়ে ঐতিহাসিকদের স্বহস্তে নেওয়া উচিত নয়? এ ভার দুরূহ ভার, কিন্তু জ্ঞান-তপস্বীর যোগ্য। আজ হতে শতবর্ষ পরে যখন বিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসারে এই সব দপ্তরের দলিল-দস্তাবেজ পঠনযোগ্য হবে, তথ্য বিচারের সত্য পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া যাবে—তখন ভাবী ঐতিহাসিক কি করবে এই প্রগল্‌ভ মিথ্যার অভ্রংলিহ স্তূপ নিয়ে? কি করবে রাজনৈতিক নায়কদের আত্মপক্ষ সমর্থক স্মৃতিকথা নিয়ে যদি তাঁদের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ ও গভীর জ্ঞান না থাকে? বর্তমান ঐতিহাসিকেরাই তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কষে এদের মূল্য যাচাই করতে পারেন, সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ মানব-সমাজকে বর্তমানের স্থূল ত্রুটি অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে পারেন। প্রথম মহা-যুদ্ধের পর ঐতিহাসিকেরা এ কর্তব্য করতে পারেন নি। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও যদি সাহস, সংশয়ে শ্রেয়োমন্যতার বা রাষ্ট্রিক কর্তব্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ভার গ্রহণ না করেন তবে মানব-সভ্যতার মহত্তী বিনষ্টির জন্য তাঁরাও আংশিকভাবে দায়ী হবেন। পেলোপনেসীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও থুকিডিডিস তার ইতিহাস লিখেছিলেন—সূক্ষ্ম বিবেকের অনুরোধে বা পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে নিশ্চেষ্ট থাকেননি। অথচ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-রচনার সেই প্রথম নিরপেক্ষ এবং সফল চেষ্টা।

অবশ্য সমকালীন ইতিহাসের একটা সীমা স্বীকার করতে হবে। এক্ষেত্রে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা কম। অতীতের ঘটনাগুলির আদ্যন্ত অখণ্ড রূপ আমরা জানি, তার পরিণামের পূর্ণ চিত্রও পাই। সমকালীন ইতিহাসের সমস্যা উপলব্ধির অতীত, পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব, শেষ কথা বলা চলে না। ঐতিহাসিক যদি খোলামনে বিচার করতে পারেন ভাল, পূর্ব-পোষিত কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অগ্রসর হতে গেলে বিপদ আছে। ঘটনাচক্রের পূর্ণাবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, কিন্তু পরিণাম সম্বন্ধে সাময়িক মন্তব্যের অতিরিক্ত কিছু বলতে যাওয়া অনৈতিহাসিক। সাময়িক হলেও তার মূল্য যথেষ্ট কারণ তা নিরাসক্ত, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত।

(২)

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ১৯৩৫ ও ১৯৩৯এর অন্তর্বর্তীকালে গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির পরাজয়। প্রসঙ্গক্রমে নাৎসী জার্মানী ফাসিস্ত ইতালী ও সোভিয়েত

রাশিয়ার নীতি আলোচিত হয়েছে। কারণ প্রথম দুই রাষ্ট্রের কাছে গণতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপ পরাজয় স্বীকার করেছিল এবং তার ফলে ওয়াবহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত; আর তৃতীয় রাষ্ট্রটীর সঙ্গে সৎভাবে সহযোগিতা করলে সে মহাযুদ্ধ এড়ানো যেত, না হয় সহজে যেতা যেত তথা স্বল্প অপচয়ে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটতো। এ কাহিনী শুধু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বৈদেশিকনীতির দুর্ব্বলতা ও অপটুতার কাহিনী নয়, ইউরোপের দুটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতার শোচনীয় আত্মিক অধঃপতনের কাহিনী। উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে—এ যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের স্মৃতিকথা বা রোজনামচা, চার্চ্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ন্যুরেমবার্গ বিচারের নথিপত্র, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রকাশিত এবং ঐ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে প্রকাশিত জার্মাণ পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিলপত্র—ও অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ যথা অধ্যাপক নেমিয়ারের Diplomatic Prelude 1938—39, অধ্যাপক টেলরের From Napoleon to Stalin, ম্যাক্স বেলফের The Foreign Policy of Soviet Ruasia, রয়্যাল ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন প্রকাশনা, ম্যকনীলের সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস ইত্যাদি।

ভার্সাই সন্ধি এই বিষাদান্ত নাটকের বীজসন্ধি। পশ্চিমী গণতন্ত্র পরাজিত জার্মাণীর ওপর যুদ্ধাপরাধের কলঙ্ক এবং ক্ষতিপূরণের বিপুলতার চাপিয়ে তার শিল্প সমাজতন্ত্রকে দুর্ব্বল করে রেখেছিল। জাতি সংঘের মহান্ কল্পনাকে রূপ দিতে গেলে যে দুটি রাষ্ট্রের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন সেই আমেরিকা ও রাশিয়া একটি স্বেচ্ছায় ও অন্যটি বাধ্য হয়ে জাতি সংঘের বাইরে ছিল। জার্মাণীর নত শ্রেয়োমন্ত ও সামরিক জাতি গোপনে এবং সুবিধা পেলে প্রকাশ্যে ভার্সাই সন্ধির সর্তাবলী অবহেলা করবে তথা সামগ্রিক নিরাপত্তা বিপন্ন করবে এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অবহিত হওয়া উচিত ছিল এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, তাকে জাতিসংঘে আহ্বান করে, সেই অবশ্যম্ভাবী বিরোধ সম্ভাবনাকে দ্বিতীয় ফ্রন্টের ভয় দেখিয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু সাম্যবাদের আতঙ্ক তখন ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি লুপ্ত করেছে। তারা রাশিয়ার চারদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবেষ্টনী স্থাপন করে সংক্রামক বিপ্লববীজ প্রতিরোধ করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। বাল্টিক ও বল্কানের এই রাষ্ট্রগুলি পূর্ণ বা আংশিক রূপে ভার্সাইয়ের সৃষ্টি এবং ভার্সাইয়ের সন্ধি তথা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের রাশিয়ার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় অথচ ইংল্যাণ্ড তাদের নিরাপত্তার জন্য কোন দিনই প্রতিশ্রুত বা প্রস্তুত ছিলনা। ফলে তারা ফ্রান্সের ওপর একান্তরূপে ভরসা স্থাপন করে। ফ্রান্স আবার ভার্সাইসন্ধির নিরস্ত্রীকরণ ধারার ওপর আস্থাস্থাপন করে নিশ্চিন্ত ছিল। ১৯২৩ সালে মুসোলিনির অভ্যুদয় ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত ও ভূমধ্যসাগরীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু

সংসা বৈরুবীভূত ইংল্যাণ্ড তার কাণে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের মন্ত্র পড়ে পড়ে তাকে ইতালীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে বাধা করল। এর পিছনে অবশ্য ইঙ্গ-ফরাসী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিকদল ও সাম্যবাদভীত ধনিকশ্রেণী ছিল যাদের চোখে মাস্তিটস্কির ঘাতক ও শ্রমিকসংঘের যম মুশোলিনি নোয়ার আর্কের মত একমাত্র ধ্রুব আশ্রয় স্থল বলে পরিগণিত। তাছাড়া একচক্ষু হরিণের মত রাইন সীমান্তের প্রতি বক্রদৃষ্টি ফ্রান্স একনায়কবাদের আবির্ভাবকে অনেকটা উপেক্ষাই করল।

শ্রীযুক্ত ডার্সাইয়ের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে কিনসের ভবিষ্যবাণী ফললো। ক্ষতিপূরণের পাপচক্রে জার্মাণীতে মার্কের পতন ঘটল; আমেরিকা দুর্লঙ্ঘ্য শুল্ক-প্রাচীর বসাল এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিল। লাভ হল জার্মাণীর, কারণ একহাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য অন্যহাতে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা জার্মাণীকে প্রচুর ধার দিতে লাগল। এই উন্মাদ অর্থনৈতিক ভোজবাজী বেশীদিন টিকলনা। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পর পরে সারা পৃথিবীতে নেমে এল প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ঝড়। ফলে প্রায় দেউলিয়াগ্রস্ত আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স লক্ষ্য করল না গণতন্ত্র বিশ্বাসী জার্মাণীর মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং সাম্যবাদভীত থাইসেন-ক্রাপ চালিত ধনিকশ্রেণী ও সিকট-হেগার চালিত সামরিকশ্রেণী মিলে সকল মুস্কিল আসানের উপায় স্বরূপ নূতন এক শাক্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সে শক্তি প্রাচীন সামরিক সত্তার গভীরতম অন্ধকার কন্দর থেকে আদিম টিউটন বর্ব্বরতা নিয়ে জেগে উঠেছে—মনুষ্যত্বের ছয় সহস্র বৎসরের সাধনালব্ধ মূল্য ও মহিমার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য নাশ করতে। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন সমাজতন্ত্রের নেকী মুখোস ত্যাগ করে উলঙ্গ নাৎসীবাদ আত্মপ্রকাশ করলো। হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রাচীন গাত্রের এই ভয়াবহ লিখন পড়তে পারলো না।

• • • •

১৯৩৫ সালের ৯ই মার্চ্চ সরকারীভাবে জার্মান বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৬ই মার্চ্চ বাধ্যতামূলক সার্ব্বভৌম সমর-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করে হিটলার ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ্ ঘোষণা করলেন এবং ঐ মাসে ইতালীর বিরুদ্ধে জাতিসংঘে অভিযোগ উপস্থাপিত করলো আবিসিনিয়া। ইডেন ও সাইমন বার্লিন গেলেন অনুসন্ধানের জন্য। শুনলেন জার্মানি এবং ইংল্যাণ্ডের বিমানশক্তির সাম্যও বিনষ্ট হয়েছে। ইডেন তখনি মস্কো গেলেন রাশিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এবং স্তালিনের সঙ্গে মূল্যবান্ যোগসূত্র স্থাপন করে এলেন। বলডুইন পার্লামেণ্টে যখন স্বীকার করলেন বিমান শক্তির সমতা নষ্ট হয়েছে তখন কেউ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করলনা এবং চার্চ্চিল ছাড়া অ্যাটলি আর্চ্চিবল্ড সিনক্লেয়ার সকলেই নিরস্ত্রীকরণের উপর ও লীগ কভেনাণ্টের

উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত রইলেন। বৈদেশিক দপ্তর কিছু তৎপর হল, হিটলারের প্রতিশোধক হিসাবে মুসোলিনিকে মনে পড়ল ইংল্যাণ্ডের। সুতরাং এপ্রিলে ষ্ট্রেসা সম্মিলনীর ব্যবস্থা হ'ল, সে বিষয়ে ফ্রাঁসিনের Politique Francaise 1919—40 গ্রন্থে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। ম্যাকডোনাল্ড ও সাইমন, লাভাল ও ফ্রাঁসিন, মুসোলিনী ও সুডিন জার্মাণীর সমরসজ্জা নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রথম দিন, ১১ই এপ্রিল, হিটলারের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হোল এবং সে প্রস্তাব জাতি সংঘের কার্য্যকরী সমিতিকে পেশকরা হবে স্থির হোল, দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মুসোলিনি এমন নিষ্ফল এবং একতরফা সর্ত্তভঙ্গের নীতির নিন্দা করলেন—কারণ এমন কার্য্যে ইউরোপের শান্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। 'ইউরোপের শান্তি' কথাটি উচ্চারণ করে তিনি কিছুক্ষণ থেমে থাকেন এবং তৎক্ষণাৎ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তার গূঢ় বাসনা বুঝতে পারে। মুসোলিনি জানতে চান যে তিনি জার্মাণীর বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে সাহায্য করতে রাজী আছেন যদি ইউরোপের বাইরে, অর্থাৎ আবিসিনিয়ায়, মুসোলিনির পরিকল্পনায় ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স ব্যাঘাত না জন্মায়। সেইরাত্রে মুসোলিনির মনোভাব স্পষ্ট করে জানা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে বৈদেশিক দপ্তরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিতর্ক হয়। মুসোলিনির বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে এবং জার্মাণীর সমস্যা গুরুতর বিধায় এ প্রশ্ন তোলা হয়নি। লিটভিনফ্, ব্যাপকতর প্রস্তাব আনবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে চান কিন্তু সাইমন তাঁকে নানা উপায়ে নিরস্ত করেন। অতএব মুসোলিনি বোঝেন মৌন সম্মতির লক্ষণ, আবিসিনিয়া জয়ে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের আপত্তি নেই। অবশ্য এই সময় মুসোলিনির নীতি বাস্তবিকই জার্মান বিরোধী ছিল। ১৯৩৩-এ অষ্ট্রিয়ায় জার্মান প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা মুসোলিনির দৃঢ়তায় ফলেই ব্যাহত হয় এবং মুসোলিনির সাহায্য পাবার ভরসায় হিম্‌ওয়ের নাৎসী ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে দমন করে। ১৯৩৪এর জানুয়ারীতে ফ্রান্স ইতালীর সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল, অবশ্য বাধ্য হয়ে। জার্মান ফ্রন্টে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এবং ইংরেজদের নিরস্ত্রীকরণের ঠেলা সামলাতে গিয়ে দুর্ব্বল হওয়ায় ফ্রান্স ইতালীর সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ষ্ট্রেসার পর সে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হ'ল। কিন্তু শুধু তার ওপর নির্ভর করে না থেকে ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে অগ্রসর হোল। বার্থু রাশিয়া বাল্টিক ও বল্কান অঞ্চল নিয়ে লোকার্ণো চুক্তির মত একটা চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। তখন কতিপয় কারণে রুশ পররাষ্ট্রনীতি বার্থুর পরিকল্পনার প্রতি অনুকূল হয়েছিল। ট্রটস্কির সঙ্গে স্তালিনের কলহ ও স্তালিনের জয়, সুদূরপ্রাচ্যে জাপ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি এবং জার্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয় তার মধ্যে প্রধানতম। ২রা মে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি এবং ১৬ই মে সোভিয়েট-চেক চুক্তি সম্পন্ন হ'ল। দ্বিতীয়টির মর্ম্ম—চেক স্বাধীনতা বিপন্ন হলে

ফ্রান্স যদি চেকদের সাহায্য করে তবে রাশিয়াও সাহায্যার্থে অগ্রসর হবে। যাই হোক, এই চুক্তিত্রয়ের গুরুত্ব বিশেষ কিছু অনুভূত হ'ল না। এগুলি কার্যকরী করবার জন্য রাশিয়া যে সামরিক চুক্তি দাবী করেছিল তা কোনদিনই সম্পন্ন হয়নি, ১৯৩৯-এর পূর্ব্বে ফ্রান্স সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। স্তালিনের সঙ্গে দেখা করে এবং ১৪ই মে তাঁর ঘোষণা আদায় করে ফিরবার পথে পোল্যাণ্ডে গোরিং এর সঙ্গে লাভালের দেখা হয়। গোরিংকে লাভাল গোপনে আশ্বস্ত করেন যে উপর্যুক্ত চুক্তি ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যোঝাপড়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে না।

তবু হিটলার ২১শে মের বক্তৃতায় কিঞ্চিৎ সাবধান হলেন। ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি লোকার্ণো চুক্তির হন্তারক বলে তিনি তার তীব্র নিন্দা করলেন বটে তবু এমন নিরীহ শান্তিপ্রিয় বক্তৃতা শান্তিবাদী আপোষকামী ইংল্যাণ্ডের কানে মধু বর্ষণ করল। ২১শে জুন সকলের, বিশেষতঃ ফ্রান্সের, অজ্ঞাতে ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর সঙ্গে নৌ-চুক্তি সম্পাদন করল। স্থির হোলো জার্ম্মাণী ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত নৌ-নির্ম্মাণ করতে পারবে এবং আপততঃ শতকরা ষাট ভাগ এবং দরকার হলে সমান সংখ্যক ডুবো-জাহাজ তৈরী করতে পারবে। এর চেয়ে নিরাপত্তা-হানিকর ব্যবস্থা কল্পনার অতীত। বল্ডুইন পার্লামেণ্টে বলেন—আক্রমণাত্মক কার্য্যে ডুবোজাহাজ ব্যবহার করবে না প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জার্ম্মাণী। চার্চ্চিল এই আত্মপ্রতারণার প্রতিবাদ করলেন। যাই হোক্, ষ্ট্রেসার ত্রিশক্তি সম্মেলনের ভিত্তি নষ্ট হ'ল। গণতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে মুসোলিনির বিশ্বাস দৃঢ়তর হোল। তিনি ষ্ট্রেসার কথা স্মরণ করে ও জাতিসঙ্ঘের দীর্ঘসূত্রতা দেখে আবিসিনিয়া গ্রাসে প্রস্তুত হলেন। বাল্টিক সমুদ্রে জার্ম্মাণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নরওয়ে, সুইডেন ডেনমার্ক নাৎসী সূর্য্যের উপাসনা সুরু করল। ২১শে আগষ্ট মার্শাল দে বোনো মুসোলিনীর চিঠি পেলেন—ত্রিশক্তি-সম্মেলনে কোন কাজ হয়নি, জেনেভাতেও হবে না—সুতরাং মার্শাল যেন (যুদ্ধ করে) সমস্যার সমাধান করেন।

আবিসিনিয়া নিয়ে ইংল্যাণ্ডের কূটনৈতিক জগতে আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। একদিকে স্যামুয়েল হোরের মত তোষণনীতির সমর্থক দল, অন্যদিকে অ্যাণ্টনি ইডেনের মত জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে ইতালীর বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসী অসম্মানজনক আপোষ-বিরোধী দল, মধ্যপন্থী অষ্টেন চেম্বারলেন, চার্চ্চিল প্রমুখ সাবধানী রাজনৈতিক মহল যারা জার্ম্মাণীকে প্রধান শত্রু মনে করেন, ইতালীর মৈত্রী হারাতে প্রস্তুত নন, ইতালী-বিরোধী আন্দোলনে ইংল্যাণ্ডের নেতৃত্ব যাদের পছন্দ নয়, তবে ফ্রান্স স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করলে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে প্রতীকারে চেষ্টায় যাদের আপত্তি নেই। শেষোক্ত দলের ইচ্ছা বিরোধ এড়ানোর চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, তবে বিরোধ আরম্ভ হলে তার চরম সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এমন সমাধান হওয়া উচিত নয় যাতে আবিসিনিয়ার লাভ হয় না, মুসোলিনি হিটলারের সঙ্গে যোগ দেয় এবং আন্তর্জাতিকতার মর্য্যাদা বিনষ্ট হয়। লর্ড সেসিল প্রমুখ অনেকে এই সঙ্কটে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। যাই হোক জেনেভার সভায় ইডেন প্রথম থেকেই অর্থনৈতিক শাস্তির কথা উত্থাপন করেন, এমন কি ১০ই সেপ্টেম্বর এই মতের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও স্যামুয়েল হোর নিজে তা ১১ই সেপ্টেম্বর সমর্থন করেন। ইংল্যাণ্ডের ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বাহিনী সহজেই ইতালীয় সৈন্য যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারত, সুতরাং অনেকেই ইংল্যাণ্ডের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রতিবাদে প্রস্তুত হয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আবিসিনিয়া-অভিযান সুরু হয়। ১০ই অক্টোবর পঞ্চাশটি সার্বভৌম রাষ্ট্র মিলিতভাবে তার প্রতিকার গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়। চারদিকে আদর্শবাদের বন্যা বয়ে যায়। বেন্থাম-পরিচালিত ইংল্যাণ্ডের বৃহত্তম শ্রমিক-সংঘ তথা শ্রমিকদলের বড়ো একটি অংশ—লর্ডবেরির শান্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু বল্‌ডুইনকে চিনতে সকলেরই বাকী ছিল। স্বাধীন ভাবে যুদ্ধবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও তিনি ১৯৩৪-এর শেষাশেষি গৃহীত এবং ১৯৩৫-এর ২৭শে জুন প্রকাশিত শান্তি ভোটের ফলাফলের সুযোগ নিলেন। তার পক্ষে যারায় এমন অর্থ করা যায় যে ইংল্যাণ্ডের জনগণ অর্থনৈতিক অস্ত্রের প্রয়োগে সম্মত হলেও তাকে কার্যকরী করবার জন্য বাস্তব যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত নয়। ১৯৩৫-এর সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করে বল্‌ডুইন এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করলেন, যদিও তা জাতিসংঘের কভেনাণ্টের দশম ও ষোড়শ ধারা-বিরোধী। ইতিমধ্যে জাতিসংঘের শাসন কমিটি কতকগুলি হাস্যকর শাসনের অনুমোদন করলো যা আক্রমণাত্মক কার্যক্রম প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অক্ষম। সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বন্ধ করা হ'ল না। পেট্রোলিয়াম, যা আধুনিক যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বড়ো অস্ত্র—তার থেকে ইতালী বঞ্চিত হল না। সুয়েজ ত বন্ধ হলই না অথচ গণতান্ত্রিক শিবির পরিত্যাগ করে ইতালী জার্মাণীর দিকে হাত বাড়াল। ব্রিটিশ সরকার রাজকীয় নৌ-বহর আদৌ ব্যবহার করলেন না, যদিও তা সুয়েজ খাল বন্ধ করে দিতে পারতো, সম্মুখ যুদ্ধে ইতালীয় নৌ-শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারতো এবং ইতালীয় বন্দরগুলি অবরোধ করে ইতালীয় বাহিনীকে খাদ্যাভাবে ফেলতে পারতো।

বস্তুতঃ আবিসিনিয়া সঙ্কটে ইংল্যাণ্ড জাতিসংঘকে আপন চিরাচরিত বৈদেশিক নীতিরক্ষণের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সে নীতি হ'ল—ইউরোপে যে কোন অতিশক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বিরোধিতা। ইংল্যাণ্ড নির্বান্ধব অবস্থায় থাকবে না, অথচ কোন স্থায়ী মৈত্রীর ওপর তার বিশ্বাস নেই, সে চায় একাধিক এবং স্থিতিস্থাপক শক্তি সাম্যের ব্যবস্থা। ফ্রান্সের নীতি ঠিক

এর বিপরীত। সে চায় স্থায়ী মৈত্রীর মাধ্যমে ইউরোপীয় নিরাপত্তা। আর্থার সমরসজ্জা নিরাপত্তা-হানিকর, তাই সে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও লিটল আঁতাতের সঙ্গে চুক্তি করেছে। ইতালীর মনোভাব ভূমধ্যসাগরীয় নিরাপত্তা-বিরোধী, তাই ফ্রান্স তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে চায়। ইংল্যাণ্ডই তাকে বার বার এই কার্যে প্ররোচিত করেছে, সুতরাং ইংল্যাণ্ডের এই আকস্মিক জেহাদ্ ঘোষণায় বিচলিত হয়ে লাভাল ইতালীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা পাবেন এতে আশ্চর্য্য কি। ইংল্যাণ্ড বরাবরই জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মাধ্যম বলেই মনে করেছে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রবলে প্রয়োগ করার কথা ভাবেনি—তাই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে গেলে কায়ে রক্ষণশীল নেতাদের লাভালের যুক্তি বুঝতে দেরী হলনা। ১৯ই ডিসেম্বর হোর-লাভাল চুক্তি সম্পাদিত হ'ল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই সময় জাতিসংঘ পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে স্যাংসন স্থগী করতে প্রস্তুত হচ্ছিল এবং আমেরিকাও তাতে রাজী হয়েছিল।

ব্যাপারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতালীর মিত্র লাভাল ইতালীকে রক্ষা করলেন এবং হোর আলোচনা চালিয়ে পেট্রোলের বিষয় ধামাচাপা দিতে রাজী হলেন। ইংল্যাণ্ডের উপর চাপ দেবার জন্য লাভাল ফরাসী পত্রিকায় এই গোপন চুক্তির মর্ম ফাঁস করে দিলেন, ফলে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জগতে ও জনমতে এমন প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত হ'ল যে তা প্রশমনার্থ ১৮ই ডিসেম্বর বল্ডুইন চুক্তি অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। স্যামুয়েল হোরের স্থান নিলেন ইডেন। এই কুখ্যাত চুক্তি কার্যকরী হল না বটে, তবে জাতিসংঘের ওপর প্রায় সকলে বিশ্বাস হারালো। যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় প্রথম প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'ল।

মাঝখান থেকে, হিটলার লাভবান হলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং জাতিসংঘ যে কতখানি দুর্বল ও বিধাগ্রস্ত তিনি বুঝতে পারলেন, আরও বুঝলেন ইতালী তাঁর দলে আসবে। সুতরাং তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি প্রস্তুত হলেন। ১৯৩৬এর ৭ই মার্চ তারিখে সন্ধি অবমাননা করে জার্মাণ সৈন্য রাইনভূমিতে প্রবেশ করল। চার্চিলের স্মৃতিকথায় এই সঙ্কটের বর্ণনা নাই। লোকার্ণো সন্ধিতে স্বিকৃত সময়ের বহু পূর্বে ইংল্যাণ্ডের প্ররোচনায় ফ্রান্স রাইনভূমি ত্যাগ করেছিল এবং লোকার্ণো চুক্তির দ্বিতীয় ধারার ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত ছিল। বস্তুতঃ কেবল ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমান্ত নয়, লিটল আঁতাতের নিরাপত্তাও নির্ভর করছিল বেসামরিক রাইনভূমির ওপর। সে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় জাতিসংঘের কাছে ভার্সাই সন্ধির ৪২-৪৩ ধারামতে ফ্রান্স আবেদন জানালো, বেলজিয়ম ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন ইংল্যাণ্ডের কাছে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মনোভাব জানতেন হিটলার। তাই ঐদিনই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করবার জন্য তিনি ২৫ বছরের অনাক্রমণ-চুক্তির প্রস্তাব আনলেন।

যুদ্ধে অনিচ্ছুক ইংল্যাণ্ড সাগ্রহে এই সুযোগ আঁকড়ে ধরল। লয়েড জর্জ, ষোড়েনের মত রাজনীতিবিদ্ বলেন, হিটলারের বারংবার উপস্থাপিত শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ না করার ফলেই সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে। লর্ড লোথিয়ান বলেন—আর্থাণরা তাদের খিড়কীর বাগানে ঢুকছে। ধনিক শ্রেণী বলে, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি সঙ্কটের জন্য দায়ী। ১১ই মার্চ থেকে শুধু কূটনৈতিক সাহায্যের জন্য বারংবার প্রার্থনা করেও ফ্রাঁদিন বন্ড্ইন বা চেম্বারলেনকে টলাতে পারেন নি, এমন কি ফরাসী সেনাপতিরা রাইন রক্ষার অবাস্তবতা বলেন। অথচ সবাই জানতো যে, প্রত্যাক্রমণ সুরু হলেই পশ্চাদপসরণ করার আদেশ আর্থাণ সৈন্যবাহিনী পেয়েছে। ফ্রাঁদিনের ভাষায় বন্ড্ইন সব জেনেও বলেন—যুদ্ধের সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগ থাকলেও তিনি ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধে নামাতে পারেন না—কারণ ইংল্যাণ্ড প্রস্তুত নয়। অবশ্য ফ্রাঁদিন কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান। তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই ইংল্যাণ্ডের মতিগতি দেখে স্বস্তি বোধ করেছিলেন, লিটভিনফ লণ্ডন-সম্মিলনীতে ফ্রাঁদিনের পক্ষ সমর্থন করে তাঁর বিপদ আরো বাড়িয়ে দেন। যাই হোক্, ইংল্যাণ্ডের যত দোষই থাক্, ফ্রান্সকে নির্দোষ বলা সম্ভব নয়। ফ্রাঁদিনের নীতি অসমর্থনীয়। তাঁর উচিত ছিল রাইনভূমিতে বাধা দেওয়া, তাতে যুদ্ধ হলেও ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হোত। ক্লেমাঁসো বা পোঁয়াকারে তাই করতেন, কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তেন না। রাইন অধিকারের ফল হ'ল মারাত্মক। ফরাসী-আর্থাণ সীমান্ত একশ মাইলেরও বেশী এগিয়ে এল, তথাকথিত দুর্ধর্ষ মাজিনোরেখা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষে এই ক্ষতি ভয়াবহ। দ্বিতীয়তঃ লিটল আঁতাতের ভরসা নিখিল হ'ল এবং হিটলারের প্রকৃত শক্তিবৃদ্ধি হ'ল। বেলজিয়াম লোকার্নো-চুক্তির বাধিত পালনে অস্বীকৃতি হ'ল। অথচ মহাপ্রাচ্যে এর সুফল-সম্বন্ধে কতবার চার্চিল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। লীগ কাউন্সিলের ১৯ মার্চের প্রস্তাবের উত্তরে হিটলার যে প্রস্তাব পাঠালেন তাতে রাইনভূমি সুরক্ষিত করার বিষয়ে উল্লেখ ছিল না। ফ্রান্স জানতো যে আর্থাণরা দুর্গাদি নির্মাণ করে রাইন সুরক্ষিত করেছে। তাদের প্রতিবাদ প্রশমিত করার জন্য ইংল্যাণ্ড বোঝাপড়ার ভার নেয়, অর্থাৎ সিগ্ফ্রিড রেখা নিরঙ্কুশভাবে গড়ে চলে আর্থাণী।

ইতিমধ্যে মঁত্রো সম্মেলনের সময় ইঙ্গ-আর্থাণ নৌ-চুক্তির খাতিরে আর্থাণ-দাবী আরেকবার মেনে নেয় ইংল্যাণ্ড। তথাপি ইতালী বা আর্থাণী খুসী হয় নি। অষ্ট্রিয়া নিয়ে উভয়ে এক মিটমাট হয়ে যায় এবং বোম-বার্লিন অক্ষশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৬এর ১৭ই জুলাই স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং স্পেনের অসহায় নর-নারীর ওপর বর্বর বোমাবর্ষণের মধ্যে অক্ষশক্তির প্রথম মৈত্রী পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স গোড়ার থেকে ব্যাপারটাকে স্পেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলে গ্রহণ করে এবং মঃ ব্লুঁর নেতৃত্বে কোন পক্ষই হস্তক্ষেপ করবে না স্থির হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি রাষ্ট্র এতে সাগ্রহে রাজী হয়, এমন কি জার্মাণী ও ইতালী এর নীতি স্বীকার করে। কিন্তু তারা ফ্রাঙ্কো-বিদ্রোহের পরিকল্পনা আগে থেকে জানতো এবং আশা করেছিল তা সহজেই সাফল্য লাভ করবে। স্পেন সরকার যখন বল প্রয়োগে আক্রমণ ঠেকাল তখন ফ্রাঙ্কোর মিত্রবর্গ স্থির করলে যে, কিছুতেই তাকে রসদ বা অস্ত্র পেতে দেওয়া হবে না। ভিতরে ভিতরে তারা নিজেরা অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র বিশেষতঃ বোমারু দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। রাশিয়া লণ্ডন কমিটিতে বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোন ফল না পেয়ে অক্টোবরের শেষে এমন একতরফা চুক্তি মানতে অস্বীকার করে এবং মাদ্রিদ সরকারকে সাহায্য পাঠাতে আরম্ভ করে। এক্ষেত্রে রাশিয়া সাম্যবাদের প্রসার চাইছিল এমন ধারণা ভুল। স্তালিনের হাতে রুশ বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া মাদ্রিদ সরকার নির্জলা মার্ক্সবাদী ছিল না, বাকুনিনের প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। রাশিয়া চেয়েছিল ফাসিবাদের প্রসার ও শক্তিসঞ্চয় বন্ধ করতে। অপর পক্ষে ফ্রাঙ্কোর পশ্চাতে ছিল বিরাট ধনী জুয়ান মার্চ্চ ও নানা প্রতিক্রিয়াশীল দল। হিটলার চেয়েছিলেন স্পেন সীমান্ত সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ফ্রান্স যেন দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হয়ে থাকে; জার্মাণীর অনুকূল নীতি নিতে বাধ্য হয়। মুসোলিনি চেয়েছিলেন পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে বেলেরিক ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের শক্তি খর্ব্ব করতে, ব্রিটেনকে দুর্ব্বল করতে এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে সৈন্য আমদানী বন্ধ করতে। সুতরাং স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রথম দিকে দুই আদর্শের সংঘর্ষ ছিল না। হিটলার-মুসোলিনি তারস্বরে সাম্যবাদের বিপক্ষে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি আবিষ্ট করে রেখেছিলেন মাত্র। ১৮ই নভেম্বর থেকে জার্মাণী ও ইতালী স্বেচ্ছাসেবীর ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠাতে সুরু করে এবং ১৯৩৭এর ২০শে ফেব্রুয়ারী যখন ফ্রাঙ্কোর প্রয়োজন মিটল, তখন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী পাঠানো বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে চেম্বারলেন ও ইডেনের মতবিরোধ দেখা দিল। ১৯৩৭এর জুলাই মাসে কাউণ্ট গ্রাণ্ডিকে ডেকে চেম্বারলেন মুসোলিনির নিকট ব্যক্তিগত আবেদন পেশ করলেন। চিয়ানোর রোজনামচায় (Ciano's Diary) কূটনৈতিক দলিল-পত্রে (Ciano's Diplomatic Papers) এই সময়কার ঘটনাগুলির বিবরণ মেলে। চেম্বারলেন আবিসিনিয়া দিয়ে ইতালীকে জার্মাণীর পক্ষ থেকে এবং উপনিবেশ দিয়ে হিটলারকে ইতালীর পক্ষ থেকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। ইডেন তা সম্ভব ভাবেননি। তাঁর মতে ভূমধ্যসাগরের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে কাজ করা উচিত এবং সমস্ত সমস্যাগুলি একসঙ্গে আলোচনা করা বিধেয়; তাছাড়া দরাদরির সুবিধার জন্য আবিসিনিয়ার ব্যাপারটা

হাতে রাখা উচিত; সর্বোপরি এত দুর্বল সময়সজ্জা নিয়ে একনায়কদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা বিপজ্জনক, তা হোলেও স্পেনের গৃহযুদ্ধে অক্ষশক্তির যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করা কর্তব্য। যখন ইতালীয় ডুবোজাহাজ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজের উপর হানা দিতে সুরু করল তখন ইডেনের মনোভাব কঠোরতর হ'ল। ১৯৩৭এর ১০ই সেপ্টেম্বর নিয়ঁ সম্মিলনীতে এই মনোভাবের ফল ফলল। ইতালীয় ডুবোজাহাজ অনধিকারের অপরাধে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এবং ভূমধ্যসাগরের স্পেনসন্নিহিত অংশ সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর পাহারা দেবে স্থির হওয়ায় ইতালী ডুবোজাহাজ সরিয়ে নেয়।

ইডেনের নীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য। এবারও তিনি বাইন-সঙ্কটের মত ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক আলোচনা চাইলেন এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে রুশ মৈত্রী স্থাপনে ব্যগ্র হলেন।

চেম্বারলেনের তা ভাল লাগেনি। নিউরাথ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, জার্মাণী ও জাপান কমিন্টার্ণ-বিরোধী দল গঠন করেছে। ১৯৩৪এর ২১শে মে বক্তৃতার মত এ ঘোষণাও ইঙ্গ-ফরাসী তোষণনীতিবাদীদের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দিল। ৬ই নভেম্বর ইতালীও যখন তাতে যোগ দিলে চেম্বারলেন মুসোলিনির সব দোষ ক্ষমা করতে প্রস্তুত হলেন। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে চল্লিশ সহস্র ইতালীয় সৈন্যের উপস্থিতি তিনি ভুলে গেলেন। ফ্রাঙ্কোর গোরিং কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে জার্মাণী গেলেন। নানা উপায়ে পররাষ্ট্র-সচিব ইডেনকে একঘরে করে ফেলা গেল। নৌ-বিমান-স্থলবাহিনীর কর্তারাও তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন। তাঁদের মতে রুশ সৈন্যবাহিনীর অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং তাদের সঙ্গে সামরিক আলোচনার অর্থ নেই। এদিকে জার্মাণীর ব্যাপক সমর-সজ্জায় তাঁদের স্নায়ু বিকল হয়ে গিয়েছিল। এই অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের আশঙ্কা চেম্বারলেনের মিউনিখ নীতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৩৮এর ১১ই জানুয়ারী রুজভেল্ট গোপনে চেম্বারলেনকে জানালেন—আন্তর্জাতিক অবস্থার দৈনন্দিন অবনতিতে তিনি চিন্তিত এবং ওয়াশিংটনে সর্বশক্তির বৈঠক আহ্বান করে বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থা করতে চান। ইংল্যাণ্ডের আপত্তি না থাকলে তিনি ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মাণীকে আহ্বান করতেন এবং আমেরিকার দৃঢ় হস্তক্ষেপে ইউরোপীয় পরিস্থিতি কি আকার ধারণ করত বলা যায় না। আমেরিকার ব্রিটীশ দূত রোনাল্ড লিণ্ডসে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর খাতিরে প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। ইডেন সে সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলেন না। তাঁকে না জানিয়ে চেম্বারলেন নিজেই উত্তরে জানালেন—যেহেতু তিনি স্বয়ং জার্মাণী ও ইতালীর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন সেহেতু আমেরিকার হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। ভবিষ্যৎ সম্প্রীতির

প্রতিশ্রুতি পেলে আবিসিনিয়ার অধিকার স্বীকার করে নিতে ইংল্যাণ্ড রাজী আছে। ইতিমধ্যে ইডেন ফিরে এসে চেম্বারলেনের রূঢ় প্রত্যাখ্যানে খানিকটা ভদ্রতা ও শোভনতার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্রপতি জানালেন-আবিসিনিয়া-বিষয় স্বীকার করে নেওয়া অনুচিত হবে। সুদূরপ্রাচ্যে জাপানী পররাষ্ট্র-নীতির ওপর তার ফল ভাল হবে না। কর্ডেল হালের স্মৃতি কথায় সমস্ত ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি নিজেও জানিয়েছিলেন আমেরিকার জনমত কখনও এই নতি স্বীকার সুনজরে দেখবে না। সবাই ভাববে ইংল্যাণ্ড আগুনের মধ্যে হাত ইজ্জা বাদাম ফেলতে পারে। আমেরিকার কি দায় পড়েছে তা বের করবার? আশ্চর্য্যের বিষয় ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ্চের বক্তৃতায় স্তালিন ঠিক একই মন্তব্য করেছিলেন! চেম্বারলেন ভয় পেলেন আমেরিকার হস্তক্ষেপে ডিক্টেটররা বিরক্ত হবে, শান্তির কোন আশাই থাকবে না; ইডেন ভাবলেন আমেরিকার সহযোগিতা বহুমূল্যবান, কোন ঝুঁকিই তার জন্য যথেষ্ট নয়। কিংসলি মার্টিন তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত চেম্বারলেন-জীবনীতে উভয় পক্ষের বিরোধ চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন। এর একমাত্র উপসংহার—ইডেনের পদত্যাগ। তার বেশী দেরী ছিল না। অষ্ট্রিয়ার সঙ্কট উপস্থিত হলে ১৯৩৮এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী কাউণ্ট গ্রাণ্ডিকে ইতালীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলা হোল। মুসোলিনি এই সুযোগে ক্রমবর্দ্ধমান জার্মাণপ্রভাব এড়াবার চেষ্টা পেলেন। কিন্তু ইডেন বল্লেন ইতালী তার সদিচ্ছা প্রমাণ করুক, আগে তার কাজ দেখে তবে তার সঙ্গে আলোচনা করবার কথা ভাবা উচিত। স্পেনের ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্বন্ধে গ্রাণ্ডিকে প্রশ্ন করা হোল। তিনি সে বিষয়ে নিরুত্তর রইলেন তবে রোমে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করতে সম্মত হলেন। চেম্বারলেন সাগ্রহে সম্মতি দেওয়ায় ইডেন পদত্যাগ করলেন। এ ঘটনায় ইতালীয় নীতির জয় ঘোষিত হ'ল। আলোবকামীর রাজা হ্যালিফ্যাক্স পররাষ্ট্র-সচিব হলেন।

• • • •

অষ্ট্রিয়া হিটলারের জন্মভূমি, বৃহত্তর জার্মাণীর স্বপ্নকেন্দ্র, মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের পাদপীঠ। ১৯৩৬এর জুলাই থেকে হিটলার অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা-হরণের দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৈরী করছিলেন, ১৯৩৭ এর ৫ই নভেম্বর সেনাপতিমণ্ডলীর সম্মুখে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ব্লমবার্গ ও ফ্রিৎস একে উন্মত্ততা মনে করে দৃঢ় প্রতিবাদ জানালে হিটলার উভয়কে পদচ্যুত করেন এবং নিজেই জার্মাণ সৈন্য-বাহিনীর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর চোখে অষ্ট্রিয়ার ভাবগত মূল্যই কেবল প্রকট হয় নি, তিনি বুঝেছিলেন অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের প্রবেশ ঘাঁটি। ডলফাস হত্যার পর পাপেনের চক্রান্তে অষ্ট্রিয়ার শাসক-শ্রেণী প্রতিরোধের আত্মিক বল হারিয়েছিল। লিপক্রিড রেখা ফ্রান্সের আক্রমণ ঠেকাতে

বটেই, মুসোলিনি আর্য্যাণ শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত, ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষ দুর্বল ও বিশৃঙ্খল—সুতরাং ১২ই ফেব্রুয়ারী নির্ভয়ে হিটলার সুসনিগকে আহ্বান করলেন, তাঁকে ভয় দেখিয়ে অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হ'ল। সুসনিগের আত্মকথায় (Ein Requiem in Rot-weiss Rot) এই সংবাদের দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। শ্যুসেনবার্গ বিচারের দলিলপত্রের অন্তর্ভুক্ত গোডুলের রোজনামচায় তার সমর্থন মেলে। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী নেতাকে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হ'ল, নাৎসী দলকে আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করা হ'ল। ২০শে ফেব্রুয়ারী রাইখষ্ট্যাগের বক্তৃতায় হিটলার এজন্য সুসনিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রতিবেশী মাত্র ১ কোটী জার্ম্মাণ অধিবাসীরা কি অবর্ণনীয় কষ্ট পাচ্ছে তার চিত্র অঙ্কণ করে জার্ম্মাণীর জন্য যথেষ্ট থাকবার জায়গা চাইলেন। পরের দিন ইডেনের পদত্যাগসংক্রান্ত বিতর্কে পার্লামেন্টের বিভিন্ন দল তোষণনীতির প্রতিবাদ জানালো। চার্চ্চিল ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এবার চেকোস্লোভাকিয়ার পালা আসছে। এদিকে অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ চুক্তির সমর্থন কামনায় সুসনিগ গণভোট গ্রহণ করতে চাইলেন। মুসোলিনির সাবধানবাণী উপেক্ষা করে ১৩ই মার্চ্চ গণভোটের দিন স্থির হ'ল। ১১ই মার্চ্চ সুসনিগ খবর পেলেন জার্ম্মাণবাহিনী অষ্ট্রিয়া অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছে। টেলিফোনে গোরিং এক ঘণ্টার মধ্যে গণভোট প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন। হতভাগ্য সুসনিগ তাতে রাজী হলেন। তা সত্ত্বেও গোরিং-এর আদেশ এল তাঁকে পদত্যাগ করে সেইস-ইনকার্টকে চ্যান্সেলার ঘোষণা করতে হবে। আক্রমণের অনিবার্য্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি এতে রাজী হলেন না। ফলে জার্ম্মাণ বাহিনী অষ্ট্রিয়া প্রবেশ করল, শ্যুসেনবার্গের স্মৃতিপত্রে দেখা গেছে মুসোলিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার পর চেকোস্লোভাকিয়া—টিউটন বন্যা আবার ইউরোপ প্লাবিত করতে লাগল। ভার্সাই সন্ধির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ১২ই মার্চ্চের পর নিরাপত্তা হারালো। ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকলে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না এমন প্রতিশ্রুতি হিটলার ১৯৩৫ সালে দিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কো-চেক চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজী হয়না চেকরা। ১৯৩৮ সালে চেকদের বলা হয় এ বিষয়ে তৎপর হোতে, কারণ এমন কতকগুলি ঘটনা আসন্ন যাতে ভবিষ্যতে রাজী হওয়া না হওয়ার কোন মূল্য থাকবে না। এই সময় বেনেশ খবর পান রাশিয়ার ট্রটস্কিপন্থী ওল্ডগার্ড কম্যুনিষ্টদল ও তুখাচেভ্স্কি-প্রমুখ সেনাপতি স্তালিন শাসনের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, প্রাগ তার অন্যতম কেন্দ্র, তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে জানান—এবং অনুসন্ধানের ফলে ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয়, তার ভিত্তিতে ১৯৩৭ ও ৩৮ এ মস্কো বিচার অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ঘটনার ফলে রাশিয়ায় নাৎসী বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয় এবং চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি

স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হন। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর চেকদের বিপদ আসন্ন বুঝে রুশ বৈদেশিক নীতি চেক-পক্ষ অবলম্বন করে এবং লিটভিনফ ফরাসী দূতের সঙ্গে দেখা করে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি সূত্রে সামরিক আলোচনার আশু প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ১৩ই মার্চ্চ মঃ ব্লুঁ চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি ফ্রান্সের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন, তার দুদিন আগে গোরিংও চেকদের আশ্বাস দেন।

ইংল্যাণ্ডে অবশ্য রুশ-উৎসাহের ঢেউ লাগেনি। চার্চ্চিল রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু বনের কাছে লেখা এক চিঠিতে (২০শে মার্চ্চ) চেম্বারলেন তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড কিছুতেই তার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেনা। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের সমর-নায়কদের মতে মস্কো-বিচারের পর রুশ সেনাপতিমণ্ডলী বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য রাশিয়া হারিয়েছে। পরবর্ত্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি, এই সময় রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলে হিটলার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হতেন। ঠিক এক বৎসর পরে পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে চেম্বারলেনের বাধেনি অথচ পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সংস্থান বেশী অনুকূল ছিলনা। এই এক বৎসর সময় নষ্ট হয়েছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ৩৬ ডিভিসন সুশিক্ষিত সৈন্য ও অজস্র সমর-সম্ভার নষ্ট হয়েছে, বোহেমিয়ার দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ-মালা ও স্কোডার বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা শত্রুহস্তগত হয়েছে। চেক-বিমানবাহিনীও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ফলে পশ্চিম ফ্রান্স অধিকতরবিপন্ন হয়েছে, লিটল আঁতাতের রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক জীবন প্রায় সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর কবলে পড়েছে। হাঙ্গারীর শতকরা ৪৩ ভাগ, যুগোস্লাভিয়ার শতকরা ৪৪ ভাগ এবং রুমানিয়ার শতকরা ৩৩ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য জার্ম্মাণীর হস্তগত হয়েছে। তবু ২৪ মার্চ্চের বক্তৃতায় চেম্বারলেন বল্লেন ইউরোপীয় শক্তির খাতিরে কিছুতেই তিনি ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রী স্থাপন করতে পারেন না, কারণ "that would be to aggravate the tendencey towards the establishment of exclusive groups of nations." একের পর এক শত্রু-কবলিত হওয়াই কি তা হলে শান্তির অহিত পন্থা? আসলে চেম্বারলেনের কার্য্যক্রম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তিনি বার্লিন ও প্রাগের ওপর যুগপৎ চাপ দেবেন, ইতালীকে তুষ্ট রাখবেন এবং ফ্রান্সের দায়বোগিতার সীমা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন।

মুসোলিনির সঙ্গে বোঝাপড়ার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। চেম্বারলেন এবং তাঁর দলীয় লোকেরা ফ্রাঙ্কোর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। অথচ ইতালীর সাহায্যে ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করুক এও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির অভিপ্রেত

নয়। সুতরাং ১৬ই এপ্রিল ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি সম্পাদন করে ইতালীকে ঠাণ্ডা করা হোল। ইতালী গৃহযুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সরিয়ে আনবে এবং এখন থেকে আর সাহায্য পাঠাবে না এই চুক্তিতে ইংল্যাণ্ড আবিসিনিয়া অধিকার মেনে নিতে সম্মত হোল। রক্ষণশীল সমিতির জাতীয় সম্মিলনীতে চেম্বারলেন জানালেন, হিটলারের সঙ্গেও তিনি অনুরূপ চুক্তি করতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয় মাদ্রিদ সরকারের এবং বার্সিলোনার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে ফ্রাঙ্কো-অভিযানের গতি রুদ্ধ হল এবং মুসোলিনি সদ্যসম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে আবার সৈন্য ও রসদ পাঠালেন। ইংল্যাণ্ড স্পেন-সম্বন্ধীয় সর্তের ওপর জোর দিতে লাগল কিন্তু ইতালী ও জার্মাণীর মধ্যে বিরোধ বাধাবার আশা শীঘ্রই ব্যর্থ হল। মে'তে হিটলার ইতালীতে আমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত হলেন। ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট সরকার থোরেজ অনুপ্রেরণায় মাদ্রিদ সরকারের সাহায্যার্থ পিরিনিজ সিরিয়ন্ত্র খুলে দিয়েছিল। ইতালী ও জার্মাণীর যৌথ আপত্তিতে ইংল্যাণ্ড আবার বিচলিত হ'ল এবং ফ্রান্সের ওপর চাপ দিয়ে ১৩ই জুন মাদ্রিদের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিলে।

১০ই এপ্রিল ব্লুঁর পতন হ'ল এবং দালাদিয়ের প্রধানমন্ত্রী ও বনে পররাষ্ট্র সচিব হলেন। মিউনিখ সঙ্কটের বিস্তৃত বিবরণ বনের De Washington au Quai d'Orsay নামক গ্রন্থে মেলে। তাতে দেখি ১৯৩৭এর জুন থেকে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ সম্বন্ধে হিটলার তৈরী হচ্ছিলেন। ১৯৩৮এর ১২ই মার্চ্চ পোরিং আশ্বাস দেবার ঠিক পরে ২৪শে এপ্রিল কার্লসবাড বক্তৃতায় সুদেতেন নেতা হেনলিন্ সুদেতেন দাবী উত্থাপন করেন। ১০ই মে হেনলিন্ লণ্ডনে এলেন এবং চেম্বারলেনের সহানুভূতি লাভ করেন। ১৭ই মে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের অনুরোধে চেক সরকার ও হেনলিনের আলোচনা সুরু হয়। সুদেতেনদের অভিযোগ যে গৌণ এবং চেকোস্লোভাকিয়া অধিকারই যে মুখ্য উদ্দেশ্য তার প্রমাণ ২৮ মে জার্মাণ সেনাপতিমণ্ডলীকে চেক-অভিযান পরিকল্পনা তৈরী করার আদেশ দেওয়া হোল। তারা চেক শক্তি স্মরণ করে আপত্তি জানালেন। ১২ই জুন দালাদিয়ের চেক সরকারকে ফরাসী প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আশ্বস্ত করেন বটে, ইংল্যাণ্ডের মতিগতি দেখে নিজে আশ্বস্ত হলেন না। ১৮ই জুলাই ইংল্যাণ্ডের নীতি বিধাগ্রস্ত করবার অভিপ্রায়ে হিটলারের অনুচর ক্যাপ্টেন ফিস্ড্যান্ হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই সূত্রে চেম্বারলেন মধ্যস্থতার প্রস্তাব আনলেন। লর্ড রাসিম্যানকে এই সৌজন্যের ভার দিয়ে তবু আগষ্ট প্রাগ পাঠানো হ'ল। চেক সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আলোচনায় বিশেষ লাভ হ'ল না। চার্চ্চিল হ্যালিফ্যাক্সকে লিখলেন, আলোচনা ব্যর্থ হ'লে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় এক ঘোষণা প্রচার করতে, যাতে আক্রমণকারী বুঝবে চেক

স্বাধীনতা রক্ষায় ত্রিশক্তি বদ্ধপরিকর। ২রা সেপ্টেম্বর রাজদূত মেইস্কি চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেন। সেই আলোচনার মূলে হ্যালিফ্যাক্সকে পত্র লেখা হয়। তা থেকে জানা যায় লিটভিনফ্ ফরাসী দূতকে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে ফরাসীরা চেক-চুক্তি পালন করলে রাশিয়া নিশ্চয়ই আপন কর্তব্য পালন করবে। যদি রুমানিয়া রুশ সৈন্য গমনাগমনের পথে বাধা দেয় তবে জাতিসংঘের মাধ্যমে জার্মাণীকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করা হবে, তখন ভেনান্ট মতে সভ্যরাষ্ট্রের কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হবে রুমানিয়া। এই জন্য অবিলম্বে লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে রুশ-ফরাসী সামরিক আলোচনা আরম্ভ হোক। ত্রিশক্তি-ঘোষণার মূলা অবিসংবাদিত, তাতে আমেরিকার নৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য হ্যালিফ্যাক্স এতে সম্মত হলেন না। বরং টাইমস পত্রিকায় চেক-সীমান্তবর্তী সমস্ত সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত ভূভাগ ছেড়ে দিতে উপদেশ দেওয়া হোল। ১০ই সেপ্টেম্বর বনে ইংরেজ দূতের কাছে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণে ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলেন। ১২ই তিনি উত্তর পেলেন—ইংল্যাণ্ড কখনই ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না, তবে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বা তা অবলম্বনের সময় সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া চলে না, কারণ ভবিষ্যৎ দুর্জ্ঞেয়। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাহায্যার্থ কি দিতে পারে? হ্যালিফ্যাক্স জানালেন যুদ্ধের প্রথম ছ মাসে ছ ডিভিশন সৈন্য ও ১৫০টি যুদ্ধবিমান। বনে ঠিক এই উত্তর আশা করছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই সঙ্কটে চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষ ত্যাগ করতে। ইংল্যাণ্ডের উত্তর তাঁকে আত্মদোষ-ক্ষালনে সাহায্য করল। ১২ই সেপ্টেম্বর ন্যুরেমবার্গ নাৎসী সম্মেলনে হিটলার চেকদের ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলেন এবং ১৪ই হেনলিন-বেনেস আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। ১৫ই হেনলিন জার্মাণী পালালেন। ১৬ই দালাদিয়ের চেম্বারলেনকে জানালেন, হিটলারের নিকট ব্যক্তিগত আবেদন জানানো উচিত। চেম্বারলেন নিজেও উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং ১৫ই হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি মিউনিখ যাত্রা করেন। চেক-ভাগ্যে এর চেয়ে সর্বনাশা ঘটনা কিছু ঘটতো না। নেতৃহীন সুদেতেনরা বেনেসের উদার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন-পরিকল্পনা মেনে নিতে বাধ্য হোত শেষ পর্যন্ত। এখন চেম্বারলেনের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা দাবী ব্যাপকতর করল মাত্র। হাস্সিনানও বুঝেছিলেন, জার্মাণরা সুদেতেন সমস্যার সমাধান চায় না। নির্বোধ চেম্বারলেন একেবারে তাদের ফাঁদে ধরা পড়লেন। হেনলিন জার্মাণ-সুদেতেন মিলন দাবী করল। ১৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন ফিরে হাস্সিম্যানের কাছে চেম্বারলেন শুনলেন, সুদেতেন এলাকা দিয়ে দেওয়া ছাড়া যুদ্ধ এড়াবার উপায় নাই। মিউনিখ আলোচনার প্রধানমন্ত্রীরও সেই ধারণা হয়েছিল। অন্যান্য

মন্ত্রীরা ফ্রান্স যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয় এই অজুহাতে এমন ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। অনেকে আবার সুদেতেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া উচিত, আর্থাৎ সংখ্যালঘুদের বাঁচানো উচিত এবংবিধ মন্তব্য করলেন। ১৮ই সালাদিয়ের-বনে লণ্ডন এলেন—একেবারে চেক ভূমিভাগের খসড়া নিয়ে। গণভোটের প্রশ্ন তুলে তাঁরা কথেন, গ্রোচাক প্রকৃতি সংখ্যালঘুদের খোঁচাতে চাইলেন না বটে, তবে সুদেতেন এলাকা সমস্তটাই দেওয়া হোক এমন প্রস্তাব আনলেন। এই অঙ্গহীন চেক-রাষ্ট্রের নূতন সীমান্ত রক্ষার্থ ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ প্রতিভূতি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। অথচ এই অমানুষিক আলোচনার আদ্যোপান্ত কল প্রতিনিধিকে একবারও ডাকা হয় নি এবং রাশিয়ার মত জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

বনে তাঁর জীবনীতে সমস্ত দোষটাই ইংল্যাণ্ডের ওপর চাপিয়ে দেন বটে তবে তাঁর যুক্তির মধ্যে বহু পরস্পরবিরোধী উক্তি রয়েছে। যথা—(১) একবার তিনি বলছেন যুদ্ধে নামবার শক্তি নেই ফ্রান্সের, আবার ফ্রান্স মিত্রপক্ষ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে, তারাই ফ্রান্সকে যুদ্ধে নামতে দেয় নি। (২) মিউনিখ-চুক্তির ফলে হিটলারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হবার সময় পাওয়া গেল, পরে মিউনিখ-চুক্তি ডার্সাই-সন্ধির প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত সংশোধন। (৩) ভৌগোলিক কারণে ফ্রান্স চেকদের সাহায্য করতে অসমর্থ, পরে মিউনিখ চুক্তি চেকদের বাঁচালো, তাছাড়া যুদ্ধবিরোধী আদর্শবাদের বড়ো বড়ো বুলি এবং মানব-সভ্যতার ঐতিহ্য সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বক্তৃতা। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করতে রাজী, যদিও তার পরিমাণ হাস্যকর; অথচ পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রযুথের নিরাপত্তা, যার সঙ্গে ফ্রান্সের নিরাপত্তা জড়িত, রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু ফ্রান্সের উচিত ছিল ইংল্যাণ্ডের জন্য অপেক্ষা না করে আপন চুক্তির সম্মানরক্ষার্থ চেকদের জন্য যুদ্ধ করা, তাহলে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধে নামতে বাধ্য হোতো। তাছাড়া ফ্রান্সের উচিত ছিল লিটল অ্যাঁতাঁতের ওপর চাপ দিয়ে রুশ সৈন্য চলাচলের ব্যবস্থা আদায় করা। উল্টে ফ্রান্স তাদের দৃষ্টতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। আসলে বনের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, যে কোন মূল্যে শান্তিরক্ষা। এমন শোচনীয়ভাবেই ফ্রান্স তার মহান্ আদর্শ এবং গণতন্ত্র তার মূল্যবান্ নীতি বিসর্জন দিয়েছিল। বেনেসের আত্মগত্যের এই কি সম্মানজনক প্রতিদান?

১৯এ সেপ্টেম্বর চেক-সরকারকে যুক্ত প্রস্তাব দেওয়া হোল এবং ২০শে গভীর রাত্রে বেনেসকে বিছানা থেকে তুলে জানানো হোল, প্রস্তাব গ্রহণ না করলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভবিষ্যতের কোন দায়িত্ব নেবেনা। উপর্যুক্ত অবস্থায় মিত্র-পরিত্যক্ত চেক রাষ্ট্র নিরুপায় হয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করল। বনের নিম্নোক্ত মন্তব্য স্মরণীয়। বেনেস যদি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেন তবে নাকি ফ্রান্স চুক্তির মর্যাদারক্ষার্থ সাহায্য করতো, কিন্তু বেনেস স্বেচ্ছায়

গ্রহণ করলে ফ্রান্স নাচার। একেই কি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা বলে? বনের আত্মপ্রতারণা আকাশচুম্বী।

২১শে জাতিসংঘের সভায় লিটভিনফ এক আশাময়ী বক্তৃতা দেন। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর বৌথ নিরাপত্তা রক্ষার্থে রাশিয়া কি করেছে তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন—ফ্রান্স রাশিয়ার অভিপ্রায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, রুশ সমর-বিভাগ আলোচনার জন্য প্রস্তুত, চেক সরকারকেও তিনি রুশ-প্রতিশ্রুতি পুনর্জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু রুমানিয়াও হাঙ্গেরীর আপত্তির অজুহাতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স রুশ অস্বীকার অগ্রাহ্য করেছে। অথচ বুখারেষ্ট ও বুদাপেষ্টের অনেক দূর দিয়ে রুশ সৈন্য চেক সাহায্যার্থ আসতে পারতো।

চেক সম্মতি নিয়ে ২২শে সেপ্টেম্বর চেম্বারলেন গোডেসবার্গ গেলেন এবং দেখলেন জার্মাণ ক্ষুধা অত সহজে মেটে না। ২৩শে জার্মাণী এক নূতন প্রস্তাব দাখিল করলো যা অনেক বেশী ব্যাপক এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিল এক চরম পত্র। চেম্বারলেনের আপত্তির উত্তরে হিটলার আবদার করলেন—এই তাঁর রাজ্যলিপ্সার শেষ পরিচয়। সুদেতেন-সমস্যা মিটে গেলে ধীরে সুস্থে বাকী ইঙ্গ-জার্মাণি সমস্যা, যথা উপনিবেশ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। চেম্বারলেন ফিরে আসার পর ইঙ্গ-ফরাসী মনোভাব কঠোরতর হ'ল। ফ্রান্স আংশিক সমর-সজ্জার আদেশ দিল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বনে আসন্ন দায়িত্ব প্রতিপালনে প্রস্তুত হোল। ২৪শে চেম্বারলেন অনুচর স্যার হোরেস উইলসনকে হিটলারের শেষ কথা জানবার জন্য পাঠালেন। তিনি জেনে এলেন ২৮শে রাত্রি ২ টার মধ্যে উত্তর না পেলে ১লা অক্টোবর অভিযান সুরু হবে। ঐদিন অপরাহ্নে চার্চিল, চেম্বারলেন, হ্যালিফ্যাক্সের সম্মেলনে স্থির হোলো ব্রিটেন ফ্রান্স ও রাশিয়া হিটলারের বিরুদ্ধে এক যৌথ ঘোষণা প্রচার করবে, সেই মর্ম্মে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হোল। দক্ষিণপন্থী ফরাসী সংবাদপত্র তা ভাল বলে উড়িয়ে দিলে বনের ইঙ্গিতে। অবশেষে ২৮শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ নৌবহর সমর-সজ্জার আদেশ পেল।

জার্মাণ সেনাপতিমণ্ডলী এই ব্যাপারটী সুনজরে দেখেনি। তখনো তাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি এবং দুই ফ্রন্টে যুদ্ধের ভয় প্রবল। গোপনে ষড়যন্ত্র চললো হিটলারকে বন্দী করে জার্মাণীতে সাময়িক ডিক্টেটারসিপ প্রবর্ত্তন করা হবে। যেদিন এই ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী করার কথা—সেই দিন চেম্বারলেন মুনিখ এলেন এবং হিটলারের ধারা চতুর্থবারের মত টিকে গেল। তথাপি ২৮শে কয়েকজন সেনাপতি যুদ্ধদপ্তরে এক প্রতিবাদমূলক স্মারকলিপি রেখে এল। অ্যাডমিরাল রেডার ব্রিটীশ নৌবাহিনী সজ্জার আদেশে বিচলিত হলেন। এমন কি হিটলারও হলেন দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে জার্মাণ বেতারে ২৯ তারিখের প্রস্তাবিত সমর-সজ্জা অস্বীকার করা হোল। কিন্তু তাঁকে আবার নিশ্চিন্ত করলেন চেম্বারলেন। ২৭

সেপ্টেম্বর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—বহুদূরবর্তী দেশের অপরিচিত অধিবাসীদের সুদেতেনের জন্য ইংল্যাণ্ডের সমর-সজ্জা অর্থহীন। তখনি তিনি উত্তর পেলেন, বিধ্বস্ত চেক রাষ্ট্রের নূতন সীমান্ত সম্বন্ধে জার্মাণী প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত। চেম্বারলেন আনালেন চেক-ইতালী-জার্মাণ ও ফরাসীদের এক বৈঠকে এই হস্তান্তরের সমস্যা সমাধানে তিনি আগ্রহান্বিত। মুসোলিনিকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি হিটলারকে এই প্রস্তাবে রাজী করান। ফ্রান্স অবশ্য একই যুক্তর্কে লিপ্ত ছিল। ফরাসী দূত ২৭এ রাত্রে হিটলারকে জানিয়েছিল যে সুদেতেন অঞ্চলের চেয়ে কিছু বেশী জায়গা চাইলেও ফ্রান্সের আপত্তি নেই। ২৮শে বিকালে চেম্বারলেন-দালাদিয়ের মুনিখে মিলিত হলেন।

৩০শে চতুঃশক্তি বৈঠকে চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হোল। পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরী ইতিমধ্যে চেকরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ দাবী করছিল এবং হিটলার গোডেসবার্গে তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এবার চেম্বারলেনের অনুরোধে তিনি এত দাবী করলেন না। তবু যে আন্তর্জাতিক কমিশন চেক-ভূমি ভাগ করতে বসল তার বেয়াদপ হিটলারের সমস্ত দাবীই প্রায় মেনে নিলে।

সুদেতেন অঞ্চলহীন চেকোস্লোভাকিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হোল। বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও জার্মাণী তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে আলাদা হয়ে যাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে। ১৯৩৯এর ১৪ই মার্চ স্লোভাক প্রধানমন্ত্রী ফাদার টিসো বিদ্রোহী হলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে অপসারিত করলো। হাচা যখন হিটলারের সঙ্গে টিসো-সম্বন্ধে আলোচনা করতে এলেন তখন তাঁর কাছ থেকে জোর করে চুক্তি আদায় করে নিল জার্মাণী—তার মর্ম চেক রাষ্ট্র জার্মাণীর আশ্রিত হতে চায়। সুযোগ বুঝে পোল্যাণ্ড দাবী করলো টেস্‌চেন, হাঙ্গেরী—কার্পেথিয়ার অঞ্চল। অবশেষে ১৪ই মার্চ জার্মাণ সৈন্য প্রাগ অধিকার করল। বহুবিধ প্রশ্নের উত্তরে চেম্বারলেন পার্লামেণ্টকে জানালেন—তাঁদের সন্ধির প্রয়োজনীয় সংশোধন হচ্ছে। তাছাড়া স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা-ঘোষণায় চেকরাষ্ট্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হচ্ছে, সুতরাং তার সীমান্তরক্ষার প্রশ্ন ওঠেনা। আসল ব্যাপার হ্যালেফ্যাক্সের নথিপত্রে পাওয়া গেছে। ১৯৩৯এর এপ্রিলে গোয়িং মুসোলিনি ও চিয়ানো সাক্ষাৎকার হয়। গোয়িং বলেন, মুনিখ-চুক্তির পরও চেকশক্তি খর্ব্ব হয়নি। তার প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট করতে, বিপুল ঐশ্বর্য্য শোষণ করতে এবং পোল্যাণ্ডের সিলাকল আক্রমণের জন্য সুবিধাজনক ঘাঁটির লোভে মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া দখল করতে চেয়েছিলেন হিটলার। জোড্‌লও তাঁর ডায়েরীতে তাঁকে পোল অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিরর্থক রাজ্যগ্রাসের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে গেছেন।

মুনিখ বাশিয়াকে বাদ দিয়ে তিয়েনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা। চেম্বারলেনের

তোষণনীতির পশ্চাতে একটিমাত্র অভিপ্রায় সুস্পষ্ট—যা কিছু হিটলার পান যেন ইউরোপের প্রধান শক্তিসমূহের সম্মতি অনুসারে পান, শক্তির যুক্তিতে নয়। কিন্তু রাশিয়া যে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি এবং তাকে বাদ দিলে পূর্ব ইউরোপের, বিশেষতঃ জার্মাণীর, সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় এই সত্য চেম্বারলেন এড়াতে চেয়েছেন। রাশিয়ার অস্তিত্বকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন রাশিয়াকে আলাপ-আলোচনার বাইরে রেখে। ন্যুরেমবার্গ বিচারকালে মার্শাল কাইটেলকে চেক প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন—পশ্চিমী শক্তিবর্গ চেকরাষ্ট্রকে সাহায্য করলে জার্মাণী কি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করত? উত্তরে কাইটেল বলে—নিশ্চয়ই না, আমাদের সামরিক প্রস্তুতি ছিলনা। মিউনিখের উদ্দেশ্য হ'ল—"to get Russia out of Europe, to gain time, and to complete the German armaments." "To get Russia out of Europe"—এই ছিল মিউনিখ-রহস্যের চাবিকাঠি। তাছাড়া চেম্বারলেন ডিক্টেটরদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন তাদের দাবী স্থানগত এবং সীমাবদ্ধ। তাঁর উদ্ভব ধারণাই ভ্রান্ত, সুতরাং সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হ'ল। ব্রিটিশ জাতিকেও কতকটা দায়ী করতে হয়। তারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মুনিখকে 'সম্মানজনক শান্তি' বলে গ্রহণ করেছিল। ইবসেনের Master Builder-এর মত বীর্যহীন বিবেক ব্রিটেনকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। অথচ শান্তি কি একে বলে? টয়েনবির ভাষায় "So far all the bars to our Peace medal have been cast out of other peoples' coin." দুটি রাজনৈতিক দল এমন মনোভাবের জন্য দায়ী। একটি লন্ডনেরীয় সমাজতন্ত্রী দল যারা অনুতপ্তচিত্তে তাদেরই সন্ধির অন্যায় সর্তগুলির ওপর জোর দিচ্ছিল এবং পরাকৃত জার্মাণীর প্রতি সমবেদনায় বিগলিত হয়ে হিটলারের প্রত্যেক অপকর্মকে ক্ষমার চক্ষে দেখছিল। দ্বিতীয় দল—চরম দক্ষিণপন্থী, তারা ফাসিবাদের মধ্যে সাম্যবাদের প্রতিষেধক খুঁজে পেয়েছিল এবং হিটলারের রুশবিরোধী বক্তৃতার মধ্যে নূতন মেসায়ার এবং নূতন ক্রুসেডের উদাত্ত আহ্বান শুনতে পাচ্ছিল। তাদের চোখে চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার রুশ-সীমান্তের দিকে জার্মাণ বাহিনীর অগ্রগতির একটি ধাপ, সুতরাং অভিনন্দনযোগ্য। এমন নীতিকে অমার্জিত ভাষায় বলা চলে—Let the Nazi dog eat the Bolshie dog. ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে অনুরূপ দ্বন্দ্ব দেখি। একদিকে র‍্যাডিক্যালিজমের সঙ্গে সাম্যবাদের বিরোধ, অন্যদিকে র‍্যাডিক্যালিজমের সঙ্গে ফ্যাসোবিনিজমের বিরোধ। থোরেজ ও তাঁর দল উচয়ের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দালাদিয়ের-বনে মাইতার ক্রসোয় কমিতে দে ফোর্জের (Comite des Forges) পূর্ণ সমর্থনে জার্মাণীর দিকে হাত বাড়ালেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বনাশ মেনে নিলেন। আর বেনেস হলেন উদারনীতির

ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পদত্যাগ না করে তাঁর উচিত ছিল প্রতিরোধ করা এবং সেই অসম সংঘর্ষের মধ্যে আত্মসম্মান বজায় রেখে আত্মাহুতি দেওয়া। কে জানে হয় তো তার ফলে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হোতো।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ইতিহাস ও গণবিজ্ঞান

(Histoire et Demographie)

শ্রীরমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

ইতিহাস ও গণবিজ্ঞানের (Demography) নাম করা বইগুলিতে এই বিশেষত্ব দেখা যায় যে এই দুই শাস্ত্র পরস্পরের সহিত পরিচিত নয়। Lavisse সম্পাদিত পৃথিবীর ও ফ্রান্সের ইতিহাসগুলিতে অথবা Peuples et Civilisations এ—এমন কি সাধারণ পাঠ্যপুস্তকগুলিতেও দেখা যায় যে দু একখানা অতি আধুনিক গ্রন্থ ছাড়া জনসংখ্যার (population) উল্লেখ কোথাও নাই। বিদেশ হ'তে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতেও একই অবস্থা। আবার Laudry'র ন্যায় বিখ্যাত পণ্ডিতের লেখা গণবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলীতেও দেখা যায় যে, সেখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান খুবই সংকীর্ণ। Huber, Livi প্রভৃতির বইগুলির বিষয়েও ঐ একই কথা বলা যায়। তবে একথা ঠিক যে ঐতিহাসিকেরা যেমন গণবিজ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়েছেন গণবৈজ্ঞানিকেরা ইতিহাসকে ততখানি উপেক্ষা করেন নাই।

যখন গণবিজ্ঞানের জন্ম হয় তখন ইতিহাস একটি শাস্ত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। তার পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষেত্র ও পদ্ধতি বেশ খানিকটা কড়াকড়িভাবেই নির্দ্ধারিত হয়েছে। গণবিজ্ঞানের খোঁজ পেতে তার অনেক দিন লাগে। এদিকে সংখ্যাতত্ত্বোদ্ভূত গণবিজ্ঞান ছিল অর্থনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সংখ্যাতথ্যবিদ অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে সে ব্যস্ত ছিল বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা করতে এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে অনুমান করতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই দুইটী শাস্ত্র, যার একটী অতীতদর্শী ও অন্যটী ভবিষ্যৎদর্শী, তাদের মিলন কিভাবে হতে পারে? তারা উভয়ই পশ্চাদ্‌গামী না হলে কি তাদের মিলন সম্ভবপর?

যখন ইতিহাস দাহ্যবস্তুরূপে সমসাময়িককালে উপস্থিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার নজর পড়ে জনসংখ্যার তথ্য ও মতবাদের উপর। বাধ্য হয়ে তাকে এগুলি মেনে নিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়

এবং এদের উৎপত্তি এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানবার জন্য অতীতকালে অনুসন্ধান করতে হত।

আবার যখন ভবিষ্যদ্দর্শী গণবিজ্ঞান দেখতে পেল তার অনুমানগুলি ফলতে দেরী হচ্ছে, তখন সে তাদের সামনে কঠিন বাস্তবকে দাঁড় করাল। দেখা গেল যে বাস্তব ও অনুমানের পার্থক্য খুবই বেশী। তখন গণবৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল সন্তানসন্ততি ও বংশাবলীর উর্দ্ধে উঠল। এর ফলে তাঁরা বিশুদ্ধ সংখ্যাতত্ত্ববিৎ থেকে অনেকটা ঐতিহাসিক হয়ে উঠলেন।

এর পর একে একে অনেক উঁচুদরের বই বেরুতে লাগল। তাদের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তগুলি রীতিমত উচ্চশ্রেণীর। ইতিমধ্যেই গণবিজ্ঞান ইতিহাসে এবং ইতিহাস গণবিজ্ঞানে স্থান পেতে আরম্ভ করেছে। এই অধুনা প্রকাশিত পুস্তকগুলির সঙ্গে Peuples et Civilisations শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর পার্থক্য বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। এখন আমরা ইতিহাস ও গণবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ মিলন না হলেও সমন্বয় দেখতে পাই। ইতিহাস গণবিজ্ঞানকে যেন কতকটা ভয়ে ভয়ে স্থান দিচ্ছে যদিও তার দাবীগুলি তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। সে এখনও পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না যে গণবিজ্ঞান ইতিহাসের পরিপূরক বিদ্যা চাইতে বড়—সে হচ্ছে ইতিহাসের একটা দিক, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের একটী ফলপ্রসূ উপাদান।

এদিকে আবার গণবিজ্ঞানও বর্ত্তমানকে ভাল করে উপলব্ধি করবার জন্য শুধু ভবিষ্যতের দিকেই চেয়ে রইল না—অতীতের দিকেও সে দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করল। ফলে একটা নতুন শাস্ত্রের সৃষ্টি হ'ল—সে হচ্ছে জনসংখ্যার ইতিহাস। তবে এখনও সে ইতিহাসের সঙ্গে খুব বেশী মিশে গেল না।

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গণবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে ইতিহাস যে নবরূপ ধারণ করেছে তার এবং ইতিহাসের নতুন শাখা জনসংখ্যার ইতিহাসের অভিনবত্বের বিশ্লেষণ করা।

• • •

গণবিজ্ঞানের সাহায্যে ইতিহাসের নবরূপ পরিগ্রহ

১। সংখ্যাত্মক (Quantitative)—

গণবিজ্ঞান সর্ব্বপ্রথম সংখ্যার দিক দিয়ে ইতিহাসকে অনুপ্রাণিত করে। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক জীবনে সংখ্যা কোন্ অংশ গ্রহণ করে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংখ্যাই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে সম্ভবপর করে। (জন)-সংখ্যার নিবিড়তা পর্য্যাপ্ত না হলে রাষ্ট্রীয় গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় হয় না—অর্থনৈতিক উন্নতির ত কথাই নাই। এ বিষয়ে M. F. Braudel তাঁর নতুন বইয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অসভ্যতার কথা (l'archaisme) ম: ব্রোদেল উল্লেখ করেছেন। এখানে কোন সভ্যতা প্রবেশ লাভ করে নাই, পুষ্টধর্ম্ম অথবা জায়গীর প্রথা (feodalite) ও স্থান পায় নাই। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যেখানেই মনুষ্য-উপাদান অপর্য্যাপ্ত অথবা বিক্ষিপ্ত সেখানেই কোন রাষ্ট্র, কোন সুপ্রচলিত ভাষা অথবা বৃহৎ সভ্যতা গড়ে ওঠে না। তাহলে একথা বলা চলে না কি যে গণবিজ্ঞান বিষয়ক তারতম্যের উপর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিনাশ নির্ভর করে? মিসিসিপি নদীর সমভূমির বুকের উপর দিয়ে মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। আবার প্রলয়ংকর আক্রমণের ফলে সম্পদ নষ্ট হওয়ায় ও জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য প্রাচীনকালের রাজ্যগুলির বনিয়াদ একেবারে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া রাষ্ট্রের প্রকার পরিবর্ত্তনও জনসংখ্যার চাপের উপর নির্ভর করে। ব্রোদেল প্রশ্ন করেন— ষোড়শ শতাব্দীতে নগররাষ্ট্র যে দেশরাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহা কি গণবিজ্ঞানের চাপের ফল নয়? এটা জানা কথা যে ফ্রান্সে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও ক্রমিক মহামারীর ফলে জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় দরুণ জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের পরিবর্ত্তন হয় এবং অভিজাতবর্গের ক্ষমতা লোপ পেয়ে রাজশক্তির বৃদ্ধি হয়।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব যে গভীর পরিবর্ত্তন আনয়ন করে তারও গণবৈজ্ঞানিক আলোড়নের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। M. Labrousse তাঁর 'ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সঙ্কট' বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে তৎকালীন ফ্রান্সের জনসংখ্যার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই কম।

রুশ দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশেষ করে সার্ফদের মুক্তির পর, জনসংখ্যাবৃদ্ধি হেতু জমিজমার সঙ্কট ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে। ফলে বারবার কৃষক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং সারা দেশে একটা বিপ্লবী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

এতদিন যেসব ঘটনার রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উদ্দেশ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হত এখন গণবিজ্ঞানের সাহায্যে তাদের একটা নতুন তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। এই যেমন ব্রোদেল বলেন যে দ্বিতীয় ফিলিপ মুরদের স্পেন থেকে বিতাড়িত করেছিলেন কারণ তখন স্পেনের জনসংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজেরা যে দেশ ত্যাগ করে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তার কারণ শুধু এই নয় যে তারা ধর্ম্মগত নির্য্যাতন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নতুন আশ্রয় খুঁজছিল, এর আর একটা কারণ জনসংখ্যার চাপের আধিক্য।

এক কথায়, যখনই গণবিজ্ঞানের গতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরোধের জন্য

সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তখনই রাজনৈতিক ইতিহাসে সংখ্যাত্মক গণবিজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে বিচলিত হয়। এই মহৎ উপাদানের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক ইতিহাস কার্যকরী হয়। এঙ্গেল্‌সের (Engels) কথামত একমাত্র অর্থনীতি ঐতিহাসিক বিবর্তনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না—যন্ত্রবিজ্ঞানের বিপ্লবও নয়।

এ ছাড়া রাষ্ট্রের শক্তিও নির্ভর করে সংখ্যার উপর।

কাজেই সংখ্যাত্মক গণবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে ইতিহাস লেখা অথবা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ধর্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসও গণবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসারের বৈষম্য কেবলমাত্র ধর্মান্তরের গতির উপর নির্ভর করে না। এ নির্ভর করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্যহার ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার বৈষম্যের উপর এবং ধর্মান্তর গ্রহণের তারতম্যের উপর। এইভাবে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাও গণবিজ্ঞানের হারের বৈষম্যদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে দেখা যায় যে অভিজাত শ্রেণীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার অল্পতার জন্যই তাদের মধ্যে নতুন রক্তের আমদানী হয়। এই জন্যই দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই কিউডাল অভিজাতের বংশধর। আবার ইংলণ্ডের লর্ডদের মধ্যেও কয়েকবার নতুন রক্ত প্রবেশ করেছে। এইভাবে অন্যহারের বৈষম্য কখন কখন সমাজচক্রে তৈল সিঞ্চনের কাজ করে। আবার এতে বিপরীত ফলও ফলতে পারে। ম্যালথাস উক্ত মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ইতরসাধারণের অতিপ্রজননে ভীত হয়ে তাদের দমনের জন্য তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে এদিকে ইতর সাধারণও জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য অধিকতর দরিদ্র হয়ে বেশী পরিমাণে বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

এইভাবে গণবৈজ্ঞানিক আচরণের অনৈক্যের জন্য বিভিন্ন জাতীয়গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে উঠতে পারে। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায় তার একটী কারণ এই যে তার বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ খুবই তীব্র হয়ে উঠেছিল। আবার এই বিরোধবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে এই যে কোন কোন জাতীয়গোষ্ঠীর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের জন্য অন্যদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জার্মানদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সমস্যাও গণবৈজ্ঞানিক কারণের উপর নির্ভর করে। জার্মাণীর চ্যান্সেলার কাপ্রিভি বলতেন, "হয় আমরা আমাদের দ্রব্যসম্ভার বিদেশে রপ্তানী করব, না হয় আমরা (অতিরিক্ত) মানুষ চালান দেব।" এই ব্যাপার নিয়ে তিনি নানা দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও চুক্তিস্থাপন করেন। M. Sauvy দেখিয়েছেন যে পটসডাম চুক্তির ফলে জার্মাণীর লোকসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি হওয়াতে দখলকারী শক্তিদের ব্যয় বেড়ে যায়; ফলে তারা তাহাদের জার্মাণনীতি

পরিবর্তন করে আর্থাণ্ডীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়। কূটনীতিবিশারদেরা গণবিজ্ঞান উপেক্ষা করাতে সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। অন্যপক্ষে আন্তর্জাতিক ইতিহাস আবার প্রোপাগাণ্ডার যুক্তিকে নিষ্ফল করে।

ঔপনিবেশিক ইতিহাস ও জনসংখ্যার তথ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশ্য, ঔপনিবেশস্থাপনের গতি এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দৃঢ়তা বুঝতে হলে গণবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে।

২। দেশান্তর গমন :—

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন থেকে দেশান্তর গমনের কথা এসে পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশান্তর গমনের অভিযান—এই যেমন হিটাইটদের, কিমেরিয়ানদের, কিমিশিয়ানদের, গ্রীকদের, হূণদের, গথদের, নর্ম্মানদের, আরবদের এবং সর্ব্বোপরি উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়ানদের সারাপৃথিবীব্যাপী অভিযান—ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নাই। কিন্তু একমাত্র শেষের ব্যাপারেই গণবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট তাঁদের চোখে পড়েছে। প্রাচীনকালের অভিযানসম্পর্কীয় প্রশ্নের কেউ কোন নিশ্চিত সমাধান নির্দ্দেশ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সে যা হ'ক এই সমস্ত বড় বড় চমকপ্রদ অভিযানগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অভিযানদের আড়াল করে রাখতে পারে না। কোন এক জায়গায় অথবা দুই জায়গার মধ্যে লোকাপসরণের ফলেই দেশ অথবা অঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং জাতির (nation) সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে স্পেনের জন্ম হয় এবং ফ্রান্সের ঐক্য স্থাপিত হয়।

এই সমস্ত অঞ্চল ও দেশগুলির সৃষ্টিধারা এবং সহরের উৎপত্তি থেকে ইতিহাস বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে।

৩। গুণাত্মক গণবিজ্ঞান :—

গুণাত্মক গণবিজ্ঞানের নানাদিক এবং বিবিধ আলোচনার বিষয়—জনগণের নায়ীয়িক লক্ষণ, সংস্কৃতি ও নৈতিক বৈশিষ্ট। এর মধ্যে ইতিহাস মাত্র কয়েকটিকে জানে—আর সব এখনও গণবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়ে আছে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গুণাত্মক গণবিজ্ঞানের প্রগতিতে ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাখ্যা পূর্ণতর হয়েছে—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে নতুন ভাবও সম্ভবপর হয়েছে।

বিভিন্ন বয়স

গণবিজ্ঞান যে চিত্রের নাম বয়সের নিয়ামিত দিয়েছে তার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত আছেন। বয়সের আনুক্রমিক স্তর দ্বারা স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীরই শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্দেশ করা হয়। ইহাদ্বারা জাতিবিশেষের

যৌবন অথবা বার্ধক্যের ধারণা করা যায়। যদিও একথার কোন স্পষ্ট অর্থ হয় না, তাহলেও ইহাদ্বারা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, শারীরিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক উপাত্ত প্রকাশ করা হয়।

এইসব উপাত্ত ইতিহাসের পক্ষে দরকারী। কোন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্নযূথের বয়সস্তরের কাঠামো তাদের সাধারণ নীতি ও আচরণ ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময় দেশের অধিবাসীদের কত অংশ অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধশিল্পে নিযুক্ত হবার বয়স পেরেছে জানলেই শুধু চলবে না। এটাও জানা দরকার যে তাদের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে কর্মক্ষমদের বয়সের তারতম্য কি এবং তারা কত বয়সে কাজ আরম্ভ করে আর কত বয়সে অবসর নেয়।

মনস্তত্ত্বের তথ্য কিন্তু খুব গোলমেলে মনে হয়। তবে বলা যায় যে রাজনৈতিক মনোভাব বয়সের উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নের ব্যাপারে ফ্রান্সের লোকেরা বয়সের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করছে। কাজেই নির্বাচকমণ্ডলীর বয়সানুযায়ী গঠন জানা দরকার।

অনেকসময় পিতাপুত্রের মধ্যে যে ভীষণ রাজনৈতিক মতভেদ উপস্থিত হয় তা রুশ উপন্যাস "পিতারা এবং পুত্রেরা"র মধ্যে দেখান হয়েছে। ইতিহাসকেও কিন্তু 'দুই পুরুষের' মধ্যে সংঘর্ষ লক্ষ্য করতে হবে।

M. Houry তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে যুবকেরা কোন্ অংশ গ্রহণ করেছে। আমরা জানি যে ম্যাটসিনির আন্দোলনকে 'যুবা ইয়োরোপ' আন্দোলন বলা হয়। হিটলার ও ফ্যাসিষ্টদের অভিযানে যুবকেরা কোন্ ভূমিকা অভিনয় করেছে তাও কারো অবিদিত নাই। কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবে যুবকেরা যে বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে তা না জানলে ঐ বিপ্লবকে পুরাপুরি বোঝা যায় না।

• • • •

অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর

আজকাল বেশী করে সমসাময়িক ইতিহাসকে অর্থনৈতিক বিপ্লব ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণবৈজ্ঞানিক স্তরের সঠিক আলোচনা করা এখনও বাকী রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উপর বিবেকের প্রভাব এবং তাদের সমষ্টিগত মনোভাব ঐতিহাসিক বিবর্তনে ভাল করে জানা নাই। বুর্জোয়াজি, প্রলিটারিয়েট, এমন কি উচ্চ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র অথবা পেতিৎ বুর্জোয়াজি এবং শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক—এই সংজ্ঞাগুলি সত্যিকার অর্থহীন। তবে অভাবের অথবা প্রয়োজনের ক্রমবিকাশের যে আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে—যেমন Halbwachs'র

—তাতে সাধারণ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোক সম্পাত করা হয়েছে। তাই বলা চলে যে সাধারণ ও রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতে হলে জনসংখ্যার ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

• • • •

তবে যদি একথা স্বীকার করা হয় যে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক গণ-বৈজ্ঞানিক উপাদান প্রচলিত ইতিহাসের অনেকখানি নতুন করে গড়তে পারে তবে একথাও বলতে হবে যে এ কাজ এখনও আরম্ভ করাই হয় নাই এবং এজন্য একমাত্র দলিলের স্বল্পতাই দায়ী নয়।

• • • •

জনসংখ্যার ইতিহাস

জনসংখ্যার ইতিহাস হচ্ছে ইতিহাস ও গণবিজ্ঞানের মিলনের ফল। এই বিদ্যা স্থান বিশেষের, অঞ্চল বিশেষের, জাতি বিশেষের এবং সমস্ত মনুষ্যসমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত। এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন যুগের মানুষের বিবর্তনের নতুন বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা। এই শাস্ত্র ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং একে সাহায্য করে সাংখ্যাতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ভূগোল। ইহা সভ্যতার ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

সংখ্যাত্মক ইতিহাস

গণবিজ্ঞান অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ সংখ্যাতত্ত্বের বিজ্ঞান ছিল। এর থেকে অতীতদর্শী গণবিজ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু এই প্রথম পরিবর্ত্তনে খুব অল্পই ফল পাওয়া যায়। কারণ সংখ্যাতত্ত্বের উপকরণের অভাব অনেক দেশেই ছিল এবং সুদীর্ঘকালের। কিন্তু যখন আমরা সমসাময়িক কালে উপস্থিত হই তখন এই সংখ্যাত্মক ইতিহাসের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয় নিশ্চিত হই। সংখ্যাতত্ত্ব ও গণ-বিজ্ঞানের যুগপৎ উন্নতির ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, আরও বেশী উনবিংশশতাব্দীর আরম্ভ থেকে, সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যগুলির পর্য্যাহক্রমে সন্ধান দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমে বেশী হতে আরম্ভ করে। তবু একথা বলা দরকার যে এই উন্নতিতেও কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তথ্যগুলি একই পদ্ধতিতে সঞ্চিত না হওয়াতে এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ উন্নততর হওয়াতে তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আবার সংখ্যাতত্ত্বের উপকরণ যত প্রচুরই হক না কেন ব্রেজিলের মত এমন দেশও আছে যাদের শতাব্দীকালের গণবিজ্ঞানসম্মত পরিসংখ্যান একেবারেই নাই। আবার U.S.S.R.-র মত দেশও আছে যারা কোন খবরই দেয় না।

তবে অনুসন্ধান করলে অনেক সংখ্যাত্মক তথ্য এমন কি অনেকদিন আগেরও —সঠিক ভাবে জানা যেতে পারে। দপ্তরখানায় অনেক কিছু তথ্যের খবর

পাওয়া যায়। গির্জার রেজিষ্টারী বইতে এবং মঠ ও হাসপাতালের দপ্তরে অনেক খবর পাওয়া যাবে যার ফলে অনেক বিস্মবিস্তৃত দুর্বিপাকের সঠিক ধারণা করা সম্ভব হবে। এই পথা অনুসরণ করে M. Yves Renouard ১৩৭৮ সালের 'কৃষ্ণ মহামারী'র আসল ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। M. Roupnel এবং Feillet ও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

সমগ্র মনুষ্যজাতির সংখ্যার তথ্যও কম মূল্যবান নয়।

গুণাত্মক ইতিহাস

সংখ্যাত্মক তথ্যের অন্যদিকে রয়েছে গুণাত্মক প্রস্তাবনী—শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক। কিন্তু এগুলি খুব অল্পসংখ্যক লেখকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে M. Moraze ও M. Aries-এর নাম করা যায়।

সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকেও অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। বংশ বা পরিবার, বিবাহ ও জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়েও নতুন ভাবে কাজ সবে সুরু হয়েছে। M. Dutheil তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর আর্ঘাণীর লোকসংখ্যা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে কতদূর পর্যন্ত কোন দেশের অধিবাসীদের পরিবর্ত্তন হতে পারে যার ফলে কোন কোন বিষয়ে তাদের একেবারেই চেনা যায় না।

আজকালকার দিনে সমগ্র জগতের সমষ্টিগত জনগণের আলোচনাও উপেক্ষা করা যায় না।

• • • •

পরিশেষে গবেষণার পদ্ধতির প্রশ্ন এসে পড়ে। আমরা কি বিশেষ কোন সময়ের এবং বিশেষ কোন অঞ্চলের জনসংখ্যার ইতিহাস নিয়ে কাজ করব, যাতে এগুলি পরে সাধারণ ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে—না ঐতিহাসিকেরা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণার সময় জনসংখ্যার তথ্যেরও অনুসন্ধান করবেন। প্রথম পদ্ধতির সুবিধা এই যে এর ফলে বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হয়। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান যে কোন প্রশ্ন ও দলিলের ব্যাপারে খাটাতে পারেন এবং এতে সুফল ফলবে।

L' Institut national d' Etudes demographiques-এর কাজ দেখে বোঝা যায় যে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতাতেই সত্যিকারের সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। এজন্য বিভিন্ন পরিষদ বা চক্র স্থাপন করতে হবে। গবেষণার সময় মুস্কিলে পড়লে ঐতিহাসিকেরা এঁদের কাছে যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন। তাঁদের দৃষ্টি ও জনসংখ্যার নানাবিধ প্রশ্নের প্রতি আকর্ষণ করতে পারবেন। আবার গণবৈজ্ঞানিকদের ঐতিহাসিক বোধও বৃদ্ধি পাবে। *

* 'Revue Historique'র ১৯৫০ সালের এপ্রিল—জুন সংখ্যায় প্রকাশিত Professeur Marcel R. Reinhardএর প্রবন্ধ "Histoire et Demographie"র সারাংশের অনুবাদ।

দুইটি ঐতিহাসিক চিন্তাধারা

শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী

বর্ত্তমান প্রবন্ধের ভূমিকাস্বরূপ ভাববাদ ও প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা অপরিহার্য্য। শেষোক্ত মতবাদের প্রভাব ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক চিন্তাধারায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও ভাববাদের আদর্শ বাতিল হয়ে যায়নি। এই দুই আদর্শের প্রতি কোন্ ঐতিহাসিক কি ভাবে সাড়া দিয়েছিল তার অল্প বিস্তর বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না।

পজিটিভিজম্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদ প্রকৃতি বিজ্ঞানের দর্শন, এই দর্শনের প্রতিপাদ্য হ'ল এই—প্রকৃতি বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে হলে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে: প্রথমে বস্তু বা ফ্যাক্ট সংগ্রহ এবং পরে পারস্পরিক সম্বন্ধ সূচক কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা সত্য নির্দ্ধারণ। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-সঙ্কলন-বিদ্যায় এই মতবাদের ছাপ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। ইতিহাসের মাল-মশলা ও উপাদান সংগ্রহে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আশ্রয় গ্রহণ করে সত্য তথ্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ এক মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। প্রয়োজনীয় এবং সংগৃহীত উপাদানগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধিতে নির্ভরযোগ্য ও সুপর্য্যাপ্ত ঘটনাবহুল তথ্য নির্ব্বাচন করা ঐতিহাসিকদের আদর্শরূপে পরিণত হোল।

এই মতবাদের প্রভাবে ইতিহাস বিজ্ঞান-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী যে ভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ করে, ঐতিহাসিকও সেই ভাবে প্রত্যেকটি ফ্যাক্টকে স্বকীয় সত্তানুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বিশ্লেষণদ্বারা বুঝে নেবে—আর কোন পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত বিচারে বৈধ নয়। ফলে ইতিহাসের তথ্যবহুল জগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপরমাণুতে বিভক্ত হয়ে গেল। অন্যদিকে প্রত্যেকটি ফ্যাক্টের সত্তা স্বাতন্ত্র্যের আতিশয্য, ঐতিহাসিকের চেয়ে ইতিহাসের তথ্যকে প্রধান করে তুললো। ঐতিহাসিক শুধু ঘটনাকে শ্রেণীবদ্ধ করবেন, মতামত দেবার দায়িত্ব তার নেই। এই বৈজ্ঞানিক বস্তু-নিষ্ঠা ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আনুগত্য দেখালেন পজিটিভিষ্ট যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মম্‌সেন। তিনি সম্পাদন করলেন রোমান লিপিমালা ও শাসনপদ্ধতি এবং তার মধ্যে সাময়িক সংজ্ঞাগুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা এবং রোমান নীতিগুলির সংখ্যাবিন্যাস ও সময়ক্রমানুসরণ ইত্যাদি সুপর্য্যাপ্ত তথ্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে, বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের সম্পূর্ণ আদর্শ তুলে ধরলেন। সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রতি তুচ্ছতম ঘটনার খুঁটিনাটির বিবরণ দিলেন, কিন্তু মম্‌সেন তাঁর বিখ্যাত রোমের ইতিহাস নিয়ে অকুটিয়াসের যুদ্ধের বেশি আর এগিয়ে যেতে পারলেন না, সময়ক্রমের

অভাবে বেসামাল হয়ে পড়লেন—ইতিহাসের সমগ্র রূপ দেখা আর হ'লনা। তাঁর বিখ্যাত রোমের ইতিহাস তলিয়ে গেল সেই জায়গায় যে জায়গায় তাঁর রোমের ইতিহাসের অবদান রইলো মূর্ত হয়ে। পজিটিভিজমের প্রভাবে তথ্য নির্দ্ধারণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বৃহত্তর সমস্যা সমাধানের অপটুতাকে প্রকট করে তুললো। ঐতিহাসিক হবেন ঘটনার নিরপেক্ষ দর্শক, প্রতিবিম্বমাত্র, যে চিন্তা বা ভাবের উৎস হতে ঘটনা জন্মায় সে খোঁজ রাখা নিষ্প্রয়োজন, কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস কতকগুলি বাহ্যিক ঘটনাবলীর সমষ্টি, সমাজের গতি প্রগতির রেখাকে চিহ্নিত করা দূরে থাকুক, অতীতের সমস্যার বিচার আলোচনাও ঐতিহাসিকের বিষয়বস্তু নয়, সাহিত্য, কলা, দর্শন, জীবনমানের বিচিত্র কথা অপ্রয়োজনীয়; ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে যেমন করেছেন র‍্যাঙ্কে এবং ফ্রীম্যান্।

এ ভাবে ঐতিহাসিকগণ যখন পজিটিভিজমের অবচেতন মুখপাত্র, এমন কি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন বিউরি দিলেন ইতিহাসের নূতন বিচার প্রণালীর ইঙ্গিত। ইতিহাস চর্চ্চায় যে এক দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে তিনি তা উপলব্ধি করেন এবং নানা গ্রন্থে বিশেষতঃ The idea of progress এবং A shorter History of Freedom of Thought-এ তিনি ইতিহাসের দার্শনিক দিকগুলি উদ্‌ঘাটিত করেন। ইতিহাস-দর্শনে তিনি ছিলেন পজিটিভিষ্ট, কিন্তু এ মতবাদের প্রতি অবিচল আনুগত্যের পরিচয় দেন নাই। পজিটিভিষ্টদের মত তিনি ইতিহাসকে দেখেছিলেন কতকগুলি ফ্যাক্টের সংঘটন-পরম্পরা থেকে তারা পৃথক সম্পর্কহীন সত্তা এবং পৃথকভাবেই বোধগম্য। ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হ'ল কেম্ব্রিজ ইতিহাস মালায়—প্রাচীন মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিস্তার-জ্ঞান সমাবেশ করার এক বিপুল প্রয়াস। অধ্যায়গুলি বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখা, এমন কি কোন কোন অধ্যায় একাধিক লেখকও লিখেছেন।

বিউরির চিন্তাধারা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাসে নির্দ্দিষ্ট একটি ঘটনার কোন বিশেষত্ব নেই—উহা সম-গোত্রীয় বিশিষ্ট সত্তাসম্পন্ন ঘটনাবলীর অন্যতম উদাহরণ মাত্র; পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূচক এক যোগসূত্র আবিষ্কার করে এদের কার্য্যকারণ নির্ণয় করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক, ভাববাদের পরিপন্থী, সাধারণ সূত্রের নাগপাশে ঘটনাবৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত। কিন্তু ১৯০৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় তিনি এক নূতন সুরের আভাস দেন—ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা এক একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কার্য্যশক্তি-প্রসূত। বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন ও কড়াকড়ির বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে

বিউরি ইতিহাসের সমগ্র রূপটি দেখার আগ্রহে আগ্রহান্বিত—"...historical thought as we now understand it is a new thing in the world, barely a century old : not at all the same thing as natural science, but having a special character of its own, offering to mankind a new view of the world and a new armoury of intellectual weapons." এই intellectual attitude-র আশ্রয়ে মানব-ইতিহাসের স্বর্ণসৌধ রচনা করবার এক বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে একথা ভেবে বিউরি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাতের এই বিশেষ ভঙ্গিটি চিন্তার উৎকর্ষতার পরিচায়ক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের রূপ কি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন—"History is simply a science, no less and no more." প্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক এখানে চিন্তাধারার সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছেন, মন দ্বিধাগ্রস্ত। একদিকে দেখছেন ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মূলগত বৈষম্য—অপরদিকে একের সঙ্গে অপরের নীতিগত ঐক্য। শেষোক্ত মতবাদের কবল হতে মুক্ত হবার জন্য তিনি বচন ও বাচন দ্বারা অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়াতে কোন মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেন নাই।

পরের বৎসর অন্য একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে—The Place of Modern History in the Perspective of Knowledge—তিনি এ বিষয়ই পুনরায় উত্থাপন করলেন। মনের সংশয় দূর করবার জন্য তিনি প্রশ্ন করেন—ইতিহাস কি নিছক ফ্যাক্টের আকর, সমাজ ও নৃতত্ত্ববিদের তাঁবেদারে সঞ্চিত না উহা একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিবদ্ধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়, স্বতন্ত্রভাবে সাধনীয়? বিউরি ইহার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ইঙ্গিত দিলেন যে প্রকৃতিবিজ্ঞান হতে ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দরকার, কারণ ভাব বা বোধিই ইতিহাসের গতিবেগের কারণ। বিউরির মানসিক বিকাশের ইহা একটি চরম মুহূর্ত—তাঁর পজিটিভিস্ট সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। ১৯০৯ সালে অন্য একটি নিবন্ধে—Darwinism and History—তিনি দৃঢ়তার সহিত লিখলেন যে, কোন সাধারণ নিয়ম দ্বারা ইতিহাসের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা চলেনা, একটা সমরূপতা থাকতে পারে, কিন্তু সমসূত্রের স্থান নেই। ইতিহাসের বিশিষ্ট সত্তাকে বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করে ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক এক ধারাস্তরে পর্য্যায়ে ফেলতে চান। তিনি আরও বলেন যে ইতিহাস কতক ঘটনার সমষ্টি, প্রতি পদক্ষেপে আছে এই আকস্মিকতার উৎপাত যার ফলে ইতিহাসের গতিরেখা, অবধারিত নিয়মে প্রতিভাত না হয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। ফরাসী পণ্ডিত Cournot হতে বিউরি হয়ত উক্ত ধারণা পেয়ে থাকবেন, কিন্তু বিষয়টি অনুধাবন করলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন যে ইতিহাসের আকস্মিকতা,

তথা ব্যক্তিমুখাতা মোটেই দৈবাত্মক নয়, উহাই ইতিহাসের উৎস। এখানেই বিউরির খটকা লাগলো।

১৯১৬ সালে লিখিত প্রবন্ধে—Cleopatra's Nose—এই দ্বন্দ্বের চিহ্ন প্রকাশ পেল। পূর্ব্বমত বর্জ্জন করবার জন্য আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় নিলেন। ইতিহাস যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় তাহলে তার সব কিছুই আকস্মিক, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের ক্রমবিকাশের ফলে অর্থাৎ বিজ্ঞানের নিয়মুখ গতিযাত্রায় আকস্মিকতার প্রভাব তিমিত হয়ে যাবে। কাজেই দেখা যায় যে বিউরির চিন্তাধারা বাস্তবিক অভিব্যক্তির পরিচায়ক। ইতিহাসের ঘটনাবলী মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় রচিত—বলিষ্ঠ প্রয়াসে এই ধারণা তিনি পরিবর্তিত করেছিলেন, কিন্তু পজিটিভিস্ট যাদের কুক্ষটিকায় তিনি আবৃত হয়ে রইলেন—'আকস্মিকতা'র বাধা আর লঙ্ঘন করতে পারলেন না। ইতিহাসের ব্যক্তিমুখাতা অবিজ্ঞেয় যেহেতু ইহা আকস্মিক এবং আকস্মিক বলেই একান্ত অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক, ইতিহাসের গতিধারাকে করেছে বিপর্যস্ত, বিজ্ঞানের তথাকথিত প্রণালীবদ্ধ ধারাবাহিকতার মত নয়। পজিটিভিস্টদের মতে আকস্মিকতা শুধু ঘটনা বৈশিষ্ট্যেরই নামান্তর, কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানে কোন বৈশিষ্ট্যেরই স্থান নেই, সমগোত্রীয় ও সমশ্রেণীভুক্ত ভিন্ন অন্য সবই প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিতে অস্তিত্ববিহীন, সুতরাং বৈজ্ঞানিক এক প্রণালীবদ্ধ নীতিই জ্ঞানের একমাত্র পন্থা। ভাববাদীয় আদর্শে ইতিহাস বুঝতে গিয়ে বিউরি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে বিজ্ঞানই তাঁকে পজিটিভিজম্‌এর অভিমুখে অনিবার্য্যভাবে নিয়ে চললো।

তবু বিউরির লক্ষ্য ও প্রেরণা ব্যর্থ হয় নাই। মতের দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণ দার্শনিক জ্ঞানের অভাবে নিশ্চিত বিশ্বাসের সহিত তিনি যা ব্যক্ত করতে পারেন নাই তা করলেন মাইকেল ওয়েকশোট (Oakeshott) কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কিংস কলেজের অধ্যাপক। ১৯৩৩ সালে তিনি তাঁর পুস্তক 'Experience and its Modes' প্রকাশ করেন। দার্শনিক বিশ্লেষণদ্বারা তিনি ইহা প্রতিপন্ন করলেন যে ইতিহাস কখনও বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত হতে পারে না, তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের সারাংশ এই যে ইতিহাস এক বিরাট অভিজ্ঞতা, অতীতের ঘটনাপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিজ্ঞতার বিকাশ, অভিজ্ঞতাই পূর্ণ সত্য, ক্রোচের মতানুযায়ী শুধু ক্ষণিকের সচেতনতা নয়, নিছক প্রবহমান অনুভূতিও নয়, অভিজ্ঞতাই এখন এবং সব সময় ভাব, বিচার ও বাস্তবের পূর্ণ-সংজ্ঞা। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অতি বাস্তব এবং বাস্তবরূপেই এই অভিজ্ঞতার অনুভূতি।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই যে ইতিহাস ইহা স্বতঃসিদ্ধ? যুক্তি হচ্ছে এই যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট শেষ হয়ে যাওয়া অতীতকাল, বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে এবং সেই জন্যই সাক্ষ্যপ্রমাণাদির অতীত, কারণ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বর্ত্তমানকালের

বিচারেই প্রযোজ্য, অতীতকালের পক্ষে অর্থহীন ; কিন্তু যেহেতু অতীত ইতিহাসের তথ্য প্রমাণাদির রূপ নিয়ে বর্তমানের কাজ করে, সেই অর্থে অতীতের ফ্যাক্ট বর্তমান ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে—ইতিহাসে অতীত বলে আলাদা কোন সংজ্ঞা নেই, ইহার সবই বর্তমান ; এমন নয় যে অতীত বর্তমানে বেঁচে আছে, অতীত রূপান্তরিত হয়েছে বর্তমানে—এই তাৎপর্যে ইতিহাস অর্থ অভিজ্ঞতা, কারণ অভিজ্ঞতা মূলতঃ বর্তমানসর্বস্ব। পুরাতনীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার সময় প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের সচেতনতাকেই উজ্জিবিত ও শৃঙ্খলিত করা হচ্ছে—বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতেই অতীত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাইকেল ওয়েকশোট্ প্রতিপন্ন করলেন যে ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা, একটি সমগ্র অখণ্ড মহাজগৎ, পজিটিভিষ্ট মতানুযায়ী কতকগুলি স্বতন্ত্র সত্যাসম্পন্ন ঘটনাবলীর সমষ্টি নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন অংশগুলির একের সঙ্গে অপরের গভীর যোগাযোগ পারস্পরিক সংযোজন এবং সংশ্লেষণেই এদের বিকাশ ও প্রকাশ এবং সমবিন্যাসেই যোগগম্য। এই সব চিন্তাধারার দ্বারা ওয়েকশোট্ ইতিহাসকে স্বকীয় মর্যাদায় অধিকারী করলেন—ঐতিহাসিককে সংস্কারমুক্ত হয়ে স্বাধীন পথ বেছে নেবার ইঙ্গিত দেন। বৃহস্পতির ন্যায় ঐতিহাসিক হবে নিজ রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি, বিজ্ঞানী কিংবা অন্য কারো প্রতি আস্থাবিশ্বত অন্ধ আনুগত্য অবাঞ্ছনীয়।

ইতিহাসদৃষ্টির এই ভঙ্গী ভাববাদীর আদর্শকে পুষ্ট করলো। কিন্তু এ সময়ে ইতিহাসক্ষেত্রে এলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েন্‌বি তাঁর বিরাট মহাগ্রন্থ নিয়ে। টয়েন্‌বির মহাগ্রন্থ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, জ্ঞানের গভীরতায় চিন্তাশক্তির মৌলিকতায় ও রচনাকৌশলে মানবসভ্যতার এই অপূর্ব ইতিহাস অদ্বিতীয়। বিরাট পৃথিবীর সমগ্র জাতির কর্মকোলাহলের পটভূমিকায় বিশ্ব-ইতিহাসের মূলগত নীতি বা নিয়ম, গতি ও বেগ নির্ণয়ের জন্য এমন দৃষ্টিশক্তির প্রসারতা ও বস্তু ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় আর কোন ঐতিহাসিক এ পর্যন্ত দেন নাই। কিন্তু টয়েন্‌বি ইতিহাস লিখেন নাই, অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই, তিনি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন—এমন কোন নীতি বা সূত্র উদ্ধার করা যায় কিনা যার আশ্রয়ে ইতিহাসের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা চলে।

ইতিহাস-দর্শনে টয়েন্‌বি একজন পুরাপুরি পজিটিভিষ্ট, বিধাহীন মতবাদ ও বিশ্বাসের স্থিরনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি পজিটিভিজম্‌কে আদর্শস্থ করেছেন। টয়েন্‌বি বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসের মূলগত তত্ত্ব হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি একাত্মক মানব-স্পীসিয়োজ বা সমাজের জীবনী। এইগুলি যথাক্রমে পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সমাজ, পূর্ব ইয়োরোপীয় বা বিজ্যানটাইন্ খৃষ্টীয় সমাজ, ইসলামিক, হিন্দু ও সুদূর প্রাচ্য সমাজ। এই সবগুলি সভ্যতাই বর্তমানে বিদ্যমান তাছাড়াও বিলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট

রূপে বা 'ফসিল'-(fossil) হিসাবে কতকগুলি অর্দ্ধমৃত সমাজের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়—যেমন প্রাচ্যের মোনোফিসাইট (Monophysite) ও নেষ্টরিয়ান খৃষ্টান সমাজ যিহুদী ও পার্শী-গোষ্ঠি এবং ভারতের বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা। আধুনিক সভ্যসমাজের বৈষম্যমূলক সত্তাগুলি টয়েন্‌বির মতে oecumenical অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মক এবং প্রতি সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলির যেমন এ্যাথেন্স ও স্পার্টা, ফরাসী ও জার্ম্মাণীর পারস্পরিক বৈষম্যগুলিকে বলা হয়েছে Parochial অর্থাৎ স্থানাত্মক। এইভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রকে প্রসার করে টয়েন্‌বি দেখেছেন ইহার বিরাটরূপ এবং অসংখ্য প্রকারের বিষয়বস্তু, কিন্তু এর মধ্যে তিনি বেছে নিয়েছেন অতি সুকঠিন কাজ—পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীর প্রকৃত সত্তা নির্ণয় ও পরস্পরের সম্বন্ধাদি বিচার।

এই অনুশীলন ও বিশ্লেষণকার্য্যে তিনি কতকগুলি কল্পিত বিষয়ের সাহায্য নিয়েছেন। এর একটি হচ্ছে affiliation এবং অনুষঙ্গীয় apparentation, যেমন হেলেনিক সমাজ আংশিকভাবে জন্ম নিয়েছে মিনোয়ান সভ্যতা থেকে এবং জন্ম দিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজকে। এছাড়াও কতকগুলি সমাজের নিদর্শন মেলে যারা স্বশক্তিতেই উত্থিত হয়েছিল, যেমন মিশরীয়, মিনোয়ান, চৈনিক, সুমেরীয় প্রভৃতি। কতকগুলি নির্ব্বংশীয় যেমন দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিয়ান সমাজ এবং অন্য কতকগুলি নানা সংমিশ্রণজনিত একই সমাজের মাতৃত্ব লাভ করেছে। এইরূপে গোষ্ঠিবদ্ধভাবে মানব সমাজ বিভিন্ন। টয়েন্‌বির দ্বিতীয় মান হচ্ছে, সভ্য ও অসভ্য সমাজ। পৃথিবীতে অসভ্য সমাজের সংখ্যাই বেশী। অসভ্য সমাজগুলি আকৃতিতে এবং জনসংখ্যায় অনেক ছোট এবং সাধারণতঃ অন্তর্দ্বন্দ্বে কিংবা কোন সভ্য জাতির আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এদের গতি-প্রকৃতি টয়েন্‌বির আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, সভ্য সমাজ নিয়েই ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেছেন। টয়েন্‌বির তৃতীয় বিষয় হচ্ছে Interregnum or Times of Trouble, অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্কটের যুগ যখন এক সমাজ ভেঙ্গে পড়ে এবং নূতন এক সভ্যতা গড়ে উঠে, পুরাতন সভ্যতার সন্তানরূপে যেমন হেলেনিক সভ্যতার অন্তিমকাল থেকে সুরু হ'ল ইয়োরোপের 'Dark Age' অন্তর্বর্ত্তী অরাজকতার যুগ। তমিস্র রজনীর অবসানে উদয় হ'ল পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় সমাজ। চতুর্থ প্রতিপাদ্য বিষয়টি—Proletariat; এরা দুই শ্রেণীর, বাহিরের এবং ভিতরের। সমাজদেহে যখন ভাঙ্গন সুরু হয় এবং সৃজনী শক্তি থেমে যায় তখন বাহির ও ভিতর থেকে আক্রমণের পালা আসে। সীমান্তস্থিত শত্রুরা সীমান্তে হানা দেয় এবং রাজ্যের নিম্ন শ্রেণীরা—যেমন হেলেনিক সমাজের খৃষ্টানগণ—যারা সমাজ-দেহে থেকেও নানাভাবে পদানত ও বঞ্চিত হওয়ায় দরুণ প্রচলিত সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিল, তারা বাইরের আক্রমণ-

কারীদের সাথে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহের ধ্বজ-পতাকা তুলে। এছাড়া টয়েন্‌বি পরীক্ষা করেছেন Universal State and Universal Church যার সমষ্টিতে আনুষঙ্গী সমাজের রাজনৈতিক ও ধর্মের জীবন সমাহিত হয়ে আছে। সার্বভৌম সাম্রাজ্য এবং ধর্ম টয়েন্‌বির মতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার্বভৌম সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্তের অভাব নেই, যেমন রোমান সাম্রাজ্য (হেলেনিক সভ্যতাভুক্ত ?), আবার খিলাফৎ ইত্যাদি—যাংসন্ধানের ভুমুল দুর্যোগের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্বভৌম ধর্মের আশ্রয়ে সমাজ-বিবর্তনের যুক্তি পেয়েছেন যেমন খৃষ্টধর্মের সেতুর একদিকে হেলেনিক সমাজ এবং অন্যদিকে ইয়োরোপ, ইসলামের বন্যার একদিকে নিস্ক্রিয়াক ও অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার মুসলমান সমাজ। এভাবে পর্যবেক্ষণ করে টয়েন্‌বি অতীতের আরও কতকগুলি সভ্য সমাজের সন্ধান পান।

এসব জীবিত ও মৃত সভ্য সমাজ নিয়ে টয়েন্‌বি তুলনামূলক পরীক্ষা করেছেন—এদের উৎপত্তি, বিকাশ, বার্ধক্য ও মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ কোন সূত্রের আবিষ্কার। পূর্বেই বলা হয়েছে টয়েন্‌বি পজিটিভিষ্টবাদে গোড়া বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিহাস-বিশ্লেষণে যে প্রণালী তিনি প্রয়োগ করেছেন সে প্রণালী প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রণালী, সম্পূর্ণ বাহ্য বস্তুনিষ্ঠ। বিজ্ঞানী তাঁর সামনে দেখ্‌ছেন কতকগুলি স্বতন্ত্র বিয়োজক ফ্যাক্ট : তিনি সেগুলিকে গুণে রাখেন কিংবা কেটে আরও কতকগুলি পৃথক ফ্যাক্ট তৈয়ার করে এদের মধ্যে একটি বাহ্যিক যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এক সূত্রে গ্রথিত এই ফ্যাক্টগুলি নিয়ে একটি একক ফ্যাক্টের সৃষ্টি এবং এর সঙ্গে ভিন্ন সত্তাসম্পন্ন আর একটি ফ্যাক্টের সম্বন্ধ অনুরূপ বাহ্যিক। এখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সার মর্ম হচ্ছে, একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করা যাতে এক সত্তার সাথে অপরটি জড়িয়ে না যায়।

এই নীতিই টয়েন্‌বি প্রয়োগ করেছেন ইতিহাস-দর্শনে। সমগ্র মানব-সমাজকে খণ্ডবিখণ্ড করে তিনি পূর্ণচিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন কতকগুলি বিশিষ্ট সত্তাসম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ সভ্য গোষ্ঠী বা সমাজ। টয়েন্‌বির পক্ষে ইহা গুরুতম প্রশ্ন যে পাশ্চাত্য ইয়োরোপীয় সমাজ হেলেনিক সমাজ হতে অবিচ্ছিন্নসূত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে, না সম্পূর্ণ পৃথক সমাজরূপে উক্ত সমাজ হতে জন্ম নিয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে টয়েন্‌বির মতে শেষোক্ত ধারণাটিই সমীচীন এবং প্রথমটি তাঁর কল্পিত ঐতিহাসিক প্রণালী-মতে মারাত্মক ভুল। কিন্তু ইহা কি প্রতীয়মান নয় যে হেলেনিক সমাজ ক্রমিক গতির বেগে নানা বিবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে ? এই পট-উন্মোচনের পথে পূর্ব সভ্যতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ হয়ত জোর পায় এবং কিছু বিলীনও হয়ে যায়, আবার অন্য কতকগুলি বিলুপ্তপ্রায় সত্তা হয়ত আত্মবিকাশের পথ পেয়ে নূতন শক্তি অর্জন করে এবং অন্য-বিষয় বাইরের জগৎ থেকেও টেনে নেয়, কিন্তু সব মিলিয়ে একটি নিখুঁত রূপান্তরের ছবি ভেসে উঠে। একই সভ্যতা

বাইরের আকৃতি বদলে গেলে স্বসত্তা বজায় রেখে নূতন রূপ নিয়ে বেঁচে থাকে না কি? টয়েন্‌বি বলেন যে সভ্যতার রূপ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বও মুছে যায়, নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হয় এবং ঠিক কোন পর্য্যায়ে দুইটি বিভিন্ন হয়েছে সেই সীমান্তরেখাও সুস্পষ্ট। একটি আর একটির সাথে মিশে যায়, ইতিহাসে এ কল্পনার স্থান নেই।

ইহাই পজিটিভিষ্ট দর্শনের স্বাতন্ত্র্যবাদ, যে মতে একটি পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা অন্য সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুনির্দ্দিষ্টভাবে সীমান্বিত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে। এই সত্তার ভিতর-বাহির পারস্পরিক সম্পর্কে বিবর্জ্জিত, যেমন থাকে পাথরের বা বা অন্যান্য জড় পদার্থের প্রাকৃতিক জগতের মূল কথা। কিন্তু মানসিক জগতের বৃত্তি-স্বাতন্ত্র্য বিচ্ছেদাত্মক নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ব্যবধান সৃষ্টি করে বিকশিত হয় না, পরন্তু বাইরের অবস্থাকে ভিতরে টেনে নেবার শক্তিই ইহার বৈশিষ্ট্য। এই হিসাবে মানসিক জগতের, তথা ইতিহাসের, সত্তাবোধ, জড়জগতের সত্তা স্বাতন্ত্র্য হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সন্ধান প্রয়াস দ্বারা ভিন্নদেশীয় সভ্যতার অভিজ্ঞতাগুলিকে নিজের মনে প্রকটিত করে নিয়ে ঐতিহাসিক উক্ত সভ্যতার সমাজ-জীবনের সহিত পরিচিত হ'ন। হেলেনিক সভ্যতার ইতিহাস অনুধাবন করার সময় অনুসন্ধানকারীকে ঐ সভ্যতার কয় পাথার অন্তঃস্থ হতে সমাজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে একীভূত করে নিতে হবে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা এভাবেই গড়ে উঠেছে, নিজের সমাজ-চেতনায় হেলেনিক সমাজের প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করে, সেই প্রাণের সৃজনী শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে নূতন পথে নূতন ভাবে। কাজেই পাশ্চাত্য সমাজের সহিত হেলেনিক সমাজের যোগ মোটেই বাহ্যিক নয়, উহা আভ্যন্তরীন সূত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। এমন কি একথাও বলা চলে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে হেলেনিক সভ্যতার সহিত নিবিড় যোগাযোগে, আলাদা সত্তা হিসাবে নয়। গতিশীল স্রোতের আবর্ত্তনে সভ্যতা রূপ হতে রূপান্তর পরিগ্রহণ করে। এই গতিশীলতাই ইতিহাসের প্রাণ এবং ঐতিহাসিক এই চকল সত্তার অন্যতম অংশ। ইতিহাস ত প্রকৃতির সামিল নয়—অতীত বর্ত্তমানেই বেঁচে থাকে, জড়প্রকৃতির মৃত বস্তুর মত দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় না। ঐতিহাসিকের চক্ষে অতীতের রোমন্থন কি মৃত সাধনা?

টয়েন্‌বি ইতিহাস এভাবে দেখেন নাই। প্রশ্ন উঠে কেন তিনি এ ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ প্রাকৃতিক, সামাজিক জীবনকে তিনি দেখেছেন জড়প্রকৃতির অংশরূপেই, শেষ পর্য্যায়ে অনেকটা জীববিদ্যার পরিবেশে এবং জীববিদ্যাত্মক উপমার আশ্রয়েই তাঁর ইতিহাস-দর্শন বোধগম্য। ঐতিহাসিক তাঁর মনের প্রেক্ষাগারে পুরাতনীকে রূপায়িত করে ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এই প্রেক্ষণ প্রতিফলন ও মনন তাঁর স্বভাব ধর্ম্ম।

কিন্তু টয়েন্‌বির নিকট ইতিহাস একটা বিচিত্র মনোরম দৃশ্য, কতকগুলি ফ্যাক্টের মেলা, নিছক চোখের দৃষ্টির সম্মুখে পরিবেশিত, কোন অভিজ্ঞতার দরুই নয়, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে যার মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। ইতিহাস যেন ঘর ভর্তি ছড়ানো জিনিষ, ঐতিহাসিক সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করে শোভনীয় করে তুলবেন। তাই টয়েন্‌বি ইতিহাসকে একটা ছকে ফেলেছেন—কতকগুলি টিকিটমারা সুবিন্যস্ত কপোত-কক্ষ যার মধ্যে স্ব স্ব ক্ষেত্র অনুযায়ী ফ্যাক্টগুলিকে ভরে দেওয়া হয়েছে। এই ছককাটার প্রণালী অর্থহীন নয়, কিন্তু এর বিপদ এই যে কক্ষস্থিত বিভিন্ন ফ্যাক্টগুলিকে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ হতে বাবচ্ছেদ করে আনতে হবে, ইতিহাসদেহকে ক্ষতবিক্ষত করে।

সভ্যতা মূলতঃ এক এবং বিশ্ব থেকে সভ্যতার স্রোত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো নূতন রূপ পরিগ্রহণ করে—এ মতবাদ টয়েন্‌বি নিঃসংশয়ে অগ্রাহ্য করেছেন। বর্তমান জগতে পশ্চিমী সভ্যতার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের দরুণ যে তথাকথিত একক জগতের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনি আস্থাবান্ নন, কারণ হয়ত ইহা খুবই সাম্প্রতিক। কিন্তু এই যুক্তি প্রাচীন যুগের সভ্যগোষ্ঠি সম্পর্কে খাটে কি? সমাজ-স্বাতন্ত্র্য যদি ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠে (টয়েন্‌বির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত) তাহলে সুমেরীয় ও বাবিলনীয় সমাজ ভিন্ন গোষ্ঠিতে পড়ল কেন? হিটাইট ও সিরিয়াক সমাজের মধ্যেও ধর্মের পার্থক্যের উপর জোর দেওয়া চলে না। হিটাইট ও বাবিলনীয় সমাজের মধ্যে একই ধর্ম বিশ্বাসের প্রচলন দেখা যায়। বাবিলনীয়দের মত হিটাইটদের নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন দেবগোষ্ঠি ছিল এবং যাগ-যজ্ঞ ও বলি-সহকারে মন্দিরে এঁদের পূজা হতো। ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধেও দু' একটি কথা বলা আবশ্যক, ইহা উল্লেখযোগ্য যে টয়েন্‌বি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে এক সমাজ মনে করেন না। ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্লিষ্ট হয়ে India ও Hindu নামে কথিত হয়েছে, এই পার্থক্যের হেতু হ'ল সার্বভৌম ধর্ম,কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এই বিয়োগাত্মক সার্বভৌম ধর্মের সেতু মোটেই স্পষ্ট নয়। আর্য্য-সভ্যতা কি হিন্দু-সমাজের নিকট বিজাতীয়? আমরা ত জানি—"Roots of Hinduism go down to the Rigveda" অন্যদিকে ভারতীয় ও হিটাইট ধর্মের যোগাযোগ প্রামাণিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বোঘাজ্ কই'য়-শিলালিপিতে বেদোক্ত দেবগণের উল্লেখ মিটানিয়ান ও আর্য্য-সংস্কৃতির অন্তিরতার পরিচায়ক।

এসব মন্তব্যগুলি টয়েন্‌বি-অনুসৃত প্রণালী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অন্য বিষয়ে নয়। টয়েন্‌বির ইতিহাস বিস্তারিত জ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডার, ঐতিহাসিক নীতি, মূল্যবোধ ও মানবিচারে তিনি সিদ্ধহস্ত, স্বপ্রতিষ্ঠিত নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি দুর্বল হয় নাই। কিন্তু দু'এক জায়গায় যেন তার আভাসও পাওয়া যায়—অনুসৃত নীতির বেড়াজালে পড়ে কষ্ট-কল্পনা দ্বারা

অসমসাহসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে হেলেনিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় পেলপনসীয় যুদ্ধ থেকে, তারপর চলে দীর্ঘস্থায়ী গতানুগতিকতা; হেলেনিক শক্তি তিমিত হয়ে আসে এবং রোমান সাম্রাজ্য এই পতন-পর্বেরই অংশবিশেষ। প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে রোমের এত অঙ্গাঙ্গী যোগ যে রোমের সত্যতাকে পৃথক সত্তা হিসাবে দেখা ইতিহাস-বিরুদ্ধ হবে, কিন্তু পৃথক সত্তাবিহীন সমাজের অস্তিত্ব ও অবদান টয়েন্‌বি স্বীকার করেন না—তাই হেত্বাভাসে রোমের কীর্তি জড়িয়ে রইলো বিষয়ীভূত হেলেনিক সমাজের ক্লেদাক্ত শৈবালের জালে। লক্ষ্যনিষ্ঠ প্রত্যক্ষবাদীর বিচারে রোমের ঐশ্বর্যভাণ্ডার শুধু হেলেনিক সমাজের বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতার অভিব্যক্তি। তাই প্রশ্ন আসে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক রূপ সব ক্ষেত্রেই চলে কিনা। বাস্তবিক ইতিহাসে জন্মমৃত্যুর স্বরূপ কি? মৃত্যুর মসীরেখায় অঙ্কলীন হয়ে থাকে নবজন্মের সূচনা। ইতিহাসের চলমান পটভূমিকায় মৃত্যুই জন্মের দ্যোতক—জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাধ্যমে বিশ্ববিবর্তনের সোপান তৈরী হয়।

স্বাধীন কাছাড় রাজ্যের শেষ অধ্যায় ও তৎকালীন জীবন

(সরকারী দলিলপত্রের ভিত্তিতে লিখিত)

শ্রীদেবব্রত বসু

কাছাড়ের সর্বশেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আততায়ীদের হস্তে নিহত হন। এই সময়ের মধ্যে প্রায় সাত বৎসর রাজ্যহারা হইয়া তিনি ইংরেজ অধিকৃত শ্রীহট্টে আশ্রয়প্রার্থী রূপে অতিবাহিত করেন এবং যে কয় বৎসর রাজা রূপে নিজ রাজ্যে কাটাইয়াছেন তাহার অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধে বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তৎকালীন কাছাড়ের অবস্থা বর্ণনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার বৎসর খানেক পরেই তুলারাম নামক তাহার এক কর্ম্মচারী জয়ন্তিয়া রাজের সাহায্যে উত্তর কাছাড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ দমনে গোবিন্দচন্দ্রের অক্ষমতা হেতু উত্তর কাছাড় তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তুলারামের বিদ্রোহের মধ্যেই মণিপুররাজ মাজিত সিংহ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে কাছাড় আক্রমণ করেন। মাজিতের সঙ্গে শত্রুতা বশতঃ তাহার দুই ভ্রাতা চোজিত সিংহ ও পত্তীর সিংহ মণিপুর ত্যাগ করিয়া যথাক্রমে জয়ন্তিয়া ও কাছাড়ী রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। মাজিত কাছাড় আক্রমণ করিলে পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার মানসে এই দুই ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হন এবং এর ফলে মাজিত পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্রের দুর্ব্বলতা এমন ভাবে প্রকট হইয়া উঠিল যে তাহার সাহায্যকারী চোজিত সিংহ ও পত্তীর সিংহই তখন গোবিন্দচন্দ্রের সিংহাসনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিদ্রোহী তুলারামের সঙ্গে একযোগে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে এমন অরাজকতা সৃষ্টি করিলেন যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে গোবিন্দচন্দ্র নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইংরেজ অধিকৃত শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ফলে তুলারাম উত্তর কাছাড়ের দক্ষিণাংশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র উপরোক্ত সব বিপদেই পুনঃ পুনঃ ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন; ইংরেজ তখন কাছাড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইংরেজ আর কাছাড়ের ব্যাপারে উদাসীন রহিতে পারিল না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে

সমগ্র অহম রাজ্য ব্রহ্মরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইল; মণিপুর কয়েক বৎসর পূর্বেই ব্রহ্মরাজের করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মরাজ তখন কাছাড় জয়ের তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। কাছাড় ব্রহ্মরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইলে কাছাড়ের পার্শ্ববর্তী ইংরেজ অধিকৃত শ্রীহট্ট বিপন্ন হইবার সম্ভাবনায় ইংরেজ কাছাড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ ইংরেজ ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনৈতিক কারণে কাছাড়ে মণিপুরী আধিপত্য ইংরেজের নিকট নিরাপদ মনে হইল না। তাই ইংরেজ গোবিন্দচন্দ্রকেই করদ-রাজা রূপে কাছাড়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ যদরপুরে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল। গোবিন্দচন্দ্র করদরাজা রূপে ইংরেজ সরকারকে বার্ষিক ১০,০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে গোবিন্দচন্দ্র কাছাড়ের সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন। রাজ্য প্রাপ্তির পর তিনি আবার তুলারামের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহার আশা ছিল এই যুদ্ধে ইংরেজ তাহাকে সাহায্য করিবে কিন্তু কার্যতঃ ইংরেজ এই ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য না করিয়া বরং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাহাকে তুলারামের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। এই সন্ধির ফলে তুলারাম উত্তর কাছাড়ের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব রাজধানী খাসপুরে বাস করা নিরাপদ মনে না করিয়া ইংরেজ অধিকৃত শ্রীহট্টের নিকটবর্তী হরিটিকর নামক স্থানে রাজবাটী স্থাপন করেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন রাজবাটী পরিবর্তন দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই কাছাড়ে কাছাড়ী রাজবংশের অবসান হয়।

কাছাড়ের সরকারী রেকর্ড রূপে রক্ষিত গোবিন্দচন্দ্রের আমলের কয়েকটী সনদ ও ইংরেজ শাসনের প্রথমদিককার দলিল পত্রাদি হইতে গোবিন্দচন্দ্রের সময়কার কাছাড়ী রাজ্যের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার পূর্ববর্তী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হইতে কাছাড়ে নানারকম রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিতে থাকে এবং ইহার ফলে অনেক লোক কাছাড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ইংরেজ দলিলে স্পষ্টভাবেই লেখা আছে যে, এক কালের জনবহুল সমৃদ্ধিশালী কাছাড়ী রাজ্য ইংরেজ অধিকারের প্রাক্কালে একেবারে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আর্থিক দুর্গতি একেবারে চরমে পৌঁছিয়াছিল। অর্থ আদায়ের জন্য তিনি প্রজাদের উপর নানা ভাবে জুলুম করিতে আরম্ভ করেন। অর্থ আদায়ের একটী উপায় ছিল ব্যক্তিবিশেষকে সনদ দেওয়া—যে সনদের বলে সেই ব্যক্তি ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারিত, পাল্কীতে চড়িতে

পারিত এবং উৎসবাদিতে বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত। রাজা অর্থের বিনিময়ে এইরূপ সনদ দান করিতেন। নিম্নে একখানি সনদের নকল দেওয়া গেল।

৺ সুধাকর কুলোদ্ভব পাণ্ডুবংশ প্রকাশিত ছত্রিত কিঙ্কিনওল ভূপাল বৃন্দবন্দ্য হেড়ম্বদিম্বর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ মহারাজাধিরাজ নৃপেন্দ্র বাহাদুরস্যাজ্ঞা সনদপত্রমিদং ৺ সন ১৭৩৮ শালের তারিখে ৬ জৈষ্ঠ মাসে পরগণে বরাক পারয় জমিদার আন ও তালুকধারআন ও রাষ্ট্রের প্রতি হুকুম সাদির হৈলেক মৌজে কনকপুরের পূর্ব্বের প্রমানপত্রের চৌহদ বমজিবে মৌজা মজকুরের শ্রীরঙ্গু মিস্রা ও শ্রীনকি মিস্রাকে তাহার নিজ তালুকের মিরাস ও খরিদামিরাস ও বাইতআন সহিতে এক লখয (?) করিবত পেলমাতে মৌজা মজকুরের চৌধুরিকে বিসয় দিলাম উদার বিবাহের কালেতে মনিসার ও সোনায় খাড়ু ও দেস কমলি ও পাল্কী ও চৌদোল ও নিসান ও খালি নাগারা ও টাশা ও বন্দুক আওয়াজ এইসব রকম চৌধুরি মজকুর চালাইতে হুকুম সাদির হইলেক এবং আপন নিজ বিবাহ পেগাম্বরী (?) ও অন্তের বিবাহ গতাআতে পাল্কী চালাইবেক চৌধুরি মজকুরের টহিতে জমায় দিবেক তৎপর মৌজামজকুরের আবধি জমিধারআন ও তালুকধারণ সমস্তের অগ্রে খুরইপান ও চৌধাই পাইবেক সমস্তের অগ্রেতে চলিবেক চলাইবেক উপরের লিখিতমত উহার বংসাবংসানুক্রমে চৌধুরিকি বিসয় ভোগ করিবেক রাষ্ট্রে নূতন আমলে আসিবেকমিতি সন ১৭৩৮ সাল মাহে ৭ জৈষ্ঠ।

• • • •

রাজার জাত বলিয়া কাছাড়ীদিগকে উপরোক্ত অধিকারগুলি লাভের জন্য কোনরূপ সনদের প্রয়োজন হইত না।

অর্থের বিনিময়ে গোবিন্দচন্দ্র উপাধিও বিক্রয় করিতেন। চৌধুরী, মজুমদার, লস্কর, বড়ুয়া, দাকার ভুঞা প্রভৃতি উপাধিগুলি যথাক্রমে ১০০৲, ৭৫৲, ৬০৲, ৫০৲ ও ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। ব্যবসায় জাতরূপে কাছাড়ীরা এই সব উপাধি গ্রহণ করিত না। কাছাড়ী আমলের এই সব উপাধিগুলি শেষ পর্য্যন্ত পদবীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ভূমিরাজস্ব ব্যতীত গোবিন্দচন্দ্র নানা রকম শুল্ক আদায় করিতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের উপর তিনি শুল্ক ব্যাপারে এত জুলুম করিতে আরম্ভ করেন যে, ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে কাছাড়ের ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পান উৎপন্ন ও লবণ প্রস্তুতের একচেটিয়া অধিকার দিয়াও রাজা ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতেন। বিশেষ প্রয়োজনে কাছাড়ী রাজারা 'ফরমাইস' ও 'বন্ধান' নামক বিশেষ ধরণের খাজনা আদায় করিতেন। সময়মত খাজনা না দিতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শতকরা ৭৫৲ টাকা হারে জরিমানা দিতে হইত।

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর চারিবৎসর পরের একটি মূল্য তালিকা হইতে গোবিন্দচন্দ্রের

আমলের অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের একটি দলিলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এইরূপ মূল্য দেখা যায় :—

চাল (ভাল)	প্রতিমণ	৸০
" (মাঝারি)	"	৷৶০
সুপারী ১৩০০		১৲
তুলা	প্রতিমণ	৫৲
গুড়	"	২৲

গোবিন্দচন্দ্রের আমলে কাছাড়ে দাসত্ব প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। কাছাড়ের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহ হইতে দাস সংগ্রহ করা হইত। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ৪৲ হইতে ৭৲ টাকার মধ্যে একটি সুস্থ সবল দাস খরিদ করা যাইত।

কাছাড়ী রাজ্যের শেষ দিককার অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে কোন বহিঃশত্রুর হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার মত অবস্থা কাছাড়ীরাজের ছিল না। কোন বিপদ উপস্থিত হইলেই তাহারা ইংরেজের শরণাপন্ন হইতেন এবং নিরুপায়ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। বিপদের সময় গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত পত্র হইতে কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করা হইল :—'পূর্ব্বাবধি শ্রীশ্রীযুত কোম্পাণী বাহাদুরের আশ্রিত বহি অন্যাশ্রয় নাহি…' 'আমি একাকী নিরাশ্রয় হৈয়া আপনাদিগকে মুরব্বি করিয়া রাজ্য সাধনাদি করিতেছি…' '…সাহেবান বহি আমার অন্য আশ্রয় নাই…'। গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন নরপতিরূপে এই সব পত্র লিখিয়াছিলেন! ইংরেজের ক্ষমতার উপর কাছাড়ীরাজের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে কোনরূপ সাহায্য না পাঠাইতে পারিলে যেন অন্ততঃ 'এক বাজে টুপিয়ালা সাহেবকে' পাঠানো হয়।

কাছাড়ী রাজত্বে এদেশে জনসাধারণের শিক্ষার কোন রকম ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালে শিক্ষা বলিতে শুধু শাস্ত্রচর্চ্চাই বুঝাইত এবং ইহা মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষার উপর দখল ছিল। ইংরেজ দলিলে দেখা যায় তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কতক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে বাংলা দেশের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কাছাড়ী রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবই এই প্রবন্ধের শেষ বক্তব্য। কাছাড়ীরা উত্তর কাছাড়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়ের সমতল অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিলে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ বিশেষ ভাবে শ্রীহট্ট হইতে বাঙ্গালীরা আসিয়া এই রাজ্যে বসতি স্থাপন করিতে থাকে। গোবিন্দচন্দ্রের আমলে বাঙ্গালীর সংখ্যা কাছাড়ীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কাছাড়ী রাজসভায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের খুব সমাদর ছিল এবং কাছাড়ীরাজ্যের উকিলের পদে

বাঙ্গালীর একচেটিয়া অধিকার ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের আমলে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও সোনারাম শর্মা উকিলের কাজ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ-চন্দ্রের পূর্ববর্তী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেও হরনারায়ণ দেব, মাণিক্য রায় দেব, কেবলকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণনারায়ণ দত্ত রাজার উকিলরূপে কাজ করিয়াছেন। বাঙ্গালী বসতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও এই রাজ্যে অবাঙ্গালীর মধ্যে প্রসার লাভ করে। রাজা গোবিন্দ চন্দ্র স্বয়ং বাংলা ভাষায় রাসলীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রভাব কাছাড়ে এত বৃদ্ধি পায় যে, কাছাড় ইংরেজ অধিকৃত হওয়ার পর কাছাড়ের প্রথম ইংরেজ শাসনকর্তা কেপটেন্ ফিসার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ই আগষ্ট, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এক চিঠিতে লিখেন যে, কাছাড়ের যেরূপ শিক্ষা ব্যবস্থাই করা হউক না কেন তাহা বাংলা ভাষার মাধ্যমে করিতে হইবে।

বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস

শ্রীসুকুমার সেন

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা পাড়তে গেলে প্রথমেই ঠিক করে নিতে হয় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু আর ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। সহজ কথায় বলতে গেলে ইতিহাস পুরাপুরি তথ্যসর্বস্ব এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস অংশত তথ্যনির্ভর এবং অংশত কল্পনানিষ্ঠ। ইতিহাসে কল্পনার স্থান নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে আছে। কাহিনীর পরিকল্পনায় তথ্য-সম্ভারের ঊনতা কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নেবার অধিকার আছে ঐতিহাসিক-উপন্যাস লেখকের। ঐতিহাসিক উপন্যাসের চমৎকারিত্ব অনেকটা নির্ভর করে এই কল্পনা ভেজালের উপর। অনৈতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করবার পক্ষে কোন বাধা নেই, কিন্তু তার কল্পনা ইতিহাসকে অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। গল্পরসের মাদের উপরই উপন্যাসে ঐতিহাসিকত্ব-অনৈতিহাসিকত্ব নির্ভর করে। গল্প-রস সুনির্দিষ্ট দেশ-কালের আধারে (আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় "স্পেস্-টাইম কনটেক্সট"-এ) পরিবেশিত হলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা না হলে নয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নয়, কিন্তু সে ইতিহাসের পরিপূরক। যেখানে ইতিহাস নেই সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাস এরও ক্রম। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস এই ভাবেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। পুরাণকে কেউ ইতিহাস বলবে না, ঐতিহাসিক উপন্যাসও না। তবুও তা ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই পূর্বপুরুষ, ইতিহাসের নয়—যদিও আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে "ইতিহাস-পুরাণ" যমজ ভাইয়ের মত উল্লিখিত হয়েছে।

বাংলা দেশে—বলা বাহুল্য ভারতবর্ষেও—ঐতিহাসিক-উপন্যাসের শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। সংখ্যাতেও তার বিপুলত্বের দাবী আছে। কিন্তু সে সবই শুধু নামে "ঐতিহাসিক-উপন্যাস" বা "ইতিবৃত্তমূলক" উপন্যাস। সত্যিকার ঐতিহাসিক উপন্যাস সংখ্যায় অঙ্গুলি পর্ব অতিক্রমের দুরাশা রাখে না। ঐতিহাসিক কেন, যে কোন উপন্যাসের, বাজার-দর যখন সবচেয়ে চড়া ছিল, সেই বিগত শতাব্দীর শেষ তিরিশ বছরে লেখকেরা ইতিহাস থেকে গুটিকতক নাম এবং/অথবা মোটামুটি ঘটনা কিছু কিছু নিয়ে যখেচ্ছ এবং উদ্দাম কল্পনার খাদ মিশিয়ে "খাঁটি কেমিকেল গিনি সোনার গয়নার" মত "ঐতিহাসিক উপন্যাসে"-এ সাহিত্যের বাজার ছেয়ে ফেলেছিলেন। বাংলা দেশে যা ঘটা অসম্ভব এবং বাঙালীর জীবনে যা একেবারে অসম্ভাবিত এমন কাহিনী পরিবেশন করতে গেলে "ঐতিহাসিক" উপন্যাসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। আরব্য উপন্যাসকে যদি এসিয়ার

নিকট-প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইতিহাস বলে ধরে নেওয়া যায় তবে এগুলিকেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে হয়। তবে এঁদের প্রচেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তাও বলতে পারি না। ইতিহাসের কোন কোন কাহিনীকে উপন্যাসের (এবং নাটকের) মধ্য দিয়ে সাধারণ পাঠকদের কাছে সুপরিচিত করেছিলেন এঁরা, এবং তা আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনাকে কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে কথা স্বীকার করতে হয়।

বর্তমানের দাবীকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করলেই তবে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা জাগে, এবং এতেই মানব-সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগের উদ্বোধন। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হঠাৎ কিছুদিনের জন্যে আমাদের দৃষ্টি পাশের খেয়াতরীর প্রত্যাশা ছেড়ে বর্তমানের ঘাটের উপর পড়েছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রবল ব্যক্তিত্ব অতীতের মোহ খানিকটা কাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? তাঁর তিরোভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার যে কে সেই। তা অসম্ভাবিত নয়, কেননা দেশে তখন আধুনিকতার প্রগতি কোথায়? ভারতীয় মানুষের কাম্য পুরুষার্থ ছিল দুটির মধ্যে একটি, অর্থ অথবা পরমার্থ। এ দুইয়ের বাইরে যে কিছু অন্বেষণীয় থাকতে পারে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও ব্যক্ত চেতনা তখনো জাগ্রত হয় নি। সুতরাং ভক্তিবল ও শক্তিবল ছাড়া তৃতীয় যে মানব-বল ইতিহাস-চেতনা ও বিজ্ঞান-বল (বিজ্ঞান-বোধ) তখনও বহুদূরে। কিন্তু বিদেশে কালের হাওয়া ফিরেছে। সে হাওয়ার তন্ত্রী চালিয়ে এসে বিদেশী বণিক্ এদেশে গতায়াত সুরু করেছে। তাই সে হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক জনগণের চিত্তে। সাহিত্যে তার ঢেউ লাগল ঐতিহাসিক ছড়ায়, পাঁচালী এবং ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতায়। ধর্ম ও সাহিত্য সাধনার গতানুগতিকতার মধ্যে সংশয়ের কাঁটা গজাতে লাগল। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের লেখক এক সাধক-কবি প্রাচীনতর কবির ভক্তিবিশ্বাসের উপর কটাক্ষ করে লিখলেন—"বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে পথে চণ্ডী দিলা দরশন।" অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিশ্বাসশিথিলতার ছাপ নিতান্ত অস্পষ্ট নয়। তাঁর অগ্রগামী কবি রামেশ্বর শিবকে চাষী করেছেন, খেলো করেন নি। ভারতচন্দ্র দেবতাকে উঁচু সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনেছেন। কর্তাভজা বৈষ্ণব, সুফী ও খ্রীষ্টান মতের সমন্বয় করে তাঁদের গোষ্ঠীসমাজে অবাধ উদারতার খোলা হাওয়া বইয়ে দিলেন।

ভারতচন্দ্রের সময় থেকে রামমোহন সেনের সময় পর্যন্ত (শতাব্দীতে ১৭৫০—১৮৫০) ইতিহাস কথাটি চলে এসেছিল গল্প কাহিনী অর্থে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর শেষে ভারতচন্দ্র বলেছেন "ইতিহাস ভৈল সার ভারত ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামেশিলা।" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ফারসী তুতিনামার হিন্দী রূপান্তর তুতি-কহানী তর্জমা করলেন তোতা-ইতিহাস নামে (১৮৫০)। ইংরেজি Persian

Tales-এর অনুবাদ হ'ল পারস্য-ইতিহাসে (১৮৩৪)। কাহিনীর নাম যখন ইতিহাস ছিল তখন ইতিহাস বলতে বোঝাত রাজবংশাবলী—সংস্কৃত পুরাণের অনুবর্তনে। বাঙালীর লেখা ইতিহাস জাতীয় প্রথম বই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী" (১৮০৮) তাই রাজানুক্রমনী ছাড়া কিছু নয়।

মৌলিক ইতিহাস বই লেখার অনেক আগেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বাঙালী লেখকের দৃষ্টি পড়েছিল। টডের রাজস্থান-কাহিনী (১৮২৯-১৮৩২) যেমন কাব্য-সাহিত্যে তেমনি উপন্যাসেও আধুনিকতার মূল উৎস। এ ইতিহাসে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে কাহিনী—এবং রোমান্টিক কাহিনী। সুতরাং বাঙালী পাঠক-লেখকের পক্ষে তোতা ইতিহাস থেকে রাজপুত-কাহিনীতে ঝাঁপিয়ে পড়া স্বাভাবিকই হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীর কবিতা রচনা প্রথম শুরু হয়েছিল ইংরেজিতে। ঐতিহাসিক কাহিনীর বেলায়ও এর অন্যথা হয় নি। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রামবাগানের কেশবচন্দ্র দত্ত কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত গল্প লিখে প্রকাশ করেছিলেন Tales of Yore(১) নামে। ১৮৭৭ সালে এই গল্পগুলি তিনি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে দিয়ে বাঙালায় অনুবাদ করিয়ে এবং হরিশ্চন্দ্র কবিরত্নকে দিয়ে শোধন করিয়ে গিরিশ বিদ্যারত্নের যন্ত্রে ছাপিয়েছিলেন 'উপন্যাসমালা' সাদানীয় নামে। বইটিতে সবশুদ্ধ চব্বিশটি গল্প আছে। প্রথম গল্প ("রঙমহলের বংশ") আলেকজান্দারের সময়ের, দ্বিতীয় ("ইরাণী যণিক্") কনৌজে এক সাদানীয় রাজপুত্রের রোমান্স, তৃতীয় ("গড় বিত্‌লি") খলিফা ওমরের সময়ে মুসলমানদের দ্বারা আক্রমণীয় অধিকার ঘটিত, চতুর্থ ("আলোর বিজয়ী" মহম্মদ বেন কাসেমের বৃত্তান্ত") সিন্ধু প্রদেশে মুসলমান অধিকার সম্বন্ধীয়, পঞ্চম ("কনোজ সুন্দরী") গজনীর মামুদের সময়ের ঘটনা, ষষ্ঠ ("তিরোরির যুদ্ধ") পৃথ্বীরাজের কাছে মহম্মদ ঘোরীর পরাজয় কাহিনী, সপ্তম ("কুতব-উদ্দীন আইবেক") দিল্লীতে দাস-বংশের অধিকার কালের ব্যাপার, অষ্টম ("মহম্মদ ঘোরীর শেষ দশা") নবম ("বিমাতার উপদ্রব") আলতামশের পুত্র নাসীরুদ্দীন মাহমুদের বৃত্তান্ত, দশম ("বেকোবাদের শেষ দশা"), একাদশ ("পাপ করিলেই ভুগিতে হয়") আলাউদ্দীনের রাজ্য-কালের দ্বিতীয় বর্ষের একটি কাহিনী, দ্বাদশ ("পদ্মিনী উপাখ্যান") ত্রয়োদশ ("জাবুলা অধিকার") তীলদের সহযোগিতায় রাজপুতদের পরাজয় করে আলাউ-দ্দীনের তীলদের দেশ অধিকার কাহিনী, চতুর্দশ ("দেবল দেবী") আলাউদ্দীনের পুত্র খিজিরখাঁর রোমান্স কাহিনী(২) পঞ্চদশ ("রাজধানী পরিবর্তন") মুহম্মদ-

১। "প্রায় ৩২ বৎসর হইল, আমি এই উপন্যাসগুলি ইংরেজিতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম।... অনুবাদকের সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত গ্রন্থকারেরই লিখন।" [বিজ্ঞাপন]।

২। গল্পের পত্তন হয়েছে ইলোরা গুহার বর্ণনায়। আসীর অমরুর কাব্যের উল্লেখ আছে।

ভূদেবের বৃত্তান্ত, ষোড়শ ("তৈমুরলঙ্গের দয়া") সপ্তদশ ("সমরাদ্রি সিন্ধি") সিকন্দর লোদীর যাত্রার গল্প, অষ্টাদশ ("বেওয়ারের রাণা সঙ্গ") ঊনবিংশ ("হুমায়ুনের পলায়ন") বিংশ ("কি ভয়ানক কাগজ!") শেরশাহ ও মালোয়াড়ের মালদেবের কাহিনী, একবিংশ ("নরোজা") আকবরের সময়ের ঘটনা, দ্বাবিংশ ("অমর সিংহের দরওয়াজা") শাহজাহানের আমলের বৃত্তান্ত, ত্রয়োবিংশ ("বাদশাহের হুকুম তামিল") আরংজেবের একটি কাহিনী, চতুর্বিংশ ("মরাঠার যার হোলকার শানীপথের যুদ্ধের এক দেশ"। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে খৃষ্টপর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের দু হাজার বছরের ছেদ টানা হয়েছে শশিচন্দ্রের এই আখ্যায়িকাগুলিতে।

বাংলায় লেখা মৌলিক ঐতিহাসিক গল্প প্রথম লিখলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কন্‌টারের "রোমান্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরি" অবলম্বনে ইনি দুটি গল্প লিখে প্রকাশ করলেন "ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামে (১৮৫৭)। প্রথম গল্প ("সফল স্বপ্ন") নিতান্ত ছোট এবং মৌলিকত্ব বর্জিত। দ্বিতীয় ("অঙ্গুরীয় বিনিময়"),(১) দীর্ঘতর এবং অনেক অংশে মৌলিক রচনা। শিবজীর হাতে বন্দিনী আরংজেবের কন্যা রোসনারার শিবজীর প্রতি বিফল অনুরাগ কাহিনীর বিষয়। এই ব্যাপারটি নিয়ে কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী তাঁর "ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস" "রশিনারা"য় (১৮৬৯) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। ভূদেবের গল্পটির বিশেষ মর্য্যাদা আছে। এটি বঙ্কিমচন্দ্রকে "দুর্গেশনন্দিনী"র কাহিনী পরিকল্পনায় অনেকটা আদর্শ যুগিয়েছিল (২)। রশিনারার ঐতিহাসিক পরিবেশ ভালো করেই ফুটেছে।

ভূদেবের অনুসরণ করলেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় "ভারতীয় উপাখ্যান"-এ (আত্মিমগঞ্জ ধনসিন্ধু যন্ত্র ১৮৬৩)। এটির মূলও "রোমান্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরি"।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম পর্ব, রাজপুত-কাহিনী, এর উৎস টডের গ্রন্থ। সে পর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব সুরু হল বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে (১৮৬৫)। এ পর্বের বিষয় প্রধানত স্থানীয় ইতিবৃত্ত বিজড়িত রোমান্টিক কাহিনী; উৎস, স্কট—হাণ্টার—ইলিয়টের বই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসের কাহিনী ইতিহাসাশ্রিত। কিন্তু রাজসিংহ ছাড়া আর কোনটিকে খাঁটি ঐতিহাসিক বলা চলে না। রাজসিংহ পাকা লেখা, বিশেষ করে পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ। বইটি লেখবার সময় আনা ইতিহাসের বই সবই তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের ঝোঁক ইতিহাসের উপর ছিল না। ছিল রোমান্সের উপর। তবুও রাজসিংহেও ঐতিহাসিক সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হয় নি।

১। "দি মাস্কোট চীফ্" অবলম্বনে। ২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ১৩৬।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪) উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কাছে তুচ্ছ, যদিও লালবিহারী দে বইটিকে বঙ্কিমের রচনার উপরে স্থান দিয়েছিলেন 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ সমালোচনায়। বিষয় প্রতাপাদিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী বা ভারতচন্দ্রের মানসিংহ সাধারণ পাঠকের কাছে অতি পরিচিত করেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) বাঙালীর লেখা প্রথম ছাপা গদ্য কাহিনী। অনেক দিন ধরে এটি পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত ছিল। প্রতাপচন্দ্রের বই বৃহৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত বড় উপন্যাস আর লেখা হয়নি। প্রতাপচন্দ্র যথাসম্ভব ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন এবং নিজেও তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতাপাদিত্যের পুরাকীর্তির অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ। পুরাতত্ত্ব গবেষণায় তাঁর প্রবণতা ছিল। যাশো কুঁইঞা ও সুন্দরবনের ঐতিহ্য বিষয়ে সোসাইটির পত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছিল তার থেকেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। বইটির আর একটি বড়ো বৈচিত্র্য হচ্ছে লিথো-চিত্রগুলি। এগুলিতে রায়গড়ের স্থানীয় চিত্র, সেকালের যোদ্ধার ও অস্ত্রশস্ত্রের ছবি আছে। এত আয়োজন ও আয়াস স্বীকার করে তাঁর আগে এবং অব্যবহিত পরেও কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন নি। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে বহুনাবস্তুও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সবশুদ্ধ যেন কালানুগতি যেন হয়ে উঠেছে। প্রতাপচন্দ্র লিখতে পারতেন না, তার উপর তাঁর অত্যন্ত ঝোঁক ছিল আভিধানিক শব্দের উপর (—দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে তাঁকে দুরূহ শব্দের নির্ঘণ্ট দিতে হয়েছিল), সুতরাং বাঙালা সাহিত্যের এই বৃহত্তম উপন্যাসটির আদর সাধারণ পাঠক সমাজে হয় নি। তবে অসাধারণদের চোখ এড়ায়নি। বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রথমখণ্ড রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং সে পড়া যে নিষ্ফল হয় নি তার জলন্ত প্রমাণ বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮২), তখনও প্রতাপচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয় নি। আরও একটি প্রমাণ আছে। বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের শেষে "ত্রিপুরেশবংশাবলীচরিত" খানিকটা উদ্ধৃতি আছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস রাজর্ষির পরিশিষ্টরূপেও সংস্কৃতে লেখা ত্রিপুরার রাজবংশাবলী থেকে খানিকটা উদ্ধৃত আছে। পরবর্তী অধিকাংশ স্থানীয় ঐতিহ্যমূলক উপন্যাসে অল্পবিস্তর বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রভাব পড়িয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমের কৃতী শিষ্য হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমের মত ইনিও রোমান্টিক ঔপন্যাসিক, তবে রমেশচন্দ্রের ইতিহাসে অনুরাগ ও অধিকার বঙ্কিমের চেয়ে বেশি ছিল। তার প্রমাণ লেখার মধ্যেই মিলবে। রমেশচন্দ্র সবশুদ্ধ ছখানি উপন্যাস লিখেছিলেন, প্রথম চারখানি ঐতিহাসিক, শেষ দুখানি পারিবারিক-সামাজিক। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) "সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাস"

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) আরংজেবের সময়ের সামাজিক ঐতিহাসিক উপন্যাস, মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) সাজাহানের সময়ের, রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) জাহাঙ্গীরের সময়ের। এই চারখানি কমবেশি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী শতবর্ষব্যাপী চারপুরুষের রাজত্বকালে পরিকল্পিত বলে এগুলি "শতবর্ষ" নামে সঙ্কলিত হয়েছিল (১৮৭৯)। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা ইতিহাসের বেশি অনুগম, রোমান্সের আতিশয্যও নেই। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনায় বলে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে উপন্যাস রচনায় পথ দেখিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্রও তেমনি কোন কোন ব্যক্তিকে একাজে প্ররোচিত করেছিলেন। যদিও বঙ্কিমের মত রমেশের প্ররোচনায় কোন ভাল ফল মেলেনি। এই রকম এক রমেশশিষ্য হচ্ছেন কেত্রগোপাল রায়। রমেশচন্দ্র যখন মেহেরপুরে অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন ইনি সেখানে সাবডেপুটি। সেই সময়ে ইনি যগির হাঙ্গামাকে কীণতম পটভূমিকা করে একটি "ঐতিহাসিক উপন্যাস" লিখেছিলেন ইন্দ্রকুমার নামে। বইটি ছাপা হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এবং উপহৃত হয়েছিল বিহারীলাল গুপ্তকে। রমেশচন্দ্র উপন্যাসটি দেখে দিয়ে ছাপাতে অনুরোধ করেছিলেন বলে লেখক ভূমিকায় ঘোষণা করেছেন। রমেশচন্দ্র ভালো কাজ করেননি।

সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় পরিকল্পিত হয়েছিল গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৭৩)। সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম বীর তাঁতিয়া টোপির কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছিল, কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়' এবং প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তাঁতিয়া ভিল' (১৮৮৯)। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন দুখানি "ঐতিহাসিক উপন্যাস"। 'মায়াবিনী'-র (১৮৭৭) বিষয় গজনীর মামুদের ভারত আক্রমণ, 'বীরবরণ'-এর (১৮৮৩) বিষয় বৌদ্ধ রাজাকে পরাজিত করে শৈব রাজা আদিশূরের বঙ্গবিজয়-কাহিনী।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'-এর (১৮৭৬) (১) বিষয় পৃথ্বীরাজের পরাজয় কাহিনী। টডের রাজস্থান-কাহিনী, পৃথ্বীরাজ রাসৌ, ইলিয়টের ও এল্‌ফিন্‌স্টোনের ইতিহাস, এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল (১৮৬৪), কানিংহামের পুরাতত্ত্ব-বিবরণী (চতুর্থ খণ্ড) ইত্যাদি বই থেকে গল্পের মালমশলা সংগৃহীত হয়েছিল। দীর্ঘ ভূমিকায় ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভারতে বারুদ-কামানের ব্যবহার প্রচলন। এবিষয়ে লেখিকা বলেছেন যে, তাঁর কোন আত্মীয় "ভূমিকামধ্যে কামান ব্যবহার বিষয়টী কিছু বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া লিখিতে অনুরোধ করেন।" শুধু পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের জন্যেই তরুণ লেখিকার বইখানি প্রশংসনীয় নয়। আরও বড়ো কথা হচ্ছে পরাধীনতার জন্যে বেদনা-বোধের প্রেরণা। ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র করে সেকালে যে গঠনাত্মক, আত্মমর্যাদাবান্

(১) এঁর লেখিকার নাম ছিল না।

জাতীয় চেতনার উদ্বোধন হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্ব্বাণ' তারই একটি প্রকাশ। বইটি লেখিকা তার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন একটি কবিতা লিখে। এই কবিতার শেষটুকুতে লেখিকার মনোভাবের প্রকাশ আছে।

আর্য্য-অধমতি কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়াছে চলি
ঢেকেছে ভারত ভানু ঘনমেঘ জাল—
নিভেছে সোণার দীপ ভেঙ্গেছে কপাল!

তুর্কী-রাজপুত-মোগল-মারাঠা ইতিহাসের বাইরে দ্বিতীয় পর্য্যের "ঐতিহাসিক উপন্যাস"-এর বিশিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও স্থানীয় কিংবদন্তী। এগুলি অধিকাংশই তুচ্ছ রচনা। তবে ঐতিহাসিকের কাছে একেবারে অপাংক্তেয় নয়। এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট বইগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

রামগতি ন্যায়রত্নের 'ইলছোবা' (১৮৭২) তাঁর স্বগ্রামের কিংবদন্তী নিয়ে বিন্যাসাগরী আখ্যায়িকার ধরণের লেখা। খ্রীষ্টীয় পনের শতকে স্থানীয় মুসলমান শাসকের কাছে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ অধিদারের পরাভব এই কাহিনীর বীজ। কাহিনীর পরিকল্পনায় স্থানীয় ভূভাগের (topography) যোগ কৌশলের পরিচায়ক।

হারাণচন্দ্র রাহা কাছাড়ের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করে লিখেছিলেন 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬)। উপাদান লেখক কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তা ভূমিকায় বলে গেছেন। স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসের মধ্যে এটি বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এধরণের উপন্যাস যে সবই সাহিত্যসৃষ্টিপ্রয়াসের ফল তা নয়। কৌতূহল ও প্রত্নানুসন্ধিৎসাও কয়েকজন লেখককে উৎসাহিত করেছিল। এইরকম একজন কেদারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বসিরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত বালতার বিখ্যাত পীর গোরাচাঁদের জনশ্রুত আখ্যায়িকা নিয়ে 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৮) নামে "ঐতিহাসিক-উপন্যাস" লিখেছিলেন। বইটি নিতান্ত বাজে লেখা। তবে ভূমিকায় ইঙ্গিত মূল্যবান্। সেকালের অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকও যে কতটা ওয়াকিব-হাল ছিল তার প্রমাণ এতে মেলে।

রচনার দিক দিয়ে নয় "কয়েকটী কথা" নামক ভূমিকার দিক দিয়ে মূল্যবান্ আর একটি স্থানীয় ইতিহাস মূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে চন্দ্রকোণা নিবাসী প্রবোধচন্দ্র সরকারের 'শালমূল' (বাঁকুড়া মুখার্জ্জী প্রেস ডিসেম্বর, ১৮৯৭)। গড়বেতার রাজা যাদবচন্দ্র সিংহের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে বিবাদ হয়েছিল ১৭৮৫ সালে এবং যাতে রাজার অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও গড়বেতা অঞ্চলের নায়েকরা কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল সেই পটভূমিকায় উপন্যাসটি

পরিকল্পিত হয়েছে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এইচ্-এস্ ভ্যান্সিটার্ট বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে যে আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন (১৮৭২-৭৩) তা এবং স্থানীয় ঐতিহ্য লেখককে বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে। লেখক বইটি লিখেছিলেন বিদ্রোহী নায়েকদের উপর সম্পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে। কিন্তু ছাপাবার সময় সে সহানুভূতি তিনি সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন ভূমিকায়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেনের বইগুলি একটু স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে। এঁর 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫), 'মেজর্যান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬) ও 'অযোধ্যার বেগম' (১৮৮৭) বইগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ইতিহাসের অনেকখানিই প্রামাণিকভাবে সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত হয়েছে। বইগুলি আকারে ক্ষীণকায় নয়, এবং অতিশয় তথ্যপূর্ণ। এগুলিকে ইতিহাস বললে খুব ভুল করা হবে না যদিও উপন্যাস বলতে হয় তো অনেকের আপত্তি হতে পারে। অযোধ্যার উপর চণ্ডীচরণের টান একটু বেশি ছিল, তাই এ বিষয়ে আরও একটি বই লিখেছিলেন "এই কি রামের অযোধ্যা"? (১৮৯৫)। ঝান্সীর রাণীকে নিয়েও ইনি একটি উপন্যাস-বনাম-ইতিহাস লিখেছিলেন।

দক্ষিণরাঢ়ের এক ঘরোয়া বিবাদ কাহিনী অবলম্বন করে প্রাচীন সাহিত্যরসিক অম্বিকাচরণ গুপ্ত নতুন ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন 'পুরাণ কাগজ বা নবীন নকল' নামে (১৮৯৯)। বইটি আগাগোড়া চিঠিপত্র ও আর্জি জবাব রূপে লেখা। আরও দুটি উপন্যাসে অম্বিকাচরণ স্থানীয় ঘটনাকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করেছিলেন। 'কপট সন্ন্যাসী' (১৮৭৪) তারকেশ্বরের মোহন্তের ব্যাপার নিয়ে লেখা। 'কমলে কণ্টক'-এর উপজীব্য এক নারীহরণ কাহিনী।

দক্ষিণরাঢ়ের এক দুর্দ্ধান্ত জমীদার পত্নীর কাহিনী নিয়ে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য 'বাঘ বাঘিনী' লিখেছিলেন বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ঝড় উপলক্ষ্য করে নবীনচন্দ্র সেন একটি আখ্যায়িকা লিখেছিলেন 'ভানুমতী' নামে (১৯০০)।

দ্বিতীয় পর্ব্বের লেখকদের মধ্যে দুজনের কথা এইবার আলাদা করে বলছি। শক্তিশালী এবং সংবেদনশীল লেখকের রচনায় ইতিহাস-উপন্যাসের ভেদ রেখা যে লুপ্ত হয়ে যায় তার প্রথম পরিচয় মিলল সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এ (১৮৮৩)। বইটি ইতিহাস হিসেবে নিখুঁত এবং উপন্যাস হিসেবে চিত্তাকর্ষক।

সঞ্জীবচন্দ্রের একটি উপন্যাসে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে বলা যেতে পারে। এঁর

'কণ্ঠমালা'-য় (১৮৭৭) (১) যে মহাকুলীন সম্প্রদায়ের আদর্শ উদ্ঘাটিত হয়েছে তা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে পল্লবিত হয়ে একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়মঠে অপর দিকে বাঙালী ছেলেদের অনুশীলন সমিতি প্রভৃতিতে পরিণতি পেয়েছে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ'-ও (১৮৯৬) তাই। (২) অবশ্য দস্যুবৃত্তান্তের বইয়ের অনুপাতে এতে কল্পনার ভাগ বেশি হতে বাধ্য। বিশে ডাকাতের এই কাহিনীর অনেক উপাদান লেখক নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথমে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় প্রথম সরকারি চাকুরি নিয়ে গিয়ে। পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) নদীয়া ভ্রমণ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধে বিশে ডাকাতের কথা কিছু ছিল। উপন্যাস আকারে বইটি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়ে ছিল সাহিত্যে। বিশ্বনাথে অত্যন্ত সুরুচিত বই। লেখকের সংবেদনা গ্রন্থের নায়ক চরিত্রে কমনীয় রঙ ফলাইয়াছে। অথচ ইতিহাসের মর্য্যাদা একটুও খাটো করা হয়নি। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকের ঐতিহাসিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে কৃতকার্য্য হয়েছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'ব্রজনাথের বিবাহে' যদিও বইটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে গল্পলোভী পাঠক সমাজে সবচেয়ে সুপরিচিত ছিলেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্রের পদবী অনুসরণে ইতিহাস ও কল্পনাকে সমান মর্য্যাদা দিতে চেষ্টিত না হয়ে, গল্পরসের গাঢ়তা সম্পাদন দ্বারাই ইনি মোগল অন্তঃপুরের ভীষণ রমনীয়তার মোহকরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। এঁর 'রঙমহাল'-এর (১৯০৫) গল্পগুলিতে অপরিণত মনস্ক পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের অসামান্য গুণ আছে। হরিসাধন ইতিহাসের চর্চ্চা করতেন কতকটা সখে। তাঁর রচনায়ও এমেচারত্বের ছাপ আছে। হরিসাধনের অনুকারী অনেক জুটেছিল। বাল্যপঠিত সেসব রচনার মধ্যে চিত্তচমৎকারিত্বে বিনোদবিহারী শীলের 'বেগমমহল' এখনও আমার মনে একটু ছাপ রেখেছে যদিও কাহিনী কিছুই মনে নেই।

বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্র সঞ্জীবচন্দ্রও এই সময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে যশোলাভ করেছিলেন। এঁর সেকালের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বাঙ্গালীর বল' (বিঃ ১৩১৮) সুলতান গিয়াসুদ্দীনের বাংলা বিজয়ের পটভূমিকায় লেখা।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব্বে বিষয় বস্তু কাহিনী বা স্থানীয় ইতিবৃত্ত নয়, ভারতবর্ষের বৃহদংশের ইতিহাস, এবং এর দেবতা লেখকেরা স্বয়ং অর্থাৎ লেখকেরা শুধু ইতিহাসবিদ্ নন, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং গবেষণাকারী। এঁরা

(১) বিংশ পরিচ্ছেদে। (২) বইটির একটি ইংরেজি নামকরণও আছে। তাতে বইটির নাম Biswanath or the Robin Hood of Bengal. (A Historical Novel)।

উপন্যাস রূপে বা উপস্থিত করেছেন তার উপাদান কতক অংশে এঁদের নিজেদেরই আবিষ্কার। রচনাতে এঁরা ইতিহাসের খাদে যতটাই কল্পনা মিশিয়ে থাকুন তাতে ইতিহাসের রূপ উজ্জ্বলতর, বাস্তবতরই হয়েছে। এঁদের উপন্যাস ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছে। ইংরেজি ইতিহাস লেখকদের কাছে এঁরা কিছু মাত্র ঋণী নন। পরাধীনতা সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদের গূঢ় গর্ব্ব এইসব রচনাকে দৃঢ়তর করিয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা বাদ দিলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্ব্বের একমাত্র লেখক। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে মোহেঞ্জোদরোর পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কারের কৃতিত্ব এঁরই প্রাপ্য।

রাখালদাসের প্রথম বই 'পাষাণের কথা' (১৩২১) (১) গল্প রসহীন এবং নীরস ইতিহাসের তথ্যবহুল। সুতরাং পাঠকের নজরে পড়েনি। দ্বিতীয় উপন্যাস 'শশাঙ্ক' (১৩২১) (২) সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্ন দশার চিত্রশালা। এই বইটির ভূমিকায় রাখালদাস ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সার্থক এবং প্রণিধানযোগ্য।

তারপর রাখালদাস লিখলেন 'ধর্ম্মপাল' (১৩২২)। (৩) বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে যুগে জাতি নবযৌবনের স্বপ্ন দেখছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা ও যোদ্ধা এই কাহিনীর নায়ক। প্রবাদপ্রতিম কবির কথা সত্য হলে পাল-সম্রাট-শ্রেষ্ঠের জীবৎকালেই এঁর কীর্ত্তিগাথা লোকের মুখে মুখে ফিরত।

এর পরই রাখালদাসের দৃষ্টি পড়ল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বীরশ্রেষ্ঠ স্কন্দগুপ্তের উপর। যাঁর ধৈর্য্য ও বীর্য্য, সংযম ও সাহস, তিতিক্ষা ও শৌর্য্য গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন বেশ কিছুকালের জন্যে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

সমসাময়িক কবির শ্লোকগুলিই পঞ্চম শতাব্দীর এই যাদবীরকে উপন্যাসে বিচিত্র করবার প্রবৃত্তি দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ্‌কে। তার ফল 'করুণা' (১৯১৮)। (৪) লেখক এটিকে শশাঙ্কের মত "ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা" বলেছেন, এবং ভূমিকায় পাঠকদের সাবধান করে দিয়েছেন, "ভরসা করি কেহ ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না।"

করুণা-শশাঙ্ক-ধর্ম্মপাল এই তিনটি উপন্যাসে উত্তরাপথের ইতিহাসের ছেদ টানা হয়েছে পঞ্চম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত। লেখকের তথ্য সংযোজনে এখানে ওখানে ত্রুটি থাকতে পারে, নতুন আবিষ্কারের ফলে কোন কোন তথ্য

(১) 'হেমকণা' নামে প্রবাসীতে ও পরে যে নামে মানসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (১৩১৯)।

(২) প্রথমে সাহিত্যে (অধিকাংশ) পরে মানসীতে (সম্পূর্ণ) প্রকাশিত।

(৩) প্রবাসীতে (১৩২১-২২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

(৪) উপাসনায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত।

অতথা প্রতিপন্ন হতে পারে কিন্তু তাতে করে উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিকত্ব টুটবে না। আর কিছু না হোক "পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব যুবরাজ ভট্টারক কর্মগুপ্তদেব," "পরমবৈষ্ণবী পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী," "যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহামণ্ডলেশ্বর মহানায়ক মহামন্ত্রী দামোদর দেব শর্মদেব," "মহাসন্ধিবিগ্রহিক অনিরুদ্ধ", "কুমারপাদীয় মহানায়ক কৃষ্ণগুপ্ত", "মহাদণ্ডনায়ক রামগুপ্ত"—ইত্যাদি নামগুলি আমাদের মনে সামন্ততন্ত্রাধিষ্ঠিত গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের প্রবল ও প্রশস্ত কালটিকে উজ্জ্বল আভায় মণ্ডিত করে মহনীয়, লোভনীয় করে তুলেছে।

রাখালদাস আরও দুখানি ঐতিহাসিক-উপন্যাস লিখেছিলেন। 'ময়ূখ' (১৩২৩) সাজাহানের সময়ে পরিকল্পিত। এতে বাংলায় পোর্তুগীজ পাদ্রিদের ধর্ম প্রচারের উৎকটতার ছবি আছে। রোমান্টিকতায় রঁাঁর একটু বেশি থাকলেও রচনা উজ্জ্বল ও উপভোগ্য। 'অদৃষ্ট' (১) বড়ো বই। কাহিনী নবাবী আমলে পরিকল্পিত এবং ভালো জমে নি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাখালদাসের শিক্ষা গুরু। 'শশাঙ্ক' এঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। হরপ্রসাদের একটি ঐতিহাসিক বড়ো গল্প, 'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে ১২৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। (২) হরপ্রসাদের রচনারীতি সহজ ও সরল, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস জমিয়ে তোলবার মত ছিল না। তা ছাড়া বস্তুও খুব সারবান্ নয়। সেইজন্যে রচনাটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক হয় নি। কিন্তু এ অভিযোগ তাঁর 'বেণের মেয়ে'র (১৯১৯) (৩) সম্বন্ধে খাটে না, ষ্টাইলের সমুতা সত্ত্বেও।

কয়েকটি অবান্তর ভূমিকার নাম (যেমন, পুই-পা, হরিবর্মদেব, ভবদেবভট্ট) ছাড়া বেণের-মেয়েতে ঐতিহাসিক বলতে কিছু নেই। কাহিনী সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের—বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার—পল্লীজীবনের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন লেখক। লেখকনির্দিষ্ট স্থান কালের বেড়াকে একটু আধটু সরিয়ে নিলে ছবিগুলিকে ঐতিহাসিক বলা চলে। রচনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য। (৪)

---

১ প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষে ১৩২৬ হইতে। ২ পুস্তকাকারে ১৩৪২ সালে। ৩ মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত।

৪ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু-শিষ্যের কৃতিত্ব এক সঙ্গে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের-মেয়ে' ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' 'ধর্মপাল' প্রভৃতি উপন্যাস ইতিহাসজ্ঞান ও কল্পনা-নৈপুণ্যের অভাবে পঠিতব্য নয়।" [বাংলা উপন্যাস, বিশ্বভারতী প্রকাশিত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, পৃ৩৯-৪০।

'ইতিহাসজ্ঞান ও কল্পনা-নৈপুণ্যের' মানে ঠিক বোঝা গেল না।

সমুদ্রগুপ্তকে নায়ক করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চলিত ভাষায় একটি ঐতিহাসিক-উপন্যাসের পত্তন করেছিলেন 'ভূতা নিধন' নামে। ১

কবির অকাল মৃত্যু না হলে বইটি সম্পূর্ণ হয়ে বাংলা ঐতিহাসিক-উপন্যাসের সম্পদ বৃদ্ধি করত।

উপাদানের দিক দিয়ে বাংলা ঐতিহাসিক-উপন্যাসের প্রয়োহকে তিন পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা গেল। উপসংহারে শুধু এইটুকুই বলবার আছে যে লেখক পাঠকের মনোভাবের দিক দিয়েও তিন পর্বে ভাগ করা চলে। প্রথম —বিদেশী-বিধর্মী-বিদ্বেষ (যবন-দ্বেষ) পর্ব, দ্বিতীয়—স্থানীয়-দেশপ্রেম (local patriotism) পর্ব, এবং তৃতীয়—গঠন (constructive) পর্ব।

ললিতকলা বিষয়ক পরিভাষা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

আজ তিন বৎসর হইল ভারতবর্ষে নবযুগের সূচনা হইয়াছে। ভারত স্বাধীন হইয়াছে; এখন সকলে স্বীকার করিতেছেন যে ভারত যদি বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্ববিষয় উন্নতি সাধন করিতে হইবে যে সব বিষয়ে উন্নতি-সাধন করিতে হইবে তন্মধ্যে সাহিত্য অন্যতম। সাহিত্যে উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-বিষয়ে পুস্তকাবলী রচনা করিতে হইবে এবং এইসব পুস্তক রচনা করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন। বহুভাষাতে ললিতকলা বিষয়ক পুস্তকের বিশেষ অভাব আছে এবং এই বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইলে পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পরিভাষা রচিত হইয়াছে। ইহা অভিধানাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও ললিতকলার অন্যান্য বিষয়ের শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। অনেক শব্দের একটীর বেশী প্রতিশব্দ পাওয়া যায়; এরূপক্ষেত্রে যে শব্দটী গ্রাহ্য তাহা গ্রহণ করা হইয়াছে।

A

Abacus—ফলকা

Abode—ভবন

Absolute unit in Indian lineal measurement—স্থানাঙ্গুল

Abundance—বাহুল্য

Abutment—পিন্না

Activity—ক্রিয়া

Adamantine seat—বজ্রাসন

Adytum—গর্ভগৃহ

---

১ প্রবাসীতে প্রকাশিত (১৩৩০)

Altar—বেদী
Altar, Buddhist—বোধিমন্ত্র
Altar for offerings—বলিপীঠ
Ambry—ভাণ্ডাগার
Angle—কোণ
Angulas, 24, A cubit of—অঙ্গুষ্ঠ
Animal of Indra, Riding—ঐরাবত
Annulet—বলয়াকৃতি অন্তঃপ্রবেষ্টনী
Antechamber—সম্ভোগগৃহ
Antechamber in front of shrine—অন্তরিত মণ্ডপ
Antechamber with one or more closed sides—অর্দ্ধশালা
Apartment—প্রকোষ্ঠশ্রেণী
Apartment, Female—অন্তঃপুর
Apartment, Front—নেত্রকূট
Apartment on roof—অট্টালক
Aperture (of the nose)—স্রোতস
Appurtenance of temple—ভোগমণ্ডপ
Arabesque—আরবলিঙ্কার
Arcade—সম্ভাবলম্বনতোরণ
Arch—তোরণ
Archaeology—প্রত্নতত্ত্ব
Architect—স্থপতি
Architect, Chief—প্রধান স্থপতি
Architecture—বাস্তুবিদ্যা
Architecture, A style of—দ্রাবিড়
Architecture, A style of—নাগর
Architecture in broadest sense—বাস্তু
Architectural members, Four. A set of—চতুর্বর্গকাস্তুক
Architecture prevailing in Vesara country—বেসর
Architectural object, Edge of—নিষ্কম
Architectural, object which complete structure—উহাগেহ
Architectural workshop—স্থাপত্যশালা
Architectural Structural, The comparative height of component members of—গণ্যমান
Architrave—অধঃপ্রস্তার
Area within which Vajrâsana is established—বোধিমন্ত
Armlet—কেয়ূর
Armpit—কক্ষপুট
Army, Its division—স্কন্ধাবার
Art—শিল্পশাস্ত্র
Article of furniture used as a hanging balance—তুলাভার
Artisan—কারিগর
Artist—শিল্পী
Artist, Description of—শিল্পীলক্ষণ
Aryāvarta, relating to architecture নাগর
Aryāvarta, relating to sikhara—নাগর
Ascetic—মুনি
Ashlar—কর্ত্তিতপ্রস্তর
Assembly-hall—সংসদ
Astragal—কুমুদ
Atelier—কলাভবন
Atrium—বোমক গৃহাঙ্গণ

Attic—চিলেঘর
Austerity—তাপস

B

Backdoor—পশ্চাদ্দ্বার
(Back) ground of (a painting)—ভূমিরূপ
Back-view in squatting position with body bent—সমানত
Back-view with upper part of body partly visible in fore-lorn profile—পূর্বাগত
Balance—তুলাপুরুষ
Balcony—আলিন্দ
Ball of eye—তারা
Baluster—সোপান স্তম্ভ
Balustrade—প্রাচীর
Bamboo—বংশ
Band—পট্ট
Band, Large—মহাপট্ট
Band, Round—বৃত্ত পট্ট
Band Small—ক্ষুদ্র পট্ট
Band, Three—ত্রিপট্ট
Band, Threefold—ত্রিপট্ট
Bar—অর্গল
Baroque—কুম্ভণ
Base—উপস্তর
Base, Its moulding—জগতী
Base, Its ornament—কুম্ভালঙ্কার
Basket made of leaves—পর্ণ বল্লরী
Basket-or beehive-like ornament—কলস
Basement—ভূমিপত্তন
Basement, Its extension—জঙ্ঘানিষ্ক্রমণ
Bashfulness—লজ্জা
Basin—কাংস্যাচী
Bas-relief—অল্পোচ্ছ্রিত তক্ষণ
Battle-axe—পরশু
Battlement—ছিদ্র প্রাচীর
Bays—প্রাচীর ছিদ্র
Bead—অর্ধচন্দ্রাকৃতি বন্ধ
Beam—কড়িকাঠ
Beam, A small—ক্ষুদ্র সোপান
Beam of a house—কাসক
Bed—শয্যা
Bed-room—শয়ন গৃহ
Bed stead—পর্যঙ্ক
Belfry—ঘণ্টাগার
Belly—কুক্ষি
Belonging to Buddhist—বৌদ্ধ
Bema—বক্তৃতামঞ্চ
Bent (position)—নত
Black (as relating to colour in painting)—কৃষ্ণ
Blue lotus-colour—নীলোৎপলনিভ
Body—কায়
Body between breast and back-bone—বৃহতী
Body in three-quarter profile (in painting)—অর্ধ বিলোচন
Bolt—কীল
Bony protuberance on ankle—গুল্ফ
Boundary—সীমা
Bracelet—কটক

Bracket—ভাক

Bracket projecting from a wall to hang or to place anything upon—নির্যূহ

Breadth (of sculpture)—বিস্তার

Breadth—প্রস্থ

Brick—ইষ্টক

Bridge—সেতু

Brow, Its line—ভ্রূরেখা

Brownish (as relating to sculpture)—

Buddha, The thorough master of all—সম্যক্‌সম্বুদ্ধ

Buddhist alter—বোধিমণ্ড

Buddhist head, Top-unit—উষ্ণীষ

Buddhist law of piety—ধর্ম

Building—গৃহ

Building, Prevailing in Drāvida—দ্রাবিড়

Building, residential, Foundations of—বাস্তুগর্ত

Building having walls on three sides except south—চুল্লী

Building in front of shrine, Enclosed—অর্দ্ধমণ্ড

Building in which height is standard of measurement—অপ্রচিত

Building in which width at bottom is standard of measurement—অপপ্রচিত

Building inhabited by devotee—মঠ

Building, Its exterior—গৃহবপু

Building, Its face—গৃহমুখ

Building, Its front—গৃহমুখ

(Building), Nine-storeyed—নবভূমি

Building, Octangular in plan—ত্রিবিষ্টপ

(Building) of the gate-house shape—গোপুরাকার

Building, Oval—বাজিবৃত্ত

Building, Seven storeyed—সপ্তভূমি

Building, Single storeyed, Eight component parts—অষ্টবর্গ

Building, Single-storeyed, Octangular in plan and having one cupola—অষ্টাস্ত্র

Building, Six-storeyed—ষষ্ঠতল

Building, Some part of—অন্তরাল

Building, Temporary—চয়বাস্তু

Building, Basement of—গৃহপিণ্ডি

Building, Three-storeyed—ত্রিভূমি

Building, Twelve-storeyed—দ্বাদশতল

Building, Two-storeyed—দ্বিতল

Building used as a dancing hall—নৃত্য মণ্ডপ

Building where a clock is placed—ঘণ্টাঘর

Building where stores are kept—তণ্ডুলাগার

Building where water-clock is placed—ঘটিকাগার

Building where water is preserved for washing, bathing etc.—জলপূরিত মণ্ডপ

Building. Quadrangular in plan, having one storey and five cupolas —চতুষ্কল্প

Building, 16 cubits wide and having a roof with 3 dormer windows—ত্রিচালা

(Building) with apsidal structure —হস্তিপৃষ্ঠ

Building with 4 sloping roofs— চৌচালি

Building-work—গাঙ্গকর্ম্ম

Buttress—আলম্ব

Byzantine architecture—বাইজেন্টিনীয় স্থাপত্যরীতি

(ক্রমঃ প্রকাশ্য

স্যর উইলিয়ম ফষ্টার

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত

গত ১২ই মে ইংলণ্ডের অন্যতম প্রবীণ ঐতিহাসিক স্যর উইলিয়ম ফষ্টারের (১৮৬৩—১৯৪১) মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের একটি প্রাচীন সংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। স্যর উইলিয়ম ফষ্টার যে বয়সে মারা গিয়েছেন, তাকে অপরিণত বয়স বলা চলে না। কিন্তু এই সংবাদে ঐতিহাসিক মাত্রই আন্তরিক বিয়োগের শোক অনুভব করবেন। যাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের চর্চা করেন তিনি তাঁদের অনেকের গুরুস্বরূপ ছিলেন।

স্যর উইলিয়ম ফষ্টার ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া অফিসের কাজে যোগ দেন। ১৯০৭—১৯২৩ পর্য্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়া অফিসের রেজিষ্ট্রার এবং সুপারিনটেনডেণ্ট অফ রেকর্ডস এবং ১৯২৪—১৯২৭ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া অফিসের হিষ্টরিওগ্রাফার ছিলেন। ১৮৯৩—১৯০২ পর্য্যন্ত তিনি Hakluyt Societyর কর্ম্মসচিবের কাজ করেছেন এবং ১৯২৮—৩৫ পর্য্যন্ত এই সমিতির সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স্যর উইলিয়ম ফষ্টার ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সাধারণতঃ A Guide to India Office Records এবং পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত Supplementary Calendar of Documents in the India Office এর সম্পাদনের জন্য পরিচিত। কিন্তু যে কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস লিখবার উপাদান সংগ্রহ। এই গ্রন্থ The English Factories in Indiaর প্রথম খণ্ড ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন থেকে পরবর্ত্তী বিশ বৎসর ধরে এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ খণ্ড পর্য্যন্ত তিনি গভীর নিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন। এই কাজ ছাড়াও তিনি সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশীদের রচিত বিবরণ সম্পাদনা এবং পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাউনিংএর A Histoy of the Indian Wars (১৯২৪) হ্যানবাটের Travels in Persia (১৯২৮) এবং হ্যামিলটনের A New Account of the East Indies (১৯৩০)। যাঁরা স্যর উইলিয়ম ফষ্টারের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে তিনি কিরকম দুর্লভ সরস রচনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। এই কারণে তাঁর কোনও কোনও গ্রন্থ বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ পাঠক উভয়ের কাছেই প্রিয় হয়েছে। The East India House (১৯২৪) এবং John Company (১৯২৬) লিখবার সময় সম্ভবতঃ দুই শ্রেণীর পাঠকের কথাই তাঁর মনে ছিল; ১৯০৩ সালে প্রকাশিত সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা একটি বই, England's Quest of Eastern Trade সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এই গ্রন্থটি স্যর উইলিয়ম ফষ্টারের অন্যতম শেষ রচনা। বহুকালব্যাপী বার্দ্ধক্য এবং দৃষ্টিশক্তিহীনতার ফলে তাঁর কোনও নতুন কাজের ভার গ্রহণ করবার শক্তি ছিল না। কিন্তু আধুনিক কালে ঐতিহাসিকদের সঙ্গে তাঁর যোগ একেবারে লুপ্ত হয় নি। এমন অনেক বিদেশী ঐতিহাসিক আছেন ভারতবর্ষেই যাঁদের ছিল কর্ম্মক্ষেত্র, এবং পরবর্ত্তীকালে ইতিহাস রচনার কাজে এই দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁদের সাহায্য করেছে। স্যর উইলিয়ম ফষ্টারের সঙ্গে এদেশের সেই ব্যক্তিগত যোগ ছিল না। কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি এবং সহৃদয়তার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলসূত্রটি বুঝতে তাঁর বাধা হয় নি। তিনি যে সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রধানতঃ গবেষণা করেছেন, তখন ভারতবর্ষে মোগলরাজত্ব এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সবে মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। তাঁর জীবিতকালেই স্যর উইলিয়ম ফষ্টার এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান দেখেছেন। স্যর উইলিয়ম ফষ্টারের কথা বলতে গেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম হিষ্টরিওগ্রাফার রবার্ট অমম এবং জন ব্রুসের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, স্যর উইলিয়ম ফষ্টারের হাতে সেই কাজ সুসম্পন্নপ্রণালী হয়েছে এবং পরিণতিলাভ করেছে। তাঁর মতন পণ্ডিত সব দেশেই দুর্লভ। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে কিম্বা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ তাঁর স্থান পূর্ণ করবেন এমন সম্ভাবনা নেই।